বেণের মেয়ে

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই প্রণীত

বেণের মেয়ে ইতিহাস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেননা আজকালকার বিজ্ঞান সঙ্গত ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাস হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখনও হইতেও চাইনা। বেণের মেয়ে একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে এও তাই। তবে এতে একালের কথা নাই। সব সেই সেকালের, যে কালে বাঙ্গলার সব ছিল। বাঙ্গলার হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কল ছিল। বাঙ্গালী এখন কেবল একেলে গণিকা তন্ত্রের উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার সেকেলে সহজিয়া তন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদলাইয়া লইলে ক্ষতি কি ?

মূল্য দুই টাকা ডাকব্যয় ।০ আনা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রূপের মূল্য

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য—১॥০
চমকপ্রদ ঘটনা বিজড়িত বিচিত্র গল্পগুচ্ছ

একখানি বহুবর্ণের চিত্র
ও বহু একবর্ণের চিত্র আছে। সুন্দর বাঁধাই।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

PICTURE CARDS.

Love Scenes—Grand tricolour Love Scenes & special representations in multi coloured, Price Re. 1-8 per dozen.

Indian Scenes—Twelve charming Indian Beauties Scenes, Historical Views beautifully reproduced in tricolour. Price Re. 1-4 per dozen. Catalogue on application. [১১]

CALCUTTA COMMERCIAL BUREAU,
Kalighat (V) Calcutta.

রাজগঞ্জ লাইব্রেরী।

রাজগঞ্জ লাইব্রেরীর প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। ১। দ্বিজেন্দ্র লাল রায় পদক।

প্রবন্ধের বিষয়—বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। অধ্যাপক হীরালাল বসু পদক।

বিষয়—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "কিরণময়ীর চরিত্র সমালোচনা"।

৩। পণ্ডিত—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি পারিতোষিক।

বিষয়—পাঠাগারের উপকারিতা। (ম্যাট্রিকিউলেসন্ ছাত্রদিগের জন্য)

আগামী ১৫ই বৈশাখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। শ্রীচারুচন্দ্র পাল।
সহঃ সম্পাদক, রাজগঞ্জ লাইব্রেরী, শাঁখরাইল পোঃ, হাওড়া।

ভারতবর্ষের নিবেদন

১। ভারতবর্ষের মূল্য অগ্রিম দেয়। ভারতের সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সহ বার্ষিক ছয় টাকা, ষাণ্মাসিক তিন টাকা। ভি পি খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যা আট আনা। ভারতের বাহিরে সর্ব্বত্র বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, প্রতি সংখ্যা এক টাকা। স্পষ্ট নাম ঠিকানা দিয়া, মূল্যাদি প্রকাশকের নামে পাঠাইতে হয়। আষাঢ় হইতে বৎসর আরম্ভ। আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ ও পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ, ষাণ্মাসিক গ্রাহক হইবার নিয়ম।

২। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে; দুএক মাসের জন্ত ঠিকানা পরিবর্ত্তন স্থানীয় ডাকঘরে করাই গ্রাহকের পক্ষে সুবিধাজনক।

৩। প্রত্যেক মাসের ৫ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের 'ভারতবর্ষ' না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। আমরা বিশেষ সতর্কতার সহিত মিলাইয়া সমস্ত কাগজ ডাকে দিই; সুতরাং আমাদের প্রেরণের কোন গোলই হয় না। যাঁহারা ডাকঘরে আবেদন করিয়াও কোন সন্ধান পাইবেন না, তাঁহারা আমাদিগকে ডাকঘরের উত্তর-সহ জানাইবেন; বাঙ্গালা ১৫ই তারিখের পর অনুসন্ধানাদি সম্ভবপর নহে। ডাকঘরের গোলযোগে কাগজ না পাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বর্ত্তমান সময়ে আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যাঁহারা সর্ব্বদা নিয়মিত ভাবে কাগজ পান না, তাঁহাদের পক্ষে রেজেষ্টরী খরচা বহন করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

লেখকগণের প্রতি—

১। লেখকগণ দয়া করিয়া প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

২। প্রবন্ধ সকল প্রকাশকের নিকট প্রেরিতব্য।

৩। প্রবন্ধের সঙ্গে ঠিকানা লেখা না থাকিলে বড় অসুবিধা হয়। প্রবন্ধ লেখকগণ দয়া করিয়া প্রত্যেক লেখার সঙ্গে ঠিকানা লিখিয়া দিবেন এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ লইতে হইলে ডাক খরচা দিতে হইবে।

৪। কবিতা বা প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন, অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি—

১। পূর্ব্বমাসের বিজ্ঞাপনের মূল্য বাঙ্গালা মাসের ১৫ই মধ্যে না দিলে, পরের মাসে সে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। নূতন বিজ্ঞাপনদাতাগণের পক্ষে মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বাঙ্গালা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। আমাদের যথেষ্ট যত্ন লওয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনদাতার ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৩। যাঁহারা বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ব্লক ফেরৎ লইবেন।

বিজ্ঞাপনের হার।

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা ২ কলম	...	১৪৲	প্রতিমাসে।
½ „ বা ১ „	...	৭।০	„
¼ „ বা ½ „	...	৪৲	„
⅛ „ বা ¼ „	...	২।০	„
সূচী-পৃষ্ঠার অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	...	১০৲	„
„ সিকি „	...	৫।০	„

বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য।

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সপ্তম বর্ষ—২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা ; চৈত্র—১৩২৬।

সম্পাদক—শ্রীজলধর সেন।

লেখ-সূচি

চিত্র-সূচি

লেখ-সূচি

চিত্র-সূচি

লেখ-সূচি

লেখ-সূচি

চিত্র সূচী

বহুবর্ণ-চিত্র

ভি, পি ডাকে ॥৶৹ মূল্যে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পূর্ব্ব-প্রকাশিত বইগুলি যখন ইচ্ছা পৃথক পত্র দ্বারা লইতে পারেন।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

যাহারা ব্যবহার করেন, তাহাদের কোনরূপ ভুগিতে হয় না। সুর নামিয়া যাওয়া, ঝিঁঝিঁ করা, হাওয়া বাহির হওয়া প্রভৃতি ব্যারাম শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মে করে না বলিলেই হয়। এই সকল গুণের জন্যই আজ শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও কাটতি—সাপ্লাই করিয়া উঠিতে পারি না।

৩ অক্টেভ	সিঙ্গেল রীড, ৪ ষ্টপ	২০৲ ও ২৫৲
ঐ	ডবল রীড	৩৫৲, ৪০৲ ও ৪৫৲
অন্যান্য প্রকার		৫০৲ হইতে ৩০০৲
হারমোনিয়ম শিক্ষা পুস্তক		১৲ ও ২৲
আলিবাবার স্বরলিপি		১৷৷০

আমরা সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র ও সরঞ্জাম, গ্রামোফোন, রেকর্ড ও পিন বিক্রয় করি।

Sarat Ghosh & Co.
4, Dalhousie Sqr., Calcutta.

গাছ ও বীজ

এই সময়ের বপনোপযোগী ১৫ রকম দেশী শাক-সব্জীর বীজ মাশুলাদিসহ ১৸০ আনা। আমাদের নির্ব্বাচিত, সুঘ্রাণযুক্ত বিবিধ প্রকার গোলাপ গাছ ২৷৷০, ৪৷৷০ ও ৬৲ টাকা ডজন। অন্যান্য ফল, ফুল—পাতাবাহারের গাছ, চারা কলম এবং সব্জীর ও মরসুমী ফুলের বীজ ইত্যাদি সর্ব্বজন-প্রশংসিত, অকৃত্রিম ও সুলভ। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে মূল্যতালিকা পাঠান হয়।

প্রোপ্রাইটার্স:—বেঙ্গল নার্শারী।
১২৪, মাণিকতলা মেন রোড, পোঃ—সিমলা, কলিকাতা।

উইলিয়াম টেল

বা সুইজরল্যাণ্ডের স্বাধীনতা

ইহা অষ্ট্রিয়ার অত্যাচার-পীড়িত সুইস-স্বাধীনতার ইতিহাস। সঞ্জীবনী—"বিষয় মনোজ্ঞ, ভাষা চিত্তাকর্ষক, যে পাঠ করিবে সেই পরিতৃপ্ত হইবে।" মডার্ন রিভিউ—"অমর দেশভক্তের জীবনী এমন প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ।" মোহাম্মদী—"সকলের পাঠ করা উচিত।" বরিশাল হিতৈষী—"ভাষা অতি সরল ও মধুর।" মূল্য ৷৷০; ভিঃ পিতে ৷৷৵০। প্রাপ্তিস্থান:—(১) গুরুদাস চাটার্জ্জি এণ্ড সন্স, ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (২) গ্রন্থকার [illegible] সিরাজগঞ্জ।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

নূতন উপন্যাস

সীতানাথ

প্রধান প্রধান মাসিকপত্রে প্রশংসিত,
সুন্দররূপে মুদ্রিত
মনোহর বাঁধাই, মূল্য ১৸০

"এমন সম্পন্ন বাংলা উপন্যাস সম্প্রতি অল্পই পড়িয়াছি
—প্রবাসী।

"এরূপ অতিরঞ্জন বর্জ্জিত, শিক্ষাপ্রদ উপাদেয় পুস্তক খুব কমই পাঠ করিয়াছি"—মানসী ও মর্ম্মবাণী।

"নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় গ্রন্থকার এই 'সীতানাথ' চরিত্রে আদর্শ দেব-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন"—ভারতবর্ষ।

প্রাপ্তিস্থান—মানসী প্রেস, ১৪এ, রামতনু বসুর লেন, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ও কলিকাতার অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। [চ]

হিষ্টিরিয়া আরোগ্য হয়
কিরূপে?

স্নায়ুসুক্ত

এই ঔষধ নানাবিধ স্নায়ু ও মস্তিষ্কের পীড়ায় বিশেষ ফল প্রদান করে। ইহাতে অপস্মার, উন্মাদ, স্নায়বিক আক্ষেপ ও অন্যান্য প্রকার বায়ু রোগের উপশম হয়। হিষ্টিরিয়ার মূর্চ্ছা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বন্ধ হয়। রেজিষ্টার নং ১৭৬-১৪ মূল্য ৫৲ মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। [২৬৷৯-২৭৷৮]

প্রাপ্তিস্থান—ছগনলাল লাল্লুভাই সাহ
দেশীনামওয়ালা—বরোদা।

শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বীররাজা (নাটক) মিনার্ভা ও মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত এবং বহু সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত। সখের থিয়েটারে অভিনয়ের খুব সুবিধা। মূল্য ৸০ আনা।

বাহাদুর (গীতিনাট্য) মনোমোহনে অভিনীত, মূল্য ।০ আনা।

রাতকাণা (কৌতুক-নাট্য) মিনার্ভায় অভিনীত, ।৵০।

মুখের মত ষ্টারে অভিনীত, মূল্য ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম

ক্রয় করিলে আপনার কোনও রূপে ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের নিকট ঠিক দামে যে ঠিক জিনিস পাইবেন তাহার গ্যারাণ্টি আমাদের ৪০ বৎসর ব্যাপী সুনাম।

আমাদের 'গ্রামেলা' মার্কা হারমোনিয়ম প্রথম শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ উপযোগী। মূল্য ২ সেট রিড ৩৬৲ টাকা, ১ সেট রিড ২৪৲।

আমাদের "ডোয়ার্কিন ফ্লুট" হারমোনিয়ম সর্বোৎকৃষ্ট। ৩ অক্টেভ ২ সেট রিড ৭৫৲। ৩।০ অক্টেভ ২ সেট রিড ৯০৲। তিন সেট রিড ১১৫৲ টাকা। [চ]

হারমোনিয়ম ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সম্পূর্ণ তালিকা পত্র পাইলেই পাঠান হয়।

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহৃষিকেশ বিশ্বাস প্রণীত

সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা

মূল্য ১৲ টাকা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন, ৮ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘি, কলিকাতা।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সর্ব্বত্র প্রশংসিত অভিনব উপন্যাস

ছাপা, বাঁধাই, কাগজ—চমৎকার; ভিতর ও বাহির সমান সুন্দর। দাম সাত সিকা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জাপান

সুপরিচিত শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী—উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য!

পাতায় পাতায় ছবি—মোট ৪৩ খানি!

উৎকৃষ্ট আইভরি ফিনিস কাগজ, নয়নরঞ্জন প্রচ্ছদ।

দাম ১।০ দেড় টাকা।

গুরুদাস বাবুর দোকান; বরেন্দ্র লাইব্রেরী; ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

WONDERFUL DISCOVERY.

TRY IT, THEN YOU WILL KNOW.

Beware of worthless imitations.

Dr. B. Ghose's Specific for Hydrocele, Varicocele, Hernia, Tumour, and Elephantiasis, *Guaranteed* to cure these diseases of any nature and standing. For external application only. Free from any injurious ingredients. Price 1 oz. Rs. 2-8. ½ lb Rs. 15-0 and lb Rs. 30-0-0. Unsolicited Testimonials.

BE A MAN.

WONDERFUL DISCOVERY

Try it, then you will know.

Dr. B. Ghose's "Indian Oil" Guaranteed sure, genuine & permanent cure for Loss Virility of any nature and standing. By applying this oil only externally restores the natural power as youth. Price, 1 oz. Rs. 2-0-0 and lb Rs. 26-0-0 Testimonials highest. Apply to— [C]

B. GHOSE & Co., CHEMISTS,

85-1, Bechoo Chatterjee Street, Calcutta.

Telegraphic Address, "HYDROLE."

মূল্য কমিয়াছে **জিওন লাল এণ্ড কোংর** মূল্য কমিয়াছে

ম্যানেজিং এজেন্টস্ ভিক্টোরিয়া এলুমিনিয়াম ওয়ার্কস্

ক্রাউন মার্কা এলুমিনিয়াম

রজত শুভ্র ও চিরস্থায়ী, দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্ত সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই এলুমিনিয়াম ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ব্যবহার করেন।

ভগ্ন ও পুরাতন হইলে ফেরৎ লওয়া হয়।

নূতন মূল্য তালিকা বিনা ব্যয়ে পাইবেন।

টেলিঃ ঠিকানা—মাটালুমিন্—Mattalumin.

কলিকাতা এবং বম্বে টেলিফোন নং ৩১৫২।

৭০—৭১ মিউনিসিপাল মার্কেট, কলিকাতা।

নূতন মাল ও নূতন নূতন রকম আমদানী হইয়াছে।

জিওন লাল এণ্ড কোংর

ম্যানেজিং এজেন্টস্ ভিক্টোরিয়া এলুমিনিয়াম্ ওয়ার্কস্

(গভর্ণমেণ্ট, রেলওয়ে, মেডিকেল মেরিণ, মিলিটারী ও অন্যান্য গভর্ণমেণ্ট ফ্যাক্টারী প্রভৃতির কন্‌ট্রাক্টার)

৫৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোটী কহিনূর তুল্য সকল সমাজের সার,

স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক আমাদের

কামশাস্ত্র

লিখিলেই বিনামূল্যে ডাক মাশুলে পাঠাই।

ইহাতে আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ, আমাদের এই দুরবস্থা কিসে অপনীত হইবে, ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। একবার পাঠ করুন, দীর্ঘজীবী হইয়া সুখ সম্পদে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবেন।

ঠিকানা—

আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকার আবিষ্কারক

কবিরাজ,—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একটা কথা।

ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড কোম্পানীর

তৈলরঞ্জন সুরভি উপাদান।

এই উপাদান তিন পোয়া পরিমাণ নারিকেল তৈল, তিল তৈল, অথবা শুভ্র অয়েল নামক তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বোতলের মুখ উত্তমরূপে বন্ধপূর্ব্বক ৩।৪ দিবস শীতল স্থানে রাখিলে মনোহর গন্ধযুক্ত গোলাপীরঙ্গের কেশতৈল প্রস্তুত হয় ও নারিকেল তৈলের স্বাভাবিক অপ্রিয় গন্ধ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই তৈল দ্বারা প্রত্যহ বা অভ্যাস অনুযায়ী যথানিয়মে কেশবিন্যাস করিলে কেশের অকাল পক্কতা, কেশ উঠিয়া যাওয়া, খুস্কী বা মরামাস হওয়া, মস্তক জ্বালা, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি দোষ দূর হইয়া কেশ সমধিক কোমল, ঘন ও উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ এবং মস্তিষ্ক শীতল হইয়া দৃষ্টি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড কোং,

এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা।

৭৪নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট ও ১৬৭ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মেশিনে প্রস্তুত মেশিনে প্রস্তুত

উজ্জ্বল টেবলেট কালী

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক

সর্ব্বত্র বিখ্যাত সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত। প্রত্যেক ট্যাবলেটে এক আউন্স কালি হয়। প্রতি গ্রোস্ কালি সুরক্ষিত টিনের কৌটায় প্যাক করিয়া দেওয়া হয়। ব্রাইট্ ব্ল্যাক এক গ্রোস্ ৸৵৹ আনা। ডায়মণ্ড ব্ল্যাক এক গ্রোস্ ১৷৹। কমার্সিয়াল ব্ল্যাক এক গ্রোস্ ১৵৹। লাল এক গ্রোস্ ১৵৹। ব্রিলিয়াণ্ট সবুজ এক গ্রোস্ ১৷৹।

ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং

৫৯।১ বি রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শক্তি লাইব্রেরী ঢাকা

সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ, সমাজ ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ, পাঠশালা ও স্কুলপাঠ্য পুস্তকাদি সুলভ মূল্যে বিক্রেতা ও প্রকাশক।

১। সিদ্ধজীবনী (ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার জীবনবৃত্তান্ত, তদীয় ব্রহ্মবিদ্যার পরিচয় ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রকৃত চিত্রসম্বলিত গ্রন্থ।) শ্রীমদ্-ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রণীত ডবল ক্রাউন ১৬পেজি এণ্টিক কাগজের ২৮ ফর্ম্মা ৪৪৮ পৃঃ সমাপ্ত। মূল্য কাগজের বাঁধাই ১৸০, সোণার জলে উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২৲ টাকা মাত্র।

২। ধর্ম্মসার সংগ্রহ (ব্রহ্মচারী বাবার অমূল্য উপদেশাবলী) এণ্টিক কাগজে ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ফর্ম্মার ১৪৮ পৃঃ সমাপ্ত। মূল্য ৷৷০ মাত্র।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ,

হিন্দু কেমিষ্ট, রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

এই সভ্যতার দিনে সুখ ঐশ্বর্য্যের চাক্‌চিক্য দেখিয়া অনেক সময় সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াও আমরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া থাকি—

"সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল"

আর স্বস্তি কামনা করি।

সুখ চেয়ে স্বস্তি কেন ভাল, কেমন করিয়া ভাল যদি দেখিতে চাহেন, জানিতে চাহেন, বুঝিতে চাহেন, তবে পাঁচসিকা মাত্র খরচ করিয়া আমাদের

নব প্রকাশিত উপন্যাস

কল্যাণী

পাঠ করুন। আর বিজ্ঞাপনের কতদূর সত্য নিজে বই পড়িয়া বিচার করুন। বইখানির ছাপা সুন্দর, বাঁধাই মনোহর।

ভিন্নরুচির্হি লোকঃ, পরের মুখে ঝাল না খাইয়া নিজে বিচার করা আবশ্যক। আপনার অর্থ ব্যয় নিরর্থক হইবে না—একথা সাহস করিয়া বলা যায়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সরল স্বরলিপি শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীতুলসীদাস চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

ঘরে বসিয়া বিনা শিক্ষকে বেহালা, বাঁশী, হারমোনিয়ম ও এস্রাজ ইত্যাদি শিখিবার সুবিধা ও সুযোগ বাংলায় আর কোন পুস্তকে আছে কি না বলিতে পারি না। ইহাতে আছে কি জানেন? কতকগুলি রাগের আলাপ, ভাল ভাল রাগ-রাগিণীর গৎ ও তাহার তাল, উপজ ও তেলেনার সারগাম ইত্যাদি। আর আছে, গিরীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, প্রমথনাথ ইত্যাদি কবিগণের ভাল ভাল গান ও তাহার স্বরলিপি। মূল্য প্রথম ভাগ ১৲, দ্বিতীয় ভাগ ১।০ মাত্র। [চ]

প্রাপ্তিস্থান—৮ নং সৃষ্টিধর দত্তের গলি, হাতিবাগান, কলিকাতা।

হিতবাদীর

"বৃদ্ধের বচন"

হিতবাদীর সহকারী সম্পাদক

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

প্রথম খণ্ড—মূল্য এক টাকা।

হিতবাদীর "বৃদ্ধের বচনের" জন্য সহস্র সহস্র পাঠক উদগ্রীব হইয়া থাকেন। সেকালে ছিল বিশারদের "ছড়া" আর এখন—"বৃদ্ধের বচন" হিতবাদীর বিশেষত্ব। এমন সরল বাক্‌পটুতা—এমন সুতীব্র কশাঘাত—এমন একাধারে ব্যঙ্গ ও উপদেশের সমাবেশ বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি দুর্লভ। ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস লাইব্রেরীতে, ৭০ নং কলুটোলা হিতবাদী কার্য্যালয়ে এবং আমাদের কাছে পাওয়া যায়।

প্রকাশক—শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী ও শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার,

৫৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অতি কঠোর দর্শনশাস্ত্র উপন্যাসাকারে অনধীত বঙ্গবাসিগণকে অতি সরলভাবে শিক্ষা দেওয়ায়, মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী সংস্কৃত ভাষার সকল শাস্ত্রের অধ্যাপক ও পরীক্ষক-মণ্ডলী এবং ইউনিভারসিটির এম-এ উপাধিধারী শিক্ষক ও পরীক্ষক মণ্ডলীর মহাসমিতি—'সংস্কৃত মহামণ্ডল' অভূতপূর্ব্বশক্তি বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভার পুরস্কারস্বরূপ যে প্রবীণ দার্শনিক ঔপন্যাসিককে মহাগৌরবান্বিত "বেদান্ত-শাস্ত্রী" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন, সেই—

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য-বেদান্ত-শাস্ত্রী প্রণীত

সকলের সেরা, সকলের সার, সকলের শ্রেষ্ঠ, চির নূতন, গভীর গবেষণাপূর্ণ অথচ সরল সহজ, শারদ-পূর্ণিমার ন্যায় বিমল কয়খানি বই—উপহার দিতে, পাঠ করিয়া স্ত্রী পুরুষ, স্কুল-কলেজের ছাত্র, অধ্যয়নশীল যুবক, সকলেরই জ্ঞান লাভ করিতে, আবার গৃহ-লাইব্রেরী উজ্জ্বল করিতে প্রয়োজন!

চৈত্র-কলসে জ্যোৎস্না জ্বলিল

কাঙালিনী

(উপন্যাস) সবে নূতন

বাহির হইল। ইহার সব নূতন- ভাব, ভাষা, চিন্তা ও ঘটনা-প্রবাহ—যেন স্বর্গ মন্দাকিনীর পবিত্র বারিধারা। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই পাঠ্য—পাঠে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ রস উপভোগ করিবেন। কাঙালিনীর করুণার্ত্ত স্বর বেহাগের রেশের মত প্রাণের কানে ছাপ রাখিয়া যায়। মূল্য ১৸৹ দেড় টাকা। মনের মত আসল সিল্কের কাপড়ে প্যাডে বাঁধানো, সোনার জলে ছাপা, প্রিয়জনকে উপহার দিতে তুষাররাশির মত নির্ম্মল ও পবিত্র।

বিদেশিনী

(উপন্যাস) স্বাধীনা বিহঙ্গিনী

প্রেমের ব্যর্থ বেদনাপূর্ণ হাহারব মুখরিত অপূর্ব্ব উপন্যাস। সুন্দরী ললনার প্রেমের প্রতিহিংসায় ভীষণা প্রেতিনী মূর্ত্তিধারণ,—চক্ষুর উপর কৃত্রিম হত্যা, পচা রক্ত গন্ধ, মুণ্ড লইয়া খেলা— অপূর্ব্ব ঘটনাজাল জড়িত—বোধ হয় যেন এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া কিসের পর কি হইল, বুঝিয়া লই। বোধ হয়, যেন এই বুঝিলাম—আবার ধাঁ-ধাঁ—আবার রহস্যের পর রহস্য! ছাপা, বাঁধা, ছবি, কাগজ প্রথম শ্রেণীর, মূল্য ১৸৹ দেড় টাকা।

প্রতিদান

(উপন্যাস) কামিনী ও কাঞ্চনে

যদি প্রেমের সোহাগে প্রতিদান চাও, যদি স্নেহের সন্তানের মঙ্গল কামনা থাকে, যদি পত্নীকে মনের মত করিবার বাসনা হয়, তবে এই বই পড়। ছাপা বান্ধা কাগজ সব প্রথম শ্রেণীর, মূল্য ১৸৹ দেড় টাকা।

দীক্ষা ও সাধনা

(যোগ ও তন্ত্র—বিজ্ঞান ও মন্ত্র)

শিষ্যকে মন্ত্র দিতে গুরুকে যাহা কিছু জানিতে হ[য়] আর মন্ত্র লইয়া শিষ্যকে যাহা কিছু করিতে হয় [তৎ]সমস্ত এই গ্রন্থে আছে। তদ্ভিন্ন যোগশিক্ষার অনেক বিষয় আছে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেরই সন্ধ্যা, উপাসন আচমন, তিলকধারণ রূপরহস্য, পুরশ্চরণ, মন্ত্রচৈতন্য, ম[ন] স্থির করা, সমস্ত দেবতার ধ্যান, প্রণাম, স্তব, কবচ, বীজ ও বীজের অর্থ প্রভৃতি সব আছে। কুল-কুণ্ডলিনীর স্বরূপ ধ্যান, চিন্তা, জাগরণ, অজপা জপ, সোহহং চিন্তা, হংস চিন্ত ও কুণ্ডলিনীর সহিত ঊর্দ্ধে উত্তোলন, জাগরণ, ষটচক্র ভেদ সর্ব্বতোভদ্র, মাতৃকা যন্ত্র, ঋণী, ধনী ও রাশিচক্র প্রভৃতি কালী তারা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি সমস্ত শক্তি, বিষ্ণু, নারায়ণ, গোপাল, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি এবং শিব, সূর্য্য, গণপতি প্রভৃতি পুং দেবতার বীজ, বীজোদ্ধার, মন্ত্রের অর্থ—এক কথায় এরূপ সংগ্রহ আর কোথাও নাই। ১৸৹ টাকা।

পথের আলো

(উপন্যাস) জগতের সার রত্ন

বাঙ্গালীর মুখে মুখে এই পুস্তকের প্রশংসা! নূতন করিয়া কি বলিব? অজ্ঞানের দেব-মন্দিরে ভক্তির ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া অজ্ঞানের অন্ধকার পথ আলো করিবে। ছাপা, বাঁধা সব প্রথম শ্রেণীর, মূল্য ১৸৹ টাকা।

দানে আনন্দ—গ্রহণে পরিতোষ

জনরব

(উপন্যাস) শুভ-পরিণয়ে

অতি মধুর, অতি অপূর্ব্ব, নূতন কল্পনা, বাঙ্গালার মৌলিক সম্পত্তি। কর্ম্ম-শ্রান্ত জীবনের অবসর কালে আনন্দের শান্তি ধারা। প্রেমে প্রাণ মাতান, জ্ঞানে হৃদয় আলো করান, সৌন্দর্য্যে মনের উৎকর্ষ আনয়ন—ইহা পাঠেই সম্পন্ন হয়।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Military

সুলভে
রবার ষ্ট্যাম্প
চাপরাস
শীল
উডব্লক
আর,এন,দত্ত এণ্ড কোং

ফেব্রিণ ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ

জীর্ণ ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া যদি আপনি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আজ হইতেই আমাদের "ফেব্রিণ" সেবন করিতে আরম্ভ করুন। সাত দিনের মধ্যে জ্বর ছাড়িবে। আপনি নবজীবন পাইবেন। মূল্য বড় বোতল ১।০, ছোট বোতল ৸৵০ আনা। ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

গনোলয়েড্

তরুণ ও পুরাতন প্রমেহে অব্যর্থ। বহু পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে সপূয ধাতু নির্গম শীঘ্র আরাম হয়, জ্বর ও জ্বালা যন্ত্রণা যেন মন্ত্রবলে বিদূরিত হয়। স্বতন্ত্র ভাবে পিচকারী প্রয়োগের কোন প্রয়োজনই ইহা ব্যবহারে হয় না। প্রতি শিশি ২॥০ টাকা। ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স্

প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"ELIXIR G. B. P."

(Or Flesh-Maker)

It is the greatest of flesh making and fat producing substances that we know of. It has admirable power of increasing the body weight. It promotes growth of new cells. Forms flesh from the most ordinary food stuff. Strengthens the physique by abundant increasing the number of white corpuscles in the blood and every one knows this day that the white corpuscles are the guardian angels of our body. They always protect our body from the inclemency of the weather, from accident and injury, and from the ravages of infectious diseases. Red corpuscles multiply 500 times. It is carminative, restorative, alternative tonic and beautifier. Long use grants a glow of health to the user.

It developes personal magnetism and eliminate senile deposits (seeds of death) from the system, and makes one look young.

It is Corrective of Dyspepsia ; a dose of twenty drops can digest one pound nett weight of rich food.

It is harmless, free from Alcohol, Codliver Oil, or other animal products Guaranteed Purity. Rs. 3 per bottle. Postage etc., Five Annas.

Manufactured by—

THE GREAT BENGAL PHARMACY,

MIHIJAM, E. I. R. (INDIA).

মদ্য ত্যাগ !

অ্যালকহলীন—ইহা ব্যবহারে মদ্যপানেচ্ছা দমন করে, শরীর হইতে অ্যালকহলীন বিষ (Alcoholic Poison) সমূলে নষ্ট করে ও মদ্যপানের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ যাবতীয় ব্যাধি—অনিদ্রা, অগ্নিমান্দ্য, খিটখিটে স্বভাব, বাত, হাত পা ফোলা, লিভার ও প্রস্রাবের পীড়া ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ১৪ সপ্তাহ ব্যবহারে যেরূপ মদ্যপ হউন না কেন, মদ্যে বিতৃষ্ণা জন্মিবে। ইহাতে কোনরূপ মাদক দ্রব্য নাই ও ইহা মদ্যপায়ীর অজ্ঞাতেও সেবন করান যায়। বহু ইংরাজ নর নারীর প্রশংসাপ্রাপ্ত। ইহা আফিং ত্যাগের জন্যও ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য বড় কৌটা ৯॥০, ছোট ৸৵০। ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ফিবার পাউডার

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের বহু পরীক্ষিত মহৌষধ। একদিনে জ্বর বন্ধ হয় ও ১ সপ্তাহে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়। মূল্য প্রতি কৌটা ৸০ আনা, ডজন ৬॥০, ডাঃ মাঃ স্বঃ।

বিনামূল্যে—উভয়বিধ ঔষধের নমুনা ভারতবর্ষের পাঠককে বিনামূল্যে পাঠান হয়। [১০-১২]

জুনো কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,

হাওড়াপুর—পোঃ আঃ (২৪ পরগণা)।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের

গবেষণাপূর্ণ ইংরাজী ইতিহাস গ্রন্থাবলী

১। HISTORY OF AURANGZIB

১ম খণ্ড :—শাহজাহানের রাজত্বকাল। ২য় খণ্ড :—সিংহাসন অধিকারের যুদ্ধ। ৩য় খণ্ড :—উত্তর ভারত—১৬৫৮-৮১। ৪র্থ খণ্ড :—দক্ষিণ ভারত—১৬৪৪-৮৯।

প্রতি খণ্ড পৃথক্ বিক্রয় হয়—দাম ৩॥০ করিয়া।

২। CHAITANYA'S PILGRIMAGES & TEACHINGS—মূল্য ২ টাকা।

৩। STUDIES IN MUGHAL INDIA

২২টী ঐতিহাসিক সন্দর্ভ আছে; মূল্য ২ টাকা।

৪। SHIVAJI & HIS TIMES.

ছত্রপতি শিবাজীর প্রামাণিক জীবনী; মূল্য ৪ টাকা।

৫। ANECDOTES OF AURANGZIB.

Ahkam-i-Alamgiri.

মূল; অনুবাদ, টীকা টিপ্পনীপূর্ণ; আওরংজীবের একটি জীবন চরিতও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ১।০।

৬। ECONOMICS OF BRITISH INDIA

'দেশের দশা'র তথ্যপূর্ণ অর্থ-নৈতিক গ্রন্থ, ৪র্থ সংস্করণ, ৩ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় "ভারতবর্ষে"র উল্লেখ করিবেন ।

চৈত্র, ১৩২৬

দ্বিতীয় খণ্ড] সপ্তম বর্ষ [চতুর্থ সংখ্যা

মুঘল-ভারতেতিহাসের লুপ্ত-উপাদান *

[অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্-এ, পি-আর্-এস, আই-ই-এস্]

আক্‌বর হইতে প্রথম বহাদুর শাহ্ পর্য্যন্ত, মুঘল-সম্রাট্‌গণের প্রায় দেড়শত বৎসরাধিক কালব্যাপী সরকারী ইতিহাস পাওয়া যায়। এই সকল ফার্সী ইতিহাস দিল্লীর দপ্তরখানায় রক্ষিত সরকারী চিঠিপত্র, সংবাদ-লিপি, ক্ষিপত্র, ফর্মান্ ও রাজস্ব-বিবরণীর সাহায্যে সম্রাটের আদেশে সঙ্কলিত হইত। স্থান, কাল, এবং পাত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও যথাযথ বিবরণ দেওয়া আছে বলিয়া এই সকল ইতিহাস মূল্যবান্।

সত্য বটে, সরকারী ইতিহাসগুলিতে সাহিত্য রসের সম্পূর্ণ অভাব; কেন না, ইহাদের বর্ণিত বিষয়গুলি কেবল কালানুক্রমে লিপিবদ্ধ;—একাধারে গভর্মেণ্ট গেজেট ও পুলিস রিপোর্টের মত কেবল নাম ও ঘটনার নীরস তালিকা মাত্র। কিন্তু, ঐতিহাসিকের নিকট এই শ্রেণীর বিবরণ অতি মূল্যবান্। সম্রাটের পড়িবার জন্য এবং সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে, স্বয়ং বাদশাহ্ অথবা তাঁহার উজীর কর্ত্তৃক সংশোধিত হইলেও, এই সকল রাজকীয় ইতিহাস রাজসৈন্যের পরাজয়, অথবা রাজ্যের কোন অংশে প্রাকৃতিক বিপ্লবের কথা, অধিকাংশ স্থলেই গোপন করে নাই। অনেক স্থলে দেখা যায় বটে, রাজকর্ম্মচারিগণের কার্য্যকলাপ সম্রাটের নামে আরোপিত হইয়া সরকারী ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু তাহা কিছু নূতন ব্যাপার নহে,—রাজকীয় ইতিহাসের ধারাই এইরূপ। ফরাসী সংবাদপত্র *Moniteur* নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক জেনার যুদ্ধকেই প্রুসিয়ার পতনের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু ঐ একই দিনে Auerstadt যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার জনৈক সেনাপতি ফরাসী-সৈন্যের অপর বিভাগ লইয়া, তদপেক্ষা কঠিন যুদ্ধ করিয়া, অনেক বেশী [illegible] যে বিজয়লাভ করিয়াছিল, তাহার উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।

* লাহোর Indian Records Commissionএ পঠিত।

ইতিহাস সংক্রান্ত ফার্সী ভাষায় লিখিত খুব অল্প-সংখ্যক পত্রই আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; কিন্তু উহার ১০ বৎসর পূর্ব্বের ও ১০ বৎসর পরের প্রায় তিন সহস্র ঐতিহাসিক-পত্র আমি সংগ্রহ করিয়াছি। বহু স্থানে বহু লোকের সমবেত-চেষ্টার ফলে এই সকল লুপ্ত-উপকরণ আবিষ্কৃত হইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম বহাদুর শাহ্‌র দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্ক পর্য্যন্ত (১৭০৮) মুঘল সম্রাটগণের বিস্তৃত সরকারী ইতিহাস বিদ্যমান আছে। ইহার পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস-সম্বন্ধে অনেক আত্মজীবন-চরিত, প্রতি রাজ্যাঙ্কের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার, এবং কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর নগণ্য চিঠিপত্রের সংগ্রহ পুস্তক পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীকালের (অর্থাৎ আক্‌বর হইতে বহাদুর শাহ্‌র দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্ক পর্য্যন্ত) সরকারী ইতিহাসগুলির ন্যায় এই সকল উপকরণ হইতে ঘটনার তারিখ, স্থান ও লোকের নাম, এবং বিশুদ্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাইবার উপায় নাই। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মুঘল-সাম্রাজ্য দেউলিয়া হয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে ভাঙ্গন ধরে,—যদিও জনসাধারণ ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই; অবশেষে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ্‌ এই 'তাসে-গড়া ঘর' ভাঙ্গিয়া দিয়া, সে কথা সাধারণকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন। সুতরাং ঐ কালের কোন বিস্তীর্ণ সরকারী ইতিহাস রচিত হয় নাই;—সরকারী চিঠিপত্র ও রাজস্ব বিবরণী নিয়মিতরূপে রাজদরবারে পৌঁছিত না, এবং এ সময়ে কোন রাজদপ্তরখানা যত্ন সহকারে সংরক্ষিত হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ-সংক্রান্ত যে সমস্ত ফার্সী ইতিহাস রচিত হইয়াছিল, তাহার কোনখানিই হারাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; এই কারণে ভারতেতিহাসের এই অংশ সম্বন্ধে, একমাত্র চিঠিপত্রের সন্ধান ব্যতীত, অন্য কোন অনুসন্ধান-কার্য্যের আবশ্যকতা নাই।

ঠিক এই সময়ে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক-রঙ্গমঞ্চে এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হইল। ইহারা মারাঠা জাতি। প্রথমে সম্রাটের বন্ধুরূপে আসিয়া, শেষে শত্রুরূপে প্রকট হইয়াছিল। মারাঠারা তখন ক্ষমতার উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত; সুতরাং মুঘল-রাজত্বের অবনতি, দারিদ্র্য ও ইতিহাস-রচনার অভাবের ফলে ১৭১৮ হইতে ১৭৫০ পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতেতিহাসের অন্ধকারময় স্থানগুলি আলোকিত করিবার একমাত্র উপায়—মারাঠী রাজকীয় কাগজপত্র। টিউডর ইংলণ্ডের ইতিহাসের পক্ষে ভিনিসীয় দূতের চিঠিপত্রগুলি যেরূপ অত্যাবশ্যক, মুঘল ইতিহাসের পক্ষে মারাঠী সরকারী-চিঠিপত্রও সেইরূপ বহু বিষয়ে মূল্যবান্।

কিন্তু এখানেও আমাদের বিপদ। ঠিক যেখানটায় ইতিহাসে (অর্থাৎ ১৭১৮-৫০) এই অমূল্য মারাঠী উপাদানের সাহায্য অত্যন্ত আবশ্যক, সেইখানেই উপকরণের অভাব। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে দিল্লী ও উত্তর-ভারতে অবস্থিত মারাঠা-প্রতিনিধি ও সেনাপতিগণের লিখিত মারাঠী-সরকারী চিঠিপত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। রাও বহাদুর দ-ব-পারসনিস্ (D. B. Parasnis) দিল্লীর মারাঠা-দূতগণের যে-সমস্ত পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা ১৭৮০ হইতে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত; এদিকে হোল্‌কারের দরবার হইতে পুনায় লিখিত সরকারী পত্রগুলির সময় ১৭১৯ হইতে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। বাসুদেব বামন খরে নামক জনৈক স্কুল-পণ্ডিত প্রভূত যত্ন, ঐকান্তিক অনুরাগ ও বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের পটবর্দ্ধন্ রাজপরিবারের ঐতিহাসিক পত্রের যে বিপুল সমষ্টি (৯ খণ্ডে) প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার অতীত। খরে মহাশয়ের পত্রগুলির তারিখ ১৭৬১-১৮০৩; কেবলমাত্র দুইখানি পত্র ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত। বহু মারাঠী পণ্ডিত, দীর্ঘকালব্যাপী সমবেত-অনুসন্ধানের ফলে যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহা সামান্য; এই জন্য মনে হয়, ১৭১৮ হইতে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত দিল্লী-সংক্রান্ত ব্যাপারের প্রচুর মারাঠী দলিল-দস্তাবেজ ভবিষ্যতে ভারতের কোথাও যে আবিষ্কৃত হইবে, তাহার সম্ভাবনা খুব কম।

নাগপুরের মারাঠা-নরপতিরা (অর্থাৎ ভোঁসলা রাজবংশ) হয় ইতিহাস বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, অথবা ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের ফলে তাঁহাদের সরকারী-কাগজপত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে;—আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। পুনার মারাঠা অধিপতিগণের (পেশ্‌বা) যথেষ্ট সাহিত্যানুরাগ ছিল,—ফলে তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ বহু লিখিত-কাগজপত্র রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এগুলি সাধারণতঃ ইংরেজ-যুগের, অর্থাৎ

১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে। নাগপুর-কর মারাঠারা নবাব আলিবর্দীর সময়ে বঙ্গ ও উড়িষ্যায় বহু অভিযান করিয়াছিলেন; এ অভিযানগুলির কোন সমসাময়িক মারাঠা বিবরণ নাই; এ সম্বন্ধে ফার্সী ভাষায় লিখিত ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত,—তাহাতে তারিখের অভাব; আবার ইংরেজ-কুঠির কাগজপত্রও এসম্বন্ধে একপ্রকার নীরব। নূতন উপাদান আবিষ্কৃত হইয়া ভারতেতিহাসের এই অন্ধকারময় অংশ কোন দিন যে আলোকিত হইবে, তাহা মনে হয় না।

১৬৫৮ হইতে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতেতিহাসের মূল-উপাদানের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল। আশা করি, যাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, কোনদিন যদি তাঁহারা ফার্সী, হিন্দী, অথবা মারাঠী সরকারী-কাগজপত্রের সংস্রবে আসেন, তাহা হইলে ইতিহাসের কোন্ অংশের জন্য বিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

অগ্নি-সংস্কার

[ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম এ, ডি এল]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের এক মাস পর সন্তোশ বিলাত গেল; কিন্তু ইহার মধ্যেই বেশ এক-পত্তন গোলযোগ হইয়া গেল। তাহার ফলে, বিলাত-যাত্রার সময়ে সন্তোশ অনুভব করিল যে, সংসারে সে এবং ইলা সম্পূর্ণ একা!

কালীভূষণ বাবু পুত্রকে বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন, সখ করিয়া। কিন্তু না জানি কোন্ অশুভ মুহূর্ত্তে তিনি ইলাকে দেখিয়াছিলেন—তিনি তাহাকে কিছুতেই পছন্দ করিতে পারিলেন না। তাহার ধরণ-ধারণ যে অনেকটা মেমসাহেবী গোছের হইবে, তাহা তিনি আন্দাজ করিয়াছিলেন, এবং তাহার জন্য প্রস্তুতও ছিলেন; কিন্তু, তার কার্য্যকলাপ যে তাঁর চক্ষে এতটা বিঁধিবে, তাহা তিনি হিসাব করেন নাই।

কালীভূষণ বাবু বিপত্নীক, আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার সংসারে চাকর বামণ ছাড়া কেহই নাই। একটি মেয়ে আছে, সে মাঝে-মাঝে আসিয়া দুই এক মাস থাকে। এই বিবাহে তাহাকে তাহার স্বামী আসিতে দেয় নাই। পত্নী-বিয়োগের পর হইতে কাজেই কালীভূষণ ও তাঁহার পুত্রের ভিতর যতটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, পিতা-পুত্রে ততটা ঘনিষ্ঠতা সচরাচর হয় না।

বিবাহের উৎসব মিটিয়া যাইবার পর প্রায় ১৫ দিন সন্তোশ ফরিদপুরে ছিল। ইহার মধ্যেই পিতা-পুত্রের সে ঘনিষ্ঠতা দূর হইয়া বেশ একটু অনাত্মীয়তার ভাব দাঁড়াইয়া গেল।

কালীভূষণের ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহার কাছে ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সে খট্-খট্ করিয়া আসিয়া একঘর লোকের সামনে তাঁহার সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড করিবে, এতটা তিনি কল্পনা করেন নাই। ইলা যখন শ্বশুরকে এইরূপে অভিবাদন করিতে আসিল, তখন কালীভূষণ জোর করিয়া হাসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণে শঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

ইলার হৃদয় অত্যন্ত নরম; তা' ছাড়া, সে সন্তোশকে সত্য সত্যই ভালবাসিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্তোশের সংশ্লিষ্ট সকলের উপরই সে সহজেই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কালীভূষণ বাবুকে সে ঠিক তা'র নিজের বাপের মত ভালবাসিয়া ফেলিল; এবং তাঁহার কাছে সকল লজ্জা-সঙ্কোচ দূর করিয়া, দুই-চারিদিনেই ঠিক মেয়ের মত আদর-আব্দার জুড়িয়া দিল। পুত্রবধূর এই আদরের ধাক্কা কালীভূষণের ভাল লাগিল না। ইলার ভালবাসা বাঙ্গালীর ঘরের কুলবধূর মত নীরব সেবায় পরিস্ফুট হইত না; তাহা যেন অত্যন্ত গায়ে-পড়া ভাবে প্রকাশ পাইত। সেবা যে ইলা করিত না তাহা নহে; কিন্তু—কেমন যেন কালীভূষণ বাবুর বাধ-বাধ ঠেকিত।

কালীভূষণ বাবু কাছারী হইতে আসিবামাত্র ইলা ছুটিয়া তাঁহার কাছে যাইত,—বাহিরের ঘরে এতটা ছুটিয়া আসা কালীভূষণের চক্ষে বাধিত। তাঁহার ইজি চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া ফস করিয়া তাঁহার হাত হইতে পাখাখানা কাড়িয়া লইয়া ইলা তাঁহাকে বাতাস করিত; সঙ্গে-সঙ্গে ফড়ফড় করিয়া ঠাট্টা-তামাসা করিয়া যাইত। একদিন কালীভূষণ সাহস করিয়া কি একটা কথায় একটু নম্রভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইলা সেটাকে ঠাট্টা মনে করিয়া, পাখা দিয়া তাঁহার গালে ঠোনা মারিয়া বলিল, "Now, now, old boy, don't be naughty, will you?"

কালীভূষণের আর সহ্য হইল না। তিনি মুখ কাল করিয়া উঠিয়া পড়িলেন,—আর পুত্রবধূর সঙ্গে কোনও কথা বলিলেন না। ইলা ব্যথিত হইল, কিন্তু বুঝিল না সে কি অপরাধ করিয়াছে। সে সত্যেশের কাছে ছুটিয়া গেল, এবং তাহার কাছে সকল কথা বলিল। সত্যেশ বুঝিল, কিন্তু স্ত্রীকে কিছু বলিতে পারিল না। পিতার উপরও কিছু অসন্তুষ্ট হইল,—তিনি ইলার স্বচ্ছ হৃদয় দেখিতে না পাইয়া কেবল বাহিরের কথাটা ধরিয়া রাগ করিলেন বলিয়া। সত্যেশ দেখিল, ইলা দুঃখিত হইয়াছে; তাহার উপর আবার তাহাকে অপ্রিয় উপদেশ দিয়া আরও কষ্ট দিতে তাহার ক্লেশ বোধ হইল। তাই সে মোটের উপর বলিল যে, তাহার পিতার সহিত অতটা ঘনিষ্ঠতা করিবার দরকার নাই।

ইলা তাহার প্রাণপূর্ণ স্নেহ লইয়া শ্বশুরের কাছে যে ধাক্কা খাইল, তাহাতে সে একটু মুশড়িয়া গেল। তাহার পর আর শ্বশুরের কাছে সে বড় যাইত না। কিন্তু সে সর্ব্বদাই সত্যেশের সঙ্গে-সঙ্গে থাকিত; সব সময়ে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা, হাসি-তামাসা, খেলা-ধূলা প্রভৃতি প্রেমের অভিনয় লাগিয়াই থাকিত। তাহাও কালীভূষণ বাবুর চক্ষে ভাল লাগিত না। এতটা বেহায়াপনা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তিনি হয় তো সত্যেশকে ডাকিলেন একটা কথা বলিবার জন্য; সত্যেশ আসিয়া দাঁড়াইতেই, হয় তো ইলা তাহার পিছু-পিছু আসিয়া সত্যেশের হাত ধরিয়া, কখনো বা কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইল;—তাঁহার সম্মুখেই স্বামীর সঙ্গে এমন সব বিষয়ে হাস্য-পরিহাস আরম্ভ করিল, যাহা খুব অগ্রসর হিন্দুর ঘরেও শ্বশুর সহসা বরদাস্ত করিতে পারেন না।

পনেরো দিন না যাইতেই কালীভূষণ বুঝিলেন যে, এ বউ লইয়া তাঁহার ঘর করা চলিবে না। বধূও বুঝিল, শ্বশুরের সঙ্গে তাহার বনিবে না। পুত্র দুঃখিত হইল, কিন্তু চটিল বেশী বাপের উপর; কেন না, ইলা ছেলেমানুষ, যে সমাজে মানুষ হইয়াছে, সেই সমাজের হাবভাব আচার-ব্যবহার তাহার মধ্যে দেখা যায় বলিয়া তাহার উপর রাগ করিবার কিছু নাই। যখন ইলার হৃদয় এত মধুর, তখন তাহার পিতার সেই খাতিরে তাহার ব্যবহারের ত্রুটি অগ্রাহ্য করা উচিত ছিল।

পনেরো দিন পরে ইলাকে লইয়া সত্যেশ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। এখানে আসিয়া দেখিল, এখানে তাহার কাহারও সঙ্গে বনে না।

লীলার প্রতি প্রথম দর্শনেই তাহার একটা বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল; সে বিদ্বেষ গেল না, বরং বাড়িয়া গেল। লীলা যে তাহাকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত, তাহা তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। তামাসার ছলে সে অত্যন্ত কড়া-কড়া কথা বলিত, তাহা হজম করা সত্যেশের পক্ষে কঠিন হইত। ইলাকে সে প্রায়ই তাহার সম্মুখে "বাঁদরের গলায় মুক্তাহার" বলিয়া ডাকিত; এবং কথাবার্ত্তায় এটা খুব স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দিত যে, সামাজিক হিসাবে সত্যেশ তাহাদের অনেক নীচে,—তাহারা কেবল অনুগ্রহ করিয়া সত্যেশকে জাতে তুলিয়া লইয়াছে। এই সব কথাবার্ত্তায় সত্যেশের মুখ লাল হইয়া উঠিত, কিন্তু সে কিছু বলিত না। ইলাও এ সব কথায় শঙ্কিত হইয়া উঠিত, এবং ফাঁক পাইলেই সে স্বামীর হাত ধরিয়া করুণ স্বরে বলিত, "তুমি রাগ করবে না বল? দিদির কথা কাণে তোলে কে? এ তো কেবল দু'দিনের জন্য। তুমি ফিরে এলে আমরা তো সম্পূর্ণ স্বাধীন হ'তে পারবো।" ইত্যাদি নানা কথায় সে সত্যেশকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিত।

মালতীর যে কোনও ব্যক্তিত্ব আছে, তাহার পরিচয় সত্যেশ পায় নাই। তাঁহার সঙ্গে সত্যেশের সামান্যই কথাবার্ত্তা হয়; তাহাতে স্নেহের চেয়ে সৌজন্যের ভাবই বেশী প্রকাশ পায়। মালতী দেবীর সৌজন্যের অভাব ছিল না, কিন্তু সহৃদয়তা অন্ততঃ সত্যেশের উপর প্রকাশ পায় নাই।

সুবোধ ও অন্যান্য ছেলেরা সকলই এক প্রকার। তাহাদের সত্যোশের উপর নীলার মত কোনও আক্রোশ ছিল না। তবে তাহারা যে সত্যোশের চেয়ে ঢের উঁচুদরের লোক, এ বিশ্বাস তাহারা কিরূপে দূর করিবে? সুবোধ সত্যেশকে অনুগ্রহ করিতে, তাহার প্রতি বেশ একটু সহৃদয়তা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক ছিল না; কিন্তু সত্যোশ সে গর্ব্বের দান গ্রহণ করিতে মোটেই উন্মুখ ছিল না। সত্যোশের চক্ষুলজ্জায় অনেক সময়ে শক্ত সত্য কথাটা বলিতে মুখে ঠেকিত; কিন্তু মনে-মনে সে নিজেকে দুনিয়ার কাহারও চেয়ে খাটো মনে করিত না। তাই, যেখানে সহৃদয়তা উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অনুগ্রহ বিতরণ করিতে চায়, সেখানে সত্যোশ কিছুতেই হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইতে পারিত না।

চ্যাটার্জ্জী সাহেবের সঙ্গে সত্যোশের দেখাশুনা অত্যন্ত কম হইত। তাঁর কাজ-কর্ম্ম এত বেশী যে, তিনি পরিবারের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার বড় বেশী অবসর পাইতেন না। যতটুকু দেখাশুনা সত্যোশের হইয়াছিল, তাহাতে তাহার শ্বশুরকে মন্দ লাগে নাই; কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, তাঁহার কথায় ও কাজে অনেক তফাৎ। তাঁহার সকল বিষয় সম্বন্ধেই বেশ স্পষ্ট এবং দৃঢ় মতামত ছিল। যে কোনও বিষয় হউক না কেন, তিনি তাহা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতেন; এবং অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তাহার সম্বন্ধে নানা মতামত প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তাঁহার আদালতের কাজের বাহিরে অন্য কোনও কাজেই তিনি নিজেকে লাগাইতে পারিতেন না। মত যাই হউক, তাহাকে কাজে লাগাইবার জন্য যে উৎসাহ ও উদ্যমের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার মোটেই ছিল না। মতের অনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহার ইচ্ছার অভাব ছিল না; এমন কি প্রায় মাসে একবার তিনি তাঁহার সমস্ত জীবনের আমূল সংস্কারের জন্য সঙ্কল্প করিতেন;—কিন্তু খুব একটা প্রচণ্ড ঝোঁকের মাথায় যদি বা কদাচিৎ একটা-আধটা কাজ আরম্ভ করিয়া বসিতেন, সে কাজ খুব বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিত না,—একটা দারুণ আলস্য ও উদাসীনতা প্রত্যেক উদ্যমকে নিঃশেষে গ্রাস করিয়া বসিত।

ইলার বিবাহটা চ্যাটার্জ্জী সাহেবের জীবনের একটা খুব বড় কাজ, যাহাতে তিনি তাঁহার মত বাহাল রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ হইয়া যাইবার পরই, তিনি পূর্ব্ববৎ অচল হইয়া ব্রীফ্ ঘাঁটিতে এবং ডিনার টেবিলে তীব্র সমালোচনা ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন,—তাঁহার সংসারের সঙ্গে তাঁহার অন্য সকল সম্পর্ক ছুটিয়া গেল। এমন কি, যে সত্যোশের সম্বন্ধে বিবাহের পূর্ব্বে তিনি এত উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন যে, চাই কি তাহার জন্য পরিবারের সকলকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন,—বিবাহ হইয়া গেলে তাহার সম্বন্ধেও বিশেষ কোনও চিন্তা বা আগ্রহের পরিচয় তিনি দেন নাই।

সুতরাং শ্বশুরবাড়ীতে এমন কেহ ছিল না, যাহার প্রতি সত্যোশ বিশেষ আকৃষ্ট হইতে পারে। তাই বিবাহের পরই সত্যোশ দেখিতে পাইল যে, এই সংসারে সে এবং ইলা বড় একা। এ সময়ে এ চিন্তা বিশেষ কষ্টকর হয় নাই; কেন না, জীবনের এই সময়ে লোকে এমনি একা হওয়াটা বরঞ্চ একটা কামনার বিষয় বলিয়াই মনে করে। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ঝোঁকে তাহাদের কাছে সমস্ত বিশ্বসংসার একটা অনাবশ্যক বাধা বলিয়া বোধ হয়। কোনও কিছু না থাকে—অনন্ত শূন্যের মধ্যে শুধু দুইটি প্রাণ—তাহা হইলেই বেশ ভাল বোধ হয়। তাই সত্যোশ বেশী পীড়িত হইল না; সে ইলাকে আরও বেশী করিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইল, আরও একটু প্রগাঢ় ভাবে চুম্বন করিল; মনে-মনে ভাবিল, সেই ভাল,—আমি আর তুমি—আমরা একাই আমাদের জীবনতরী কালের সাগরে ভাসাইব। উপস্থিত সে অত্যন্ত একা তরী ভাসাইয়া বিলাত যাত্রা করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সত্যোশ বিলাত হইতে গোঁফশুদ্ধই ফিরিয়া আসিল। এ কথাটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার যোগ্য; কারণ ইহার ভিতর একটা তথ্য নিহিত আছে। বিলাতে গেলে গোঁফ কামানটাই রেওয়াজ; কেন না, সেখানে চারিদিকে কামান গোঁফের মাঝখানে নিজেকে কতকটা হংস মধ্যে বক গোছ মনে করিয়া, লোকে শেষে গোঁফ কামাইয়া ফেলে। যে এই গড্ডলিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া না দিয়া গোঁফ লইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া আসে, তার ভিতর আর কিছু থাকুক

না থাকুক, একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা ব্যক্তিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সত্যেশের যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ছিল।

সে ফিরিয়াছিল বেশ একটু প্রতিষ্ঠা লইয়া। ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় গিয়া, একটা প্রকাণ্ড যন্ত্রের কারখানায় দুই বৎসর চাকরী করিয়া, সে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সেই কারখানার কলিকাতায় একটি ব্রাঞ্চ ছিল। তাহাতে ভাল কাজ হইতেছিল না। কারখানার কর্তৃপক্ষ স্থির করিলেন যে, কেবলমাত্র দোকানদার দিয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না,—কলিকাতায় একটা রীতিমত শাখা কারখানা ও বড় রকমের আফিস করিয়া কারবার আরম্ভ করিতে হইবে। ম্যানেজার সাহেব সত্যেশের কাযে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; তাই তিনি সত্যেশকেই কয়েক মাস শিক্ষা দিয়া, কোম্পানীর এই শাখা কারবারের ডিরেক্টার রূপে পাঠাইয়া দিলেন; সঙ্গে আরও অনেক কর্ম্মচারী আসিল। অল্প দিনের মধ্যেই ম্যাসাচুসেট্স্ মেসিনারী লিমিটেডের ব্যবসায় ভারতবর্ষে কাঁপিয়া উঠিল,—কারখানাও ক্রমশঃ বিরাট আকার ধারণ করিতে লাগিল। কিন্তু সে পরের কথা।

যখন সত্যেশের ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া লাগিল, তখন তাহাকে আনিতে গিয়াছিলেন তাহার পিতা, তাহার শ্বশুর, শ্যালী এবং ইলা। মালতী দেবী বৎসর দুই পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সত্যেশ জেটীতে নামিয়াই পিতা ও শ্বশুরের পাদবন্দনা করিল, এবং হাসিমুখে তাঁহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিল। ততক্ষণ ইলা তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ভরিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার আভা তাহার সমস্ত মুখ লাল করিয়া দিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরেই লীলা আসিয়া পিতাকে বলিল, "বাবা, তুমি ওকে একচেটে করে (monopolise) রাখলে চ'লবে কেন? তুমি ছাড়া আরও অন্য লোকে ওকে রিসীভ ক'রতে এসেছে।" বলিয়া আড় চোখে ইলার দিকে চাহিয়া সত্যেশকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। চ্যাটার্জ্জী হাসিলেন। কালীভূষণও হাসিলেন; কিন্তু সে হাসি তাঁহার ওষ্ঠাধরের নীচে আর ঢুকিল না,—বরং মুখটা তাহাতে যেন একটু অন্ধকারই হইয়া উঠিল। সত্যেশকে বগলদাবা করিয়া ইলার কাছে হাজির করিয়া লীলা বলিল, "এই নেও তোমার আসামী।"

ইলা ঈষৎ লজ্জিত ভাবে সত্যেশের বুকের কাছে অগ্রসর হইয়া মুখ বাড়াইয়া দিল। সত্যেশ ভয়ানক লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু লজ্জার মাথা খাইয়া তাহাকে সেই একহাট লোকের সামনে ইলাকে চুম্বন করিতে হইল। চুম্বন করিয়াই সে ব্যস্ত ভাবে তাহার লগেজ দেখিতে লাগিল। তার পর সমান ব্যস্ত ভাবে, আর কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া, সটান গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

"Stop thief" বলিয়া হাসিতে-হাসিতে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, লীলা ইলাকে কুক্ষিগত করিয়া সেই গাড়ীর ভিতর উঠিয়া প'ড়িল। চ্যাটার্জ্জী ও কালীভূষণ বাবু ভিন্ন-ভিন্ন গাড়ীতে গেলেন। স্ত্রী ও শ্যালীর কাছে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে সত্যেশ বসিয়া রহিল। সে সঙ্কোচ কাটিল যখন নিরিবিলি ইলার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল।

তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। চ্যাটার্জ্জী সাহেবের বাড়ীতেই একটি সুসজ্জিত শয়ন-গৃহে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। সত্যেশের জন্য বালীগঞ্জে একটা স্বতন্ত্র বাড়ী লওয়া হইয়াছে; এবং ইলা নিজে গিয়া তাহা আসবাব দিয়া তাহার মনের মত সাজাইয়াছে; কিন্তু আজকার মত তাহাদের এইখানেই থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সত্যেশ সেই বৈকাল বেলা হইতে সমস্ত সময় মনে-মনে কথা গাঁথিয়াছে; কেমন করিয়া ইলাকে তাহার বিলাতী বেহায়াপনা হইতে নিবৃত্ত করিবে তাহার সব কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইলা যখন বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া, তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তখন সে-সব কথা এলোমেলো হইয়া গেল; আরও নিবিড় ভাবে তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহাকে অনর্গল চুম্বন করা ছাড়া তাহার অন্য উপায় রহিল না।

অনেকক্ষণ পর সত্যেশ ইলার মুখখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কাঁদছ কেন পাগল?"

ইলা হাসিয়া বলিল, "আমি কি ছাই জানি? আজ তোমাকে সত্যি-সত্যি আমার কাছে পেয়ে কেবলি আমার কান্না পাচ্ছে। যেন বিশ্বাস ক'রতে পারছি না যে, এটা সত্যি।"

এ কথার একমাত্র উত্তর যাহা সম্ভব, সত্যেশকে তাহাই দিতে হইল।

সত্যেশ বলিল, "তুমি কি আমার জন্য একটুই পাগল

হ'য়েছিলে ? আমি তো ভেবেছিলাম বুঝি তোমার আমার জন্যে কোনও ভাবনাই হয় নাই। আমি তোমার কাছে নেই, অথচ তুমি টক্-টক্ ক'রে বি-এ, এম-এ পাশ ক'রে গেলে দেখে, আমি তো রাগই ক'রে ফেলেছিলাম। বিরহে এ রকমটা হওয়া তো কোন কাব্যশাস্ত্রের অনুমোদিত নয় !"

ইলা। তা' ব'লবে বই কি ? আর মশায় কিঁ ক'রছিলেন তত্তক্ষণ ? এতগুলো একজামিন পাশ ক'রলেন, তা'তে হ'ল না ; আবার আমেরিকায় গেলেন চাকরী ক'রতে ! আমি তো ভেবেছিলুম যে, আমার আর কোনও দরকারই নেই,—বিলাতী রূপসীদের ঘূর্ণীবায়ে এই বাঙ্গালী পেত্নীর মূর্ত্তি বুঝি ধুয়ে-পুঁছে গেছে।

"ওঃ ! তাই তো, বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে !" বলিয়া সত্যেশ মহা ব্যস্ততার ভান করিল। ইলা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি ভুল হ'য়ে গেছে ?"

সত্যেশ। বিলাত যাবার সময় অনেকগুলি প্ল্যান ক'রে গিয়েছিলাম,—তার মধ্যে একটি ছিল, বিলাতী সুন্দরীদের চর্চ্চা করা। আহা হা ! বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে,—কাজের ভিড়ে কথাটা মনেই ছিল না।

ইলা হাসিয়া বলিল, "বুঝা গেছে গো, বুঝা গেছে ; you protest too much."

সত্যেশ। কেন protest ক'রতে যাব। এটা তো আর লজ্জার কথা নয় যে, সত্যি হ'লে অস্বীকার ক'রবো—এতো একটা গর্ব্বের কথা ! বিশ্বাস না কর, তোমার দাদাকে কি যোবকে—"

ইলা তাহার ছোট্ট হাতখানি সত্যেশের মুখের উপর দিয়া বলিল, "রাখ, এখন ঝগড়া বাধাতে হ'বে না। আমি এত দিন যে এই দিনটির আশায় পথ চেয়ে ব'সে আছি, সে কি ঝগড়া করবার জন্যে ?"

সব গোল মিটিয়া গেল। ইলা জিতিল, সত্যেশের বক্তৃতা মুলতুবী রহিল।

তিন-চার দিন পরে সত্যেশ ঢাকায় পিতার কাছে গেল। গিয়া দেখিল, না গেলেই ছিল ভাল। কালীভূষণের মন পুত্রের উপর সম্পূর্ণ বিরূপ হইয়াই ছিল। যেদিন সে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসে, সে দিন পুরাতন স্নেহ একটু চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু সেইদিন জাহাজ-ঘাটের বিসদৃশ ব্যাপারের পর ছেলের সঙ্গে আর তাঁহার কোনও রকম সংশ্রব রাখার ইচ্ছা রহিল না। সত্যেশ বেদনা লইয়া পিতার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিল। কলিকাতায় আসিয়া তাহার আপন গৃহে ইলার বক্ষে আশ্রয় লাভ করিয়া তাহার তপ্ত হৃদয় শান্ত হইল।

ইহার পর সত্যেশকে কয়েক মাস হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে হইল। এক বৎসরকাল দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সে কারখানাটীকে দাঁড় করাইল এবং ব্যবসায়ের বিস্তার করিল। ম্যাসাচুসেটস্ মেসিনারী লিমিটেডের প্রকাণ্ড কারখানা এবং তাহাদের যন্ত্রপাতির সৌন্দর্য্য ও উপযোগিতা অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের নাম ভারতবর্ষে সুপরিচিত করিয়া তুলিল। কিন্তু এতটা দাঁড় করাইতে সত্যেশকে এক বৎসর দিন-রাত খাটিতে হইয়াছিল। প্রায় দিনই দিবারাত্রি তাহাকে কারখানায়ই থাকিতে হইত,—বালিগঞ্জে ফিরিবার সুবিধা হইত না।

এ এক বৎসর সত্যেশ বাড়ী সম্বন্ধে কোনও খোঁজ-খবরই রাখিত না। যখন বাড়ী ফিরিত, তখন প্রায়ই গভীর রাত্রি। কোন মতে দুটো খাইয়া গভীর নিদ্রা দিয়া ভোরে উঠিয়াই আবার তাহাকে কারখানায় যাইতে হইত। ইলা বড় ক্ষুব্ধ হইত ; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিত না। একদিন সে বলিল, "কারখানায় তোমার quarters করে নাও না,—তা হ'লে তো বেশ হয়। এত খাটুনির উপর এই চার মাইল রাস্তা দু'বেলা দৌড়াদৌড়ি সইবে কি ?"

সত্যেশ হাসিয়া বলিল, "রক্ষা কর ! সমস্ত দিন কলের মাঝখানে থেকে, অন্ততঃ রাত্রিটাতে একটু ধারণা ক'রতে চাই যে, আমি মানুষ। কারখানার ভিতর বাস ক'রলে হয় তো ক্রমে আমিও একটা কল হ'য়ে যাব।"

মাঝে-মাঝে সত্যেশ ইলাকে কারখানায় লইয়া যাইত—সেদিন কারখানার কাজটা একটা Pic-nic গোছের হইয়া উঠিত। কিন্তু সে কালে-ভদ্রে। বেশীর ভাগ সময় ইলার সঙ্গে তাহার দেখা-শুনাই হইত না।

কারখানাটা যখন গড়িয়া উঠিল এবং কারবার যখন বেশ জমিয়া উঠিল, তখন সত্যেশ একটু সকাল-সকাল বাড়ী ফিরিতে লাগিল, এবং বাড়ীর চারিদিকে একটু দৃষ্টি দিতে পারিল। তখন যাহা তাহার নজরে পড়িল, তাহাতে সে প্রীতি লাভ করিল না।

বিকাল-বেলায় বাড়ী ফিরিয়া সে দেখিতে পাইত যে, বাড়ীতে বিলাত-ফেরত সমাজের অকর্ম্মণ্য ছোকরাদের বাজার বসিয়া গিয়াছে। টেনিস খেলার উপলক্ষ করিয়া ইহারা রোজ আসিত; এবং প্রায় সমস্তটা সন্ধ্যাকাল বাজে গল্পগুজবে কাটাইয়া যাইত; এবং কেহ-কেহ ডিনার পর্য্যন্তও থাকিয়া যাইত। সত্যেশের ইহা ভাল লাগিত না, তাহার অনেক কারণ। প্রথমতঃ, তাহার কর্ম্মের এই স্নিগ্ধ অবসরটুকু সে সম্পূর্ণরূপে ইলাকে দিয়া ভরিয়া রাখিতে চাহিত; কিন্তু এই সব বন্ধুর অত্যাচারে সে ইলাকে পাইতই না। বাড়ীতে অতিথি থাকিলে অবশ্য স্ত্রী স্বামীর দিকে নজর দিতে পারে না! তা' ছাড়া, এই যে কতকগুলি অকর্ম্মণ্য যুবকের সঙ্গে নিত্য-নৈমিত্তিক এতটা মেলা-মেশা,—ইহা সত্যেশের মোটেই ভাল লাগিত না। সত্যেশের ইহাতে রাগ হইত; মনে হইত যে, ইলা তাহাকে বাস্তবিক যথেষ্ট ভালবাসে না,—তার প্রাণটা ঠিক ষোলআনা তাহার উপর বসিয়া নাই। কোনও প্রেমমুগ্ধ যুবকই এ চিন্তায় স্বস্তি বোধ করিতে পারে না। বিশেষতঃ, এই অতিমাত্র বিলাতী দলের কথাবার্ত্তা, ধরণ-ধারণ সত্যেশের মোটেই পছন্দ হইত না। ইহাদের সঙ্গে কথা কহিতেই সে ভালবাসিত না,—অথচ তাহার স্ত্রী কি না এইগুলাকেই বাড়ীর ভিতর আনিয়া ভিড় করে। কিন্তু সব চেয়ে বেশী রাগের কারণ এই যে, শিক্ষিতা স্ত্রীর সাহচর্য্যের যে আদর্শ সত্যেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল, এই দলের ভিড়ে সে আদর্শ মাথা তুলিতে পারিত না। সারা বৎসরের মধ্যে একটা দিনও সত্যেশ তাহার স্ত্রীর সঙ্গে বসিয়া একখানা বই পড়িতে পারে নাই—অন্য প্রকার সাহিত্য-আলোচনা তো দূরের কথা। অথচ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের আলোচনাই ছিল সত্যেশের জীবনের প্রধান আনন্দ।

সত্যেশ বিরক্ত হইত, কিন্তু কিছু বলিত না। ইলার সঙ্গে এ সম্বন্ধে একটা বোঝা-পড়া করিবার ইচ্ছা তাহার অনেকবার হইয়াছে; কিন্তু বলি-বলি করিয়াও কথাটা বলা হয় নাই। যেটুকু সময় দিনের মধ্যে দুইজনে নিরিবিলি থাকিতে পারিত, ততক্ষণ ইলা এমন ভাবে সত্যেশের নিকট আদর কাড়িয়া লইত যে, সত্যেশের কিছু বলা হইত না। সে এমন সম্পূর্ণ ভাবে সত্যেশের কাছে আত্মসমর্পণ করিত, এবং সেই আত্মসমর্পণে তাহার হৃদয় এত স্পষ্টভাবে কৃতার্থতায় ভরিয়া উঠিত যে, তখন সামান্য বিরোধের কথা তুলিয়া তাহাকে দুঃখ দিতে সত্যেশের মন সরিত না। কাজেই, মনের বিরাগ মনেই থাকিয়া যাইত; এবং যে কথা হয় তো একদিনকার মৃদু আপত্তিতে জন্মের মত নিষ্পত্তি হইতে পারিত, সে কথা মনের ভিতর ঘুঁটের আগুনের মত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই নূতন-নূতন বিরক্তির কারণ ঘটিতে লাগিল,—ততই ইলার প্রতি সত্যেশের প্রেম ক্রমে বিদ্বেষে পরিণত হইতে লাগিল। ইলার প্রত্যেক কাজে সত্যেশ ত্রুটি দেখিতে লাগিল;—তাহার দোষগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল; গুণ তাহার চক্ষে ধরা পড়া বন্ধ হইল।

ইলা স্বামীর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে নাই এমন নহে। সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, সত্যেশ আর পূর্ব্বের মত হাসে না, খুব গম্ভীর হইয়া থাকে। তাহার চোখে-মুখে একটা শ্রান্ত ক্লান্ত ভাব,—যেন জগতের কিছুই তাহার কাছে আনন্দদায়ক হইতে পারে না। ইলা ভাবিল, বুঝি কাজের ভিড়ে এই রকম হইয়াছে। সে একদিন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া স্বামীকে বলিল, "দেখ, তুমি মাস-খানেক ছুটি নাও; চল, দার্জ্জিলিঙ্গ কি কোথাও যাওয়া যা'ক।"

কথাটায় যেন সত্যেশ একটু উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই পূর্ব্ববৎ শ্রান্ত ভাবে সে কপালের উপরকার বড় বড় চুলগুলি বাঁহাত দিয়া ঠেলিয়া বলিল, "কি হ'বে? তা' ছাড়া দার্জ্জিলিঙ্গে যে ভিড়!"

এখন আর সত্যেশ এমনি ছোট ছোট কথা বই বলিত না।

ইলা কিন্তু ছাড়িল না। দার্জ্জিলিঙ্গ না পছন্দ হয় তো শিলং কি সিমলা কি অন্য কোথাও যাওয়া যাইবে। সত্যেশ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে বলিল, "খুব নির্জ্জন একটা জায়গায় সমুদ্রের ধারে গেলে বোধ হয় মন্দ হয় না। ধর, কক্স্-বাজার।"

ইলা বলিল, "বেশ, তবে সেইখানেই চল।"

"আমি যেতে পারি, কিন্তু তুমি যাবে কি? সেখানে মোটেই society নেই, তোমার ভারি নির্জ্জন লাগবে।"

ইলা কথা বলিল না, খানিকক্ষণ নীরবে কেক কাটিতে লাগিল। তাহার মুখ একটু লাল হইয়া উঠিল, চোখের

কোণে ক্রমে একটু জল দেখা দিল,—সে মুখ ফিরাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সত্যেশ ভেবা-চেকা খাইয়া গেল। সে কথাটা একটু খোঁচা দিবার উদ্দেশ্যেই বলিয়াছিল, এবং মনে বেশ একটু ইচ্ছা ছিল যে, কথাটা যখন উঠিয়াছেই, তখন একটা এস্পার-ওস্পার হইয়া যা'ক। ইলা যদি কোনও একটা জবাব দিত, তাহা হইলে হয় তো সবটা খোলাখুলি হইয়া গিয়া যা হউক একট হইয়া যাইত। কিন্তু, স্ত্রীজাতির অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ইলা সত্যেশের আক্রমণের সব প্ল্যান এলোমেলো করিয়া দিল। সত্যেশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ভাল রে ভাল, এতে কান্না কিসের জন্তে—সত্যি-সত্যি তোমার সে জায়গা ভাল লাগবে না, তাই বলেছি। তা না হয় তুমিও চল না, দেখতে পাবে।"

ইলা অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "না থাক্।"

সত্যেশ বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার প্ল্যান ছিল, সে-ই অভিমান করিবে, রাগ করিবে,—তার উপর ইলার যত অত্যাচার, ইলার যত অন্যায় তাই লইয়া খুব দু'কথা শুনাইবে। কিন্তু সব উল্টা হইয়া গেল। চোখের জল ফেলিয়া ইলা টেক্কা দিয়া গেল, সত্যেশকেই সাধাসাধি করিতে হইল। অনেকক্ষণ পরে অভিমানের পালা মিটিল, দু'জনের কক্সবাজার যাওয়াই ঠিক হইল। আয়োজন হইতে লাগিল,—পরের সপ্তাহেই তাহারা রওনা হইবে।

পরের দিন বিকালের মজলিসে কথাটা পাড়া হইতেই, লীলা ও মিঃ ঘোষ এবং সুবোধ ইলার সঙ্গী হইবার প্রস্তাব করিল। চ্যাটার্জ্জী সাহেবের এক মক্কেলের কাছে চিঠি লেখা হইল। লীলা গিয়া আরও সঙ্গী জুটাইল,—একটা প্রকাণ্ড পিক্‌নিক্ পার্টি ইহাদের সঙ্গে জুটিয়া গেল।

সত্যেশ সেদিন আফিস হইতে একটু দেরীতে ফিরিল। ডিনারের সময় ইলা বলিল, "কক্সবাজার আমার কাছে নির্জ্জন হ'বে বলে তুমি ভয় পাচ্ছিলে,—সে ভয় আর নেই।"

সত্যেশ একটু চমকিত হইয়া বলিল, "কেন ?"

ইলা হাসিয়া বলিল, "দাদা, দিদি, নলিন, যতীশ মিত্তির আর সতীশ বোস এরা সবাই আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। আরও দু'একজন হ'তে পারে।" এক মুহূর্ত্তের জন্ত সত্যেশের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে সে হাসিয়া বলিল, "খুব খুসী হ'লাম। তা' হ'লে তোমার কোনও চিন্তাই নাই।"

ইলার মুখে যেন একটু ছায়া পড়িল। সে একটু ক্ষুব্ধ ভাবে বলিল, "আহা, আমার যেন চিন্তায় আর ঘুম হচ্ছিল না। তুমি নিশ্চয় মনে কর যে, আমি তোমার চেয়ে এই সব সঙ্গীদের জন্ত বড় বেশী ব্যস্ত। না ?"

সত্যেশের মনে সেই কথাই হইতেছিল; কিন্তু সে কথা বলিয়া আবার ঠকিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না; তাই সে একটু চেষ্টা করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "What a silly girl! তোমার সঙ্গে কথা কওয়া ভার! সোজা কথা এত বেঁকা ক'রতে কতদিন থেকে শিখেছ বল দিকিনি ?"

ইলা আর কথা কহিল না, ডিনার শেষ করিয়া উঠিল। তার পর ড্রইং রুমে বসিয়া বলিল, "এক বছরে যে আমি এত পুরোনো হ'য়ে যা'ব ত' জানতাম না।" বলিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তখন সত্যেশকে বাধ্য হইয়া নানা রকমে আদর করিয়া তাহার মান ভাঙ্গাইতে হইল।

এ সম্বন্ধে সে সপ্তাহের মধ্যে সত্যেশ আর কোনও কথা বলিল না। কলিকাতা হইতে বহুদূরে গিয়া এই দঙ্গলের হাত এড়াইয়া কয়েকটা দিন নির্জ্জনে ইলার সঙ্গে কাটাইবার আশায় সে বেশ একটু উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, ইলার নানা আচরণে তাহার উপর যতই অসন্তুষ্ট হউক না কেন, সত্যেশ ইলাকে ঠিক পূর্ব্বের মতই ভালবাসিত এবং তাহার সমস্ত সত্তা ইলাকে একান্ত ভাবে কামনা করিত। ইলার উপর যে সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কারণে বিরক্তি জন্মিতেছিল, তাহার মূল কারণ কেবল ইহাই যে, সে ঠিক যেমন করিয়া সম্পূর্ণরূপে ইলাকে পাইতে চাহিত, তাহাকে তেমন করিয়া সে পাইত না। তাই এই অবসরের জন্ত সে বেশ তৃষিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিতে পাইল যে, ইলার যাওয়ার কথা উঠিতেই সঙ্গে এক দঙ্গল জুটিয়াছে, তখন ইহাতেই তাহার কক্সবাজার যাইবার সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। কিন্তু সে কথা সে ইলাকে বলিল না।

শনিবার দিন তাহাদের রওনা হইবার কথা। শুক্রবার দিন সন্ধ্যা-বেলায় আফিস হইতে ফিরিয়া সত্যেশ দেখিল,

বেশ রীতিমত মজ্‌লিস জমিয়া গিয়াছে। ইলা হাস্যমুখে সত্যেশকে সম্ভাষণ করিয়া জানাইল যে, একটা মস্ত বড় পার্টি জুটিয়াছে; তাহার বাবার এক মক্কেলের একটা ষ্টীমার সেখানে তাদের হাতে থাকবে,—তাহাতে তাহারা বেশীর ভাগ সময় জলে-জলেই কাটাইতে পারিবে। ক্রমে সত্যেশ জানিতে পারিল যে, এই সন্ধ্যার আলোচনার বিষয় কক্স-বাজারের একমাসব্যাপী উৎসবের প্রোগ্রাম স্থির করা। সত্যেশ কিছু না বলিয়া সব কথাতেই মৃদু হাস্যের সহিত সম্মতি দিয়া গেল। রাত্রি আটটার পর সমস্ত লোক চলিয়া গেলে, সত্যেশ ইলাকে বুকের কাছে টানিয়া বলিল, "তোমাদের এত সব আনন্দের ফোয়ারার মধ্যে আমি আমার দুঃখের কথাটা পাড়তে পারলাম না; সবাইকে নিরাশ ক'রতে বড় কষ্ট হয়!"

ইলা ব্যস্ত হইয়া সত্যেশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি হ'য়েছে?"

সত্যেশ বলিল, "আমার ছুটি নেওয়া হ'ল না। Mc-Crindleকে রেখে আমি যাব মনে ক'রেছিলাম; কিন্তু কালকেই আমার তাকে মহীশূরে পাঠাতে হচ্ছে;—সেখান-কার Hydro-electric plant নিয়ে একটা মস্ত গোলমাল উপস্থিত হ'য়েছে। আমি কিম্বা Mc-Crindle না গেলেই নয়।"

ইলার মুখ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। এই এক মাসের আনন্দ-প্রবাসের যে ছবি তাহার মনে আঁকিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর কে যেন একরাশ কালি ঢালিয়া দিল। কিছুক্ষণ পর সে বলিল, "তা বেশ, Mc-Crindle ফিরে এলেই যাওয়া যাবে।"

সত্যেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সে হ'বার জো নেই। আর দু'মাসের ভিতর আমি যে কোথাও বেরুতে পারবো, সে সম্ভাবনা নেই। তাই আমি বন্দোবস্ত ক'রেছি যে সাতদিনের ছুটি নিয়ে তোমাদের সব পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবো।"

ইলা বসিয়া পড়িল। তাহার বুকের ভিতর কি একটা যেন ঠেলিয়া উঠিতেছিল। তাহার বড় কান্না পাইতেছিল। সে কেবল বলিল, "সে হ'তেই পারে না।"

সত্যেশ হাসিয়া বলিল, "কি হ'তে পারে না? এ ছাড়া কোনও উপায়ই নেই। এ সব বন্দোবস্ত ক্যান্‌সেল করা এখন অসম্ভব। এতগুলি লোককে বলা হ'য়েছে। তা'রা তোমার guest; তা'দের তুমি কিছুতেই শেষ মুহূর্ত্তে নিরাশ ক'রতে পার না।"

ইলা বলিল, "আমার guest কেন হ'তে যা'বে তারা? তারা সব বাবার guest হ'চ্ছে। বাবা যাচ্ছেন সেখানে; তিনি সব বন্দোবস্ত ক'রছেন, তা' বুঝি জান না?"

সত্যেশ বলিল, "যাই হ'ক, এখন যদি আমরা না যাই, সে মোটেই ভাল হ'বে না। কাজেই যেতে আমাদের হবেই। তার পর দু'দিন বাদে আমি সুড়ুৎ করে পালিয়ে আসবো; তা'তে কারো কিছু আস্‌বে যাবে না।"

ইলা বক্র দৃষ্টি সত্যেশের উপর ফিরাইয়া বলিল, "কারো না? এই কি তোমার বিশ্বাস?"

দৃষ্টি দেখিয়া সত্যেশ আশঙ্কা করিল যে, এখনি ঝড়-বৃষ্টি এক-সঙ্গে আরম্ভ হইবে। সে তাড়াতাড়ি ইলাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "কেউ মানে অবশ্য তুমি ছাড়া কেউ! তোমার যে কষ্ট হ'বে, তা'র জন্যে আমিই কি কম দুঃখিত?"

ইলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, "না; এ ভাবে আমাদের যাওয়া ভাল হয় না। আমি কাল সবাইকে জানিয়ে দেবো যে, আমরা যেতে পারলাম না। যাতে কোনও গোলযোগ না হয়, তাই ক'রবো—সেজন্য চিন্তা করো না। কিন্তু একটা কাজ কর না কেন? Mc-Crindleএর ক'দিন থাকতে হ'বে?"

সত্যেশ বলিল, "বিশ-পঁচিশ দিন,—চাই কি একমাসও হ'তে পারে।"

ইলা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "বেশ কথা, Mc-Crindleকে এখানে রেখে তুমিই মহীশূরে চল না কেন? তা' হ'লে আমাদের একটা লম্বা বেড়ান হ'বে। চাই কি ওখান থেকে অমনি রামেশ্বর পর্য্যন্ত ঘুরে ফেরা যাবে। তোমার কাজও হ'বে, শরীরও হয় তো সারবে।"

ইলার মুখে এ প্রস্তাব শুনিয়া সত্যেশ যে আনন্দিত হইল, তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। সে হাসিয়া বলিল, "তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে না কি?"

ইলা একবার গম্ভীর ভাবে ভারী-ভারী চোখ দুটি সত্যেশের মুখের দিকে ফিরাইয়া বলিল, "তুমি যদি না ইচ্ছা কর, তবে যেতে চাই না।"

কাজেই সত্যেশকে হার মানিতে হইল।

কক্সবাজারে যে আনন্দ-সম্মিলন হইল, ইলা বা সত্যেশ তাহার মধ্যে ছিল না। কিন্তু একমাসকাল তাহারা মহীশূরে যে আনন্দে কাটাইল, সত্যেশ বা ইলা তাহাদের বিবাহিত জীবনে এত আনন্দ কখনও পায় নাই। এই একমাসের প্রবাসে সত্যেশের প্রেমের শিথিলায়মান মূল আবার দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিল। এই একমাসকাল নিঃশেষ রূপে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইয়া তাহারা পরস্পরের কাছে আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। যে মেঘ সত্যেশের মনের উপর বাসা করিয়াছিল, তাহা অনেকটা কাটিয়া গেল,—সত্যেশ ইলার প্রকৃত মধুময় হৃদয়ের আস্বাদ পাইয়া তাহার সকল অসন্তোষ ভুলিয়া গেল। দক্ষিণাপথের নানাস্থান ঘুরিয়া যখন তাহারা বালিগঞ্জের বাসায় ফিরিয়া আসিল, তখন সে মেঘের ছায়ামাত্রও অবশিষ্ট রহিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই একমাসের "মধুচন্দ্রিকায়" যে সত্যেশ ও ইলা পরস্পরের কাছে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্যেশ একটা ভুল করিয়াছিল। সে যদি এই আনন্দের সময় মনের সব ক্লেদ ঘুচাইয়া লইত, মনটার আনাচে-কানাচে যত ময়লা আছে সব বাহির করিয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া লইত, তবে জন্মের মত গোল মিটিয়া যাইত। কিন্তু সত্যেশ অতীতের কথা তুলিয়া নিষ্ঠুরভাবে বর্ত্তমানের আনন্দ-স্বপ্ন ভাঙ্গিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাহার মনে হইতেছিল যে, অতীত একেবারেই মরিয়া গিয়াছে—সে যেন আর ফিরিয়া আসিবে না।

ফলে হইল এই যে, গোলমালের বীজ মনের কোণে রহিয়া গেল। ইলা তাহার স্বামীকে বুঝিয়াও বুঝিল না। তাহার স্বামী যে তাহার কাছে কি আশা করে, সে কথা কোনও দিন সত্যেশ তাহাকে মুখ ফুটিয়া বলে নাই; ইলারও এতটা অন্তর্দৃষ্টি ছিল না যে, সে তাহা না বলিলেও অনুভব করে। দুজনে এই সব বিষয়ে বোঝা-পড়া হইল না।

কাজটা ভাল হইল না। কারণ, ইলার অপরাধ যাহা কিছু, তাহার জন্ত ইলার স্বভাবের চেয়ে তার অনভিজ্ঞতাই বেশী দায়ী। যাহাকে তাহার সমাজে "সোসাইটী" বলে, তাহাতে সে যে বড় বেশী আনন্দ অনুভব করিত, তাহা নহে। সে সমাজে শিক্ষিত এবং সমাজ তাহার কাছে যাহা প্রত্যাশা করিত তাহা সে করিত,—কেবল দশজনের মতের বিরুদ্ধে কোন কথা ভাবিবার বা কায করিবার অভ্যাস বা শক্তি তাহার ছিল না বলিয়া। সে সত্যেশকে প্রাণের অধিক ভালবাসিত। সত্যেশ যতক্ষণ কাছে থাকিত, ততক্ষণ তাহার জগৎ আলোয় ভরিয়া থাকিত; সত্যেশ আড়ালে গেলেই সে জগৎ অন্ধকার হইয়া যাইত। কিন্তু সে কথা স্বীকার করিতে সে কুণ্ঠিত হইত। পাছে তাহার প্রেমের আবেগে সে এমন কিছু করিয়া ফেলে, যাহা সমাজের চক্ষে বাড়াবাড়ি বলিয়া গণ্য হয়, সেই ভয়ে সে লোকের সামনে নিজেকে খুব বেশী করিয়া চাপিয়া রাখিত। স্ত্রীর স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার লোকে পছন্দ করে, তাহার আদর্শ সে দেখিত তাহার দিদির ব্যবহারে—আর তা'র দিদিকে সোসায়িটীতে কে না ভালবাসে? লীলার স্বামী অবশ্য নিতান্ত নেংটার মত লীলার সঙ্গে-সঙ্গে সর্ব্বদাই থাকে; কিন্তু লীলা অন্য লোকের সংসর্গে তাহার অস্তিত্বটা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া চলে। এ রকম করা ইলার স্বভাববিরুদ্ধ; দশজনের মাঝখানেও সে তাহার চক্ষু সত্যেশের দিক্ হইতে ফিরাইতে পারিত না। সত্যেশের কথা শুনিবার জন্য তাহার কর্ণ এতটা সজাগ হইয়া থাকিত যে, অন্য লোকের কথা প্রায় সে শুনিতেই পাইত না। দশজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বসিয়া বেশ গল্প-সল্প আমোদ-আহ্লাদ হইতেছে, এমন সময় যদি সত্যেশ আসিয়া পড়িত, তবে ইলার সব কথাবার্ত্তা এলোমেলো হইয়া যাইত। তাহার সমস্তটা মন সত্যেশের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে, সে কথা সকলেই লক্ষ্য করিত।

প্রথম-প্রথম তাহার এই ভাব লইয়া অনেক কথা হইয়াছিল। তাহার দাদা সুবোধ, দিদি লীলা প্রভৃতি তাহাকে খুব ঠাট্টা করিত। অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবও তাহাদের সাহায্য করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "সত্যেশ যে বিয়ে ক'রেছে বলে ইলাকে এমন ক'রে monopolise ক'রবে, এটা ভাল নয়।"

ইলাকে কাজেই জবাব দিতে হইত। সত্যেশের যে একচেটিয়া করিবার অধিকার আছে, এবং তাহা করাই যে স্বাভাবিক, এ কথা বলিবার মত বেহায়াপনা (?) এবং সাহস ইলার ছিল না। এ কথা হয় তো তাহার মনেও ওঠে নাই; কেন না, কি উচিত, কি অনুচিত সে সম্বন্ধে তাহার চারি-

দিককার দশজনের মতকে অন্ধ ভাবে স্বীকার করিয়া লওয়াই তাহার অভ্যাস ছিল। যদি কেহ তাহার সম্মুখে দৃঢ়ভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইত, তবে ইলা তাহার নেতৃত্বে বিদ্রোহের দলে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইত না।—তাই যখন তাহার পিতা সমস্ত পরিবারের মতের বিরুদ্ধে তাহার বিবাহের আয়োজন করিলেন, তখন সে অনায়াসে পিতার নেতৃত্বে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। কিন্তু নিজের জোরে আপনার পায়ে দাঁড়াইয়া সে দশজনের গৃহীত মতামতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিত না।

তাই এ কথার উত্তরে সে দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিত যে, সত্যেশ তাহাকে monopolise করিয়াছে; এবং আচার-ব্যবহার দ্বারা সে দেখাইতে চেষ্টা করিত যে, সে এবং সত্যেশ চলিত আদর্শের বিরুদ্ধাচারী নয়। পাছে লোকে মনে করে যে, তাহারা অতিরিক্ত রকম পরস্পরকে লইয়া মত্ত, সেই জন্য সে অতিরিক্ত রূপে বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশিত। এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই সে বৈকালে একপাল লোককে টেনিস খেলার নিমন্ত্রণ করিত এবং তাহাদের লইয়া সন্ধ্যাটা কাটাইত।

সত্যেশ আসিলে ইলার মনটা যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া যাইত, তাহা ইলা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিত না। এ কথা লইয়া বন্ধু-মহলে খুব ঠাট্টা হইত। সত্যেশ আসিয়া পৌছিলে বন্ধুরা বলিত, "হ'য়েছে,—ইলার এখন বুদ্ধি-শুদ্ধি সব এলিয়ে যাবে।"

ইলা এই পরিহাসে আনন্দিত না হইয়া প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইত যে, সত্যেশের আসা-না-আসায় তাহার কিছু আসে-যায় না। সেই জন্য সে বিশেষ চেষ্টা করিয়া দিদির স্বামীর প্রতি ব্যবহারের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত।

সত্যেশ এ সমাজে ভাল করিয়া মিশিতে পারিত না। তাহার কারণ, প্রথমতঃ তাহার কাজ অনেক,—এসব লঘুত্বের অবসর তা'র অল্প। তাহা ছাড়া, সে মোটেই হাল্কা স্বভাবের লোক নয়। সে পরিহাসপ্রিয়, এবং মজলিস-শুদ্ধ লোক হাসাইতে তাহার মত দ্বিতীয় কেহ ছিল না; কিন্তু দিন-রাত সে এক হাসির উপর থাকিতে ভালবাসিত না। পড়াশুনা করা তা'র একটা রোগের মধ্যে ছিল। কাজেই সে এ দলের চক্ষের বিষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার স্বামী যে সমাজের দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই, তাহাতে ইলা লজ্জিত হইত; তাই তাহার প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য আরও বেশী করিয়া নিজেকে দশজনের মনের মত করিয়া চালাইত।

মহীশূর হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইলা শুনিল যে, তাহার ও তাহার স্বামীর বড় নিন্দা হইয়াছে। কাজের ওজুহাত যে মিথ্যা এবং বন্ধুদের এড়াইয়া একান্তে স্ত্রীকে লইয়া আমোদ করিবার চেষ্টায়ই যে সত্যেশ এ কাণ্ডটা করিয়াছে, সে বিষয়ে ইলার বন্ধু-মহলে কোনও মতভেদ ছিল না। সুবোধ এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ হাজির করিয়াছিল; Mc-Crindle তাহাকে বলিয়াছে যে, সত্যেশ অনায়াসে ১৫ দিন কি একমাসের ছুটি লইতে পারিতেন।—বাস্তবিক কথাটা সত্য। সত্যেশ যে ইচ্ছা করিয়া একটা কাজ জুটাইয়া কামাই করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইলা তর্ক করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিত যে, কথাটা আগাগোড়া মিথ্যা। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ইলা দেখিল যে, বন্ধু-সমাজে তাহাদের প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে হইলে, ইলাকে আরও বিশেষ ভাবে তাহাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। সে বুঝিতে পারিল না যে, এই চেষ্টায় সে ক্রমেই সত্যেশের বিরাগের কারণ হইতেছে; কেন না সত্যেশ কখনও তাহাকে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে নাই।

একদিন দ্বিপ্রহরে বন্ধুর দল আসিয়া প্রস্তাব করিল, বোটানিকেল গার্ডেনে যাইবার পাঁচটী পুরুষ ও চারিটি মহিলা জুটিয়াছেন,—সে গেলেই দল পূর্ণ হয়। ইলা বলিল, "আমার আজ বড্ড কাজ—"

মিস মিত্র নামে একটী ছোট্ট সুন্দরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি বলি নি? ইলা কখখনো যাবে না। তার বরটিকে সঙ্গে না নিলে কি সে যেতে পারে?"

সবাই হাসিয়া উঠিল।

ইলা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না, সত্যি—"

লীলা বলিল, "সত্যি নয় তো কি মিথ্যে? যেমন কল্প-বাজার যাবার সময় মহীশূরের দরকার!"

ইলা বড় লজ্জিত হইয়া পড়িল। "না দিদি, সত্যি আমায় আজ একটা খুব জরুরী কাগজের প্রুফ দেখে রাখতে হ'বে,—সেটা কাল ছাপা হওয়াই চাই,—উনি আজ বিশেষ ক'রে—"

বলিতেই সুন্দর ও সুন্দরীবর্গ হাসিয়া উঠিল—সেই "উনি",—ইলাও লজ্জিত হইয়া লাল হইয়া উঠিল।

মিষ্টার বসু—ইনি বিলাত হইতে journalism শিখিয়া আসিয়াছেন—বলিলেন, "দিন আপনার proof আমাকে,—আমি ষ্টীমারে সবটা দেখে শেষ ক'রে দেবো।"

ইলা অবশ্য এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল; কিন্তু এ অবস্থায় তাহার আর যাইতে অস্বীকার করিবার উপায় রহিল না। সে একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে কে যাচ্ছে?"

মিস মিত্র বলিল—"সে জন্য ভয় পেয়ো না; খুব proper party হ'বে। তোমার মা আছেন, বুড়ো মিসেস ব্যানার্জ্জী আছেন—তাঁরা দু'জনে খাওয়া-দাওয়াটার ভার নিয়েছেন।"

লীলা বলিল, "দূর কর ছাই, এত কথার দরকার কি? তুই টেলিফোন ক'রে হুকুম এনে নে। না হয় আমিই তোর হ'য়ে ব'লে দিচ্ছি। বিনা হুকুমে যে তুই যেতে পারবি না তা' আমি জানি।"

"ইস!" বলিয়া ইলা উঠিল, "আমি কারো হুকুমের নোকর নই।" শেষে তাহাকে যাইতেই হইল—প্রুফ সে সঙ্গে লইয়া গেল।

যখন সত্যেশ বাড়ী ফিরিল, ইলারা তখনও ফিরিয়া আসে নাই। ইলাকে বাড়ীতে না দেখিয়া সত্যেশ দুঃখিত হইল। পরে যখন বেয়ারার কাছে শুনিল যে, সে দ্বিপ্রহরে সত্যেশের নিতান্ত অপ্রিয় একদল লোকের সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছে, তখন সে সত্য-সত্যই রাগিয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া, সে নিঃশব্দে চা খাইয়া, একখানা বই লইয়া lawnএ বসিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল। এমন সময়ে চ্যাটার্জ্জী সাহেবের নূতন মোটরখানা আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ইলা, লীলা, মিষ্টার ঘোষ ও বুড়ো মিষ্টার ব্যানার্জী বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহারা হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া সত্যেশের দিকে আসিলেন; কেবল ইলা, "Excuse me" বলিয়া ছুটিয়া ঘরের ভিতর গেল।

ব্যানার্জী মহাশয় বিশেষ রসিক বলিয়া বন্ধু-মহলে খ্যাত। তাঁহার রসিকতার মধ্যে বারোআনাই যে আদিরসাশ্রিত, অশ্লীল—সেজন্য তাঁহার প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল বই কমিয়াছিল না। তিনি ব্যারিষ্টার, এককালে পশার মন্দ ছিল না। কিন্তু এখন তিনি ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে সবাই ঠাকুর্দ্দা বলিয়া তামাসা করিত।

ব্যানার্জী খুব হাসিয়া সত্যেশের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ওরে শালা, দিব্য নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে পড়ছিস্ কি? আমি যে এদিকে তোর অসাক্ষাতে তোর মাগকে নিয়ে ইলোপ করেছিলাম, সে খবর জানিস?"

কথাটায়, কি জানি কেন, সত্যেশের প্রাণের ভিতরটায় ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সে ভাল করিয়া হাসিতে পারিল না, কিন্তু অপর শ্রোতারা হাসিয়া উঠিল। ব্যানার্জী বলিলেন, "বাবা, দুপুরে ডাকাতি! সত্যেশের সাত-রাজার ধন মাণিক, তার উপর দিন-রাত সত্যেশ কড়া পাহারা দিচ্ছে;—তা'র ভেতর থেকে চুরি! ওহে, সে বোসটা গেল কোথায়—এ নিয়ে একটা বেশ sensational paragraph লেখা চলবে।"

এই রসিকতার স্রোত থামাইবার জন্য সত্যেশ বলিল, "বসুন না ঠাকুর্দ্দা—এক পেয়ালা চা খাবেন না?"

এ প্রস্তাবে সকলে ঘোরতর আপত্তি করায়, এবং শীঘ্র বাড়ী যাইতে ব্যস্ত হওয়ায়, ব্যানার্জীকে অস্বীকার করিতে হইল। সবাই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন,—তবু সত্য-সত্য যাইতে আরও ১৫ মিনিট দেরী হইল। ব্যানার্জী picnic-partyর বেশ রং-চড়ান একটা বর্ণনা না দিয়া নড়িতে পারিলেন না।

তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া সত্যেশ ঘরে ঢুকিল। খুব রাগ করিয়া রাগ দেখাইবার জন্যই ঢুকিল। সে ভাবিয়াছিল, ইলা কাপড় ছাড়িয়া মুখ-হাত ধুইতে গিয়াছে। কিন্তু ইলার ড্রেসিং রুমের বাহির হইতে দেখিতে পাইল যে, তাহার কাপড় ছাড়া হয় নাই। ইলা ড্রেসিং টেবিলের কাছে একটা চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্ট মনে কি দেখিতেছে। আরসীর ভিতর তাহার মুখে বেদনা ও ব্যস্ততার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। সত্যেশ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। আরসীর ভিতর সেই সুন্দর উদ্বিগ্ন মুখ দেখিয়া সে নড়িতে পারিল না। ইলা যে বাস্তবিক অনুতপ্ত, সে কথা বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। কিন্তু সে করিতেছে কি?

অল্পক্ষণ বাদে ইলা মাথা তুলিয়া, হাতে করিয়া কয়েকখানা কাগজ তুলিয়া লইল। সত্যেশ দেখিল, তাহারই সেই প্রুফ। ইলা সে প্রুফ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল; কিন্তু

নিন্দায় তরে বেশী কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই বাড়ী আসিয়াই সে কাজটা শেষ করিতে বসিয়াছে।

বেচারার উপর সত্যোশের বড় দয়া হইল; সে ঘরে প্রবেশ করিল। ইলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার অনুতপ্ত চক্ষু স্বামীর মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "আমি বড় দোষ করেছি—কিন্তু তোমার প্রুফ আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ ক'রে দিচ্ছি।"

সত্যোশ বলিল, "কিচ্ছু দরকার নেই। তুমি ক্লান্ত হ'য়েছ, কাপড়-চোপড় ছাড়, বাকীটুকু আমি দেখে দিচ্ছি।" বলিয়া প্রুফের দিকে হাত বাড়াইল।

ইলা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না, আমাকেই এটা শেষ ক'রতে দাও—লক্ষ্মীটি আমার, আমার উপর রাগ করো না।"

সত্যোশ হাসিয়া, ইলাকে বুকের কাছে টানিয়া, তাহার কপালে চুম্বন করিল; বলিল, "পাগল, রাগ ক'রে বলছি না, তোমার জন্যেই বলছি। এখন যাও, কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম কর। এটুকু কাল দেখলেও চলবে।"

এমনি করিয়া এ দিন কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু মেঘ এমনি করিয়া দিনের পর দিন আবার জমিতে লাগিল। একদিন সত্যোশ যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে দেখিল যে, লনে ইলা ও লীলা বসিয়া পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে সমানে সিগারেট খাইতেছে! লীলার এ দোষ তাহার জানা ছিল,—কিন্তু ইলা যে এতটা বেহায়া হইবে-. যেটা খুব বাড়াবাড়ি নব্যা ছাড়া ইংরাজ সমাজেও মহিলারা খুব সঙ্গত মনে করে না, ইলা যে তাই করিয়া বসিতে পারে, এটা সত্যোশ কল্পনা করিতে পারে নাই। দেখিয়া সত্যোশ ক্ষেপিয়া উঠিল; কিন্তু ইলাকে কিছু বলিল না। দিন-পাঁচ-সাত সে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া রহিল, ইলার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বড় বেশী কহিল না।

ইলা সত্য-সত্য সিগারেট খাইত না। কিন্তু সে দিন স্ত্রীলোকের সিগারেট খাওয়ার কথা লইয়া আলোচনায় ইলা দেখিল, সকলেই লীলার পক্ষে। নব্যা মহিলার পক্ষে যে সিগারেট খাওয়া খুব উচিত, সে সম্বন্ধে নানা বক্তৃতা শুনিল। সে আপত্তি করিল, ধূমপানের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি উপস্থিত করিল। অবশ্য সেকালে যেমন ধূমপানটা একটা নৈতিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, এখন সে কথা বলা চলে না;—তবে ধূমপানে, বিশেষতঃ নারীর পক্ষে, নানা শারীরিক দোষের সৃষ্টি হয়।

একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল, "তুমি তো এ কথা বলবেই। সত্যোশ যখন চুরুট পর্য্যন্তও খায় না, তখন সেটা তোমায় সমর্থন ক'রতেই হ'বে।"

ইলা উষ্ণ ভাবে বলিল, "কখ্‌খনো না, তাঁর মতের অপেক্ষা ক'রে আমি মত তৈয়ার করি না। আমার নিজের একটা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, সে কথা তোমরা স্বীকার ক'রতে চাও না কেন?"

আর একজন বলিল, "সেটা প্রমাণ কর। নিজের বুদ্ধিতে তুমি চুরুটকে দোষের জিনিষ ব'লে সাব্যস্ত ক'রলে কি ক'রে? কখনো একটান খেয়ে দেখেছ?"

ইলা। না, তা' দেখিনি—

হো হো করিয়া সবাই হাসিয়া উঠিল। লীলা বলিল, "আচ্ছা, তুই একটা খেয়ে দেখ। এতে ভাল হয়, না মন্দ হয়, তা'র পর বলিস।"

এক বন্ধু বলিলেন, "তাই করুন মিসেস মুখার্জ্জী—তা হ'লেই আর কোনও কথা থাকবে না।"

আর এক বন্ধু বলিলেন, "ওর সাধ্য হ'লে তো! সত্যোশ তা' হলে কি ভাব্‌বে?"

ইলা বলিল, "সিগারেট সম্বন্ধে মত প্রকাশ ক'রতে হ'লে খেতেই হবে, তা'র কি মানে আছে—"

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "আছে বই কি! তুমি যে কেবল সত্যোশের কাছ থেকে ধার-করা প্রেজুডিস থেকে কথাটা ব'লছো না, নিজের কনভিক্‌শন থেকে ব'লছো, অভিজ্ঞতা থেকে বলছো, সেটা প্রমাণ হ'লে তোমার কথা শোনবার যোগ্য হবে।"

আর এক বন্ধু বলিলেন, "ব্রাভো! এর পর আর কিছু বক্তব্য নেই মিসেস মুখার্জ্জী! আপনি একটা খেয়ে দেখান যে, কিছু প্রেজুডিস নেই।" বলিয়া সে তাহার সিগারেট কেসটা ইলার সামনে ধরিল। ইলা ধন্যবাদ দিয়া অস্বীকার করিল। মিষ্টার ঘোষ তখন তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন; বলিলেন, "তুমি সিগারেট খেয়ে দেখতে অস্বীকার করছো কেন, সেটা বেশ স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। এতে কোনও নৈতিক অপরাধ হয় না, তা' তুমি স্বীকার কর?" "হাঁ।"

"স্ত্রীলোকের পক্ষে indelicate বলে তুমি এটা মনে কর না ?"

"অন্ততঃ সেটা আমার আপত্তির কারণ নয়।"

"তোমার মতে সিগারেট খাওয়া অন্যায়; কেন না শরীরের তা'তে নানা রকম ক্ষতি হয় ?"

"নিশ্চয়! বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, যাদের আর—"

"আচ্ছা থাক্; কিন্তু জন্মের ভিতর যদি একটা সিগারেট কেউ খায়, তা'তে তার শরীর মাটী হ'তে কিছুতেই পারে না ?"

"হাঁ—তা নয়—তবে—"

"এর 'তবে' কিছুই নেই, এটা খাঁটি কথা।"

"আচ্ছা স্বীকার ক'রলাম।"

"তবে জীবনের মধ্যে কেবল একটীমাত্র সিগারেটের এক-চতুর্থাংশ খেতে তোমার আপত্তি এ কারণে থাকতে পারে না।"

"তা নয়। তবে কুদৃষ্টান্ত দেখানটা উচিত নয়।"

এক বন্ধু বলিলেন, "আমাদের কাউকে আপনি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে নষ্ট ক'রতে পারবেন না—কোনও ভয় নেই—fire away।"

মিষ্টার দোষ। তবেই দাঁড়ায় এই যে, তুমি কেবল সত্যেশের মুখ চেয়ে এই পরীক্ষাটায় রাজী হচ্ছ না।

"নিশ্চয়ই না। এই যদি তোমাদের কথা হয়, তবে না হয় আমি দু'টান খেয়ে দেখিয়েই দিচ্ছি যে, তা' নয়।" বলিয়াই ইলা সিগারেট ধরাইল। ঠিক সেই সময় সত্যেশের মোটর আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল। ইলা সত্যেশকে দেখাইয়াই সিগারেট টানিয়া, খুব খানিকটা ধূমোদ্গীরণ করিয়া তাহা ফেলিয়া দিল।

ইলার গলায় ধোঁয়া ধরিয়া সে খানিকটা কাশিল। তার পর তাহার মাথাটা একটু ঘুরিয়া উঠিল। অল্পেই সে সামলাইয়া গেল। তার পর সে বলিল, "ওঃ! এ যে সদ্য বিষ! তোমরা এ খাও কেমন করে!" ইহার পর এ তর্ক আর চলিল না।

ইহাই ইলার সিগারেট খাওয়ার ইতিহাস। সত্যেশ এত কথা জানিত না, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করাও আবশ্যক বোধ করে নাই। কিন্তু এ কথাটা তাহার মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া গেল যে, ইলা সিগারেট খায়। এমনি করিয়া দিনের পর দিন, ইলার দুর্ব্বলতার ফলে, তাহার উপর সত্যেশের রাগ বাড়িয়া চলিল। (ক্রমশঃ)

বেদ ও বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

(২)

(জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ—জ্ঞানপ্রচার সমিতির পঞ্চবিংশতিতম অধিবেশনে পঠিত)

গতবারে আমরা আমাদের জ্ঞানের কষ্টি-পাথরের অন্বেষণে বাহির হইয়া, দেবর্ষি নারদের মত প্রায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডটা ঘুরিয়া আসিয়াছি। বিজ্ঞানাগার হইতে আরম্ভ করিয়া তপোবন, সিদ্ধাশ্রম, কৈলাস পর্ব্বত—কোথাও বাইতে বাকি রাখি নাই। ভ্রমণটা অবশ্য একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। ব্যতিরেকমুখে, নেতি-নেতি করিয়া, শেষকালে কষ্টিপাথর বা আদর্শের একটা আভাস পাইয়াছিলাম। প্রত্যক্ষজ্ঞান বা অপরোক্ষজ্ঞানকে যদি বেদ আখ্যা দেওয়া যায়, তবে আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞান নহে, সুতরাং যথার্থ বেদ নহে। আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান সঙ্কীর্ণ এবং অল্প-বিস্তর পরিমাণে দোষদুষ্ট। ইহার ব্যভিচার আছে, সুতরাং পরীক্ষা করিয়া লইবার আবশ্যকতা আছে। বিজ্ঞানাগারে যন্ত্র-তন্ত্র সাহায্যে যে প্রত্যক্ষগুলি আমরা পাই, সেগুলিও দোষ ও ব্যভিচারের সীমা একেবারে অতিক্রম করিয়া যায় না। কাজেই সেখানেও আমরা যথার্থ বেদের সন্ধান পাই নাই। আমাদের সাধারণ প্রত্যক্ষগুলির পরীক্ষা দিতে হয় বিজ্ঞানাগারে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষগুলিও আবার পরীক্ষা না দিয়া পার পান না। তপোবনে গিয়াও আমাদের গোল মিটে নাই, আমরা সুস্থির হইতে পারি নাই। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যোগজ-প্রত্যক্ষগুলি সব সমানভাবে বিশুদ্ধ ও যথার্থ নহে; সুতরাং নানা মুনির নানা মতের সম্ভাবনা সত্য-সত্যই কতকটা আছে। শেষকালে কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া দেবাদিদেব মহেশ্বরের নিকটে বেদের আর দুইটি মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম। পরমেশ-

য়ের যে পূর্ণ ও নিরতিশয় জ্ঞান, তাহাই চরমবেদ—Veda in the limit, এবং তাহাই আমাদের সকল প্রকার জ্ঞানের চরম আদর্শ—Standard in the limit. ইহাই বেদের ঐকান্তিক রূপ। আবার, বেদের অপর এক রূপ মহাদেবের জটাজালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে দেখিয়াছি। লোকে ও পুরাণে ইহাকে বলিয়াছে গঙ্গা; আমরা ইহাকে চিনিয়াছি, বেদধারা রূপে। গীতা ইহাকে আমাদের চিনাইয়া দিয়াছেন, একটা ঊর্দ্ধমূল, অধঃশাখ, অব্যয় অশ্বত্থবৃক্ষরূপে—"ছন্দাংসি যস্য পত্রাণি" পরমেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া, সেই "পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ"কে মূল উৎস করিয়া একটা শব্দ-অর্থ-প্রত্যয়ের ত্রিধারা বেদ-রূপে গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে আমাদের জ্ঞানের দ্বারে পৌছিয়াছে; আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব অনুভূতিগুলিকে মিলাইয়া লইবার আদর্শ রূপে ইহা আমাদের কাছে হাজির আছে। প্রাচীনদের কাছেও ছিল। ব্যাস-বশিষ্ঠাদি সকলেই এই আদর্শের দ্বারা নিজ-নিজ জ্ঞানগুলি পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। যিনি ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়াছেন; তাঁহার অভিজ্ঞতা সর্ব্বজ্ঞতা; সুতরাং তাঁহার বেদ চরমবেদ। কিন্তু নিম্নভূমিতে জ্ঞানগুলি পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্য একটা সুব্যবস্থিত, বিশ্বস্ত ও শিষ্ট-পরিগৃহীত আদর্শ আমাদের পাওয়া দরকার। আস্তিকেরা বলেন, গুরুশিষ্য-পরম্পরাগত শব্দধারা ও জ্ঞানধারাই এই বিশ্বস্ত আদর্শ। কারণ, ইহার মূল স্বয়ং প্রজাপতি; এবং সেই মূল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক গুরুই যথাসম্ভব বিশুদ্ধ ভাবে এই শব্দধারা ও জ্ঞানধারাকে শিষ্যের মধ্যে বহাইয়া দিতে সচেষ্ট আছেন; এবং প্রত্যেক শিষ্যও যথাসম্ভব বিশুদ্ধ ভাবে ইহা নিজের মধ্যে পাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই চেষ্টা, সাধনা ও ব্যবস্থার ফলে, ধারা দুইটির যতটা সঙ্কর ও বিকার হইবার সম্ভাবনা ছিল, ততটা অবশ্য হইতে পারে নাই। ধরুন, কোন মন্ত্র-বিশেষের ধ্বনি ও ছন্দঃ। ইহাদের সম্বন্ধে কত বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা। গুরু ধ্বনি ও ছন্দঃ ঠিক যে ভাবে নিজে পাইয়াছেন, ঠিক সেই ভাবে শিষ্যের মধ্যে আদায় করিয়া ল'ন। সঙ্গীতের ভাল ওস্তাদেরা শিষ্যের মধ্যে সুরগুলি ও রাগরাগিণীগুলি যথাযথভাবে আদায় না করিয়া যেরূপ ছাড়েন না, সেইরূপ। ব্যক্তিগত খোসখেয়ালের অবকাশ কাজেই বড় একটা হইতে পারে নাই। ধ্বনি, ছন্দঃ, দেবতা, বিনিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে একটা পুরুষ-পরম্পরাগত শিষ্ট-পরিগৃহীত ব্যবস্থা বাহাল রহিয়া গিয়াছে। মন্ত্রের ধ্বনি, ছন্দঃ প্রভৃতিও আবার অবান্তর বিষয় নহে। পূর্ব্বে দু'টো-একটা বক্তৃতায় যুক্তি প্রয়োগ করিয়া আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, মন্ত্রের ধ্বনি, ছন্দঃ প্রভৃতি রীতিমত হইলে, সে মন্ত্রের শক্তি অনেক অঘটন-ঘটন-পটিয়সী হইতে পারে। বিজ্ঞানের দিক্ হইতে পরীক্ষা করিলে মন্ত্রশক্তিতে দেবতাদির তৈজস-মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ, সমিধ্-প্রজ্বলন, পর্জ্জন্য-সৃষ্টি প্রভৃতি অনেক অসাধারণ ব্যাপারও সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতে পারে। বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া এ সকল কথার বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন আমাদের ভবিষ্যতে হইবে। ফল কথা, বিজ্ঞান আজকাল নিজে অনেক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়া আমাদের তাক্ লাগাইয়া দিতেছে; অলৌকিক কিছু দেখিলেই বিনা পরীক্ষায় সেটাকে বুজরুকি বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে, এমন কথা বলার বুকের পাটা আর কাহারও নাই। শুধু জড়ের রাজ্যে নয়, অধ্যাত্ম-রাজ্যেও (Psychic and spiritual matters) বিজ্ঞান গম্ভীর, তদ্‌গত ভাবে প্রমাণ সংগ্রহ, প্রমাণ পরীক্ষা এবং বিচার-মনন সুরু করিয়া দিয়াছেন; এবং অসন্দিগ্ধ ভাবে যে সকল তথ্য তাঁহার পাকা-খাতায় তুলিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার কতক-কতক আমাদের সাধারণ হিসাবের বাহিরে, আমাদের আটপৌরে ধারণার অতীত। মন্ত্রশক্তির কাণ্ডকারখানাগুলা অলৌকিক শুনিতেছি বলিয়াই সেগুলিকে আমাদের পরীক্ষা ও বিচারের আমলে মোটেই আনিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যাঁহারা বিজ্ঞের মত বসিয়া আছেন, তাঁহারা বিজ্ঞান-ব্যবসায়ী হইলেও বিজ্ঞানের চিনির বলদ। পরীক্ষা ও বিচারের ফল যাহাই হউক, তাহার জন্য চিন্তিত হইয়া লাভ নাই। এ ক্ষেত্রে সত্যসত্যই ফলাভিসন্ধি-শূন্য হইয়া নহে, ফলে নির্ম্মম হইয়া আমাদের পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সে যাহাই হউক, গুরু-পরম্পরাগত যে শব্দধারা ও প্রত্যয়ধারা, তাহাকে বেদ-রূপে, শাস্ত্র-রূপে, আমাদের নিজস্ব জ্ঞানগুলির আদর্শ-রূপে (Classics of experience-রূপে) গ্রহণ করার একটা কথা আমরা শুনিতেছি। চরম বা নিরতিশয় বেদ প্রাংশুলভ্য ফল; বামদেব, শুকদেবের মত দুই-একজন উত্তমশ্লোক হয় ত সে ফলের আস্বাদ পাইয়াছেন; কিন্তু

আমি বামন, সে ফললাভ-প্রত্যাশায় উদ্বাহু হইয়া কেনই বা "গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্" ? তবে, এদিকে আবার বাড়ীর পাশে ভক্তশিরোমণি রামপ্রসাদের নিমন্ত্রণ পাইয়াছি, কালী-কল্পতরুর মূলে বেড়াইতে যাইবার ; নিমন্ত্রণ আমার নহে, মনের। মনকে ত আঁটিয়া উঠিতে পারি না, সে বড়ই বেয়াড়া! তাহাকে যদি কখনও বাগ মানাইতে পারি, তবে না হয় চতুর্ব্বর্গের মধ্যে বাছিয়া সেই ফলটিই কুড়াইয়া আনিব, যে ফলটার আস্বাদ লইলে, এই সংসার-পাদপের শাখায়-শাখায় জন্মজন্মান্তর ধরিয়া স্বাদু-কষায়, তিক্ত-মধুর ফল আর খাইয়া মরিতে হইবে না। কিন্তু, এই কর্ম্মভূমিতে আর্য্যকুলে, দ্বিজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমায় যে বলিতে হইতেছে, আমি তেমন ভাগ্য করিয়া আসি নাই। চরম বা নিরতিশয় বেদে আমার অধিকার নাই। এমন কি, ইহাকে একটা কল্পিত আদর্শ—Veda in the limit—ভাবিয়াই আমায় ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। যেন ইহা একটা গণিতের পরিভাষা—Mathematical concept ; ম্যাক্স-ওয়েলের বৈজ্ঞানিক-ভূত (Sorting Demon) এর জ্যেষ্ঠ-তাত যেন আমার প্রজাপতি মহাশয় ; শুভ-বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রে শ্রীযুগ্মসমন্বিত হইয়া ইহাঁকে একটা নমস্কারের ভাগ পাইতে দেখিয়াছি, এবং কদাচিৎ বা পক্ষযুগল ও পদশ্রেণী বিস্তার করিতেও দেখিয়াছি। এ ছাড়া, অন্য কোনও রূপ প্রত্যক্ষ প্রজাপতি সম্বন্ধে এ অধমের হয় নাই। সুতরাং চরম বা নিরতিশয় বেদের থাকা-না-থাকা আমার কাছে সমান হইয়া রহিয়াছে।

গুরু-পরম্পরাগত শিষ্ট-পরিগৃহীত যে বেদ, তাহা লক্ষণ-মত বেশ সুন্দর কষ্টিপাথর সন্দেহ নাই ; তবে, পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া রাখিয়াছি যে, এ ক্ষেত্রেও মন নানা সংশয়ে আচ্ছন্ন ও আন্দোলিত হইয়া থাকে। এখানেও দেখিতেছি, আমি 'শূদ্রত্বমাপন্ন' হইয়াছি। আস্তিকেরা বেদধারার অবতরণ সম্বন্ধে যে বিবরণ দিলেন, তাহা না হয় মানিয়া লইলাম। কিন্তু যে ধারাটি আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা যে অল্প-বিস্তর পরিমাণে খণ্ডিত, সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত হইয়া আসিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বেদ-বিপ্লব, বেদোদ্ধার, বেদ-বিভাগ, বেদ-সংস্কার—এ সকল কথা বারবার স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। পরমেশ্বরের অসীম জ্ঞানরাশি তোমার-আমার মত জীবের বুদ্ধিতে প্রবাহিত হইয়া আসিতে গেলেই, তাহাকে অবশ্যই অল্প, কৃপণ ও কুণ্ঠিত হইয়া আসিতে হয়। মহাসাগরের সবটুকু জল আর মেঘরূপে আকাশে ঘনীভূত হয় না ; সবটুকু জল কখনও জোয়ারের উচ্ছ্বাসে বেলা-ভূমিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে না। এইজন্য, তুমি-আমি যে জিনিসটাকে ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি রূপে শুনিতেছি ও বুঝিতেছি, তাহা সেই চরমবেদ বা বেদপরাকাষ্ঠা নহে। ইহা খণ্ডিত ও সঙ্কীর্ণ বেদ—ব্যাবহারিক, পারমার্থিক নহে। যে ব্রাহ্মণ পূর্ণবেদের সন্ধান পাইয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, সেই "বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য" আর নানা অল্প-স্বল্প বেদে প্রয়োজন থাকে না ;—যেমন সকল স্থান সলিলে আপ্লুত হইলে, ছোটখাট খানা-ডোবা, নদী-নালার আর প্রয়োজন থাকে না। এ কথা গীতার কথা। আরও মুস্কিলের কথা এই যে, যে জিনিসটাকে আমরা বেদ বলিয়া ব্যবহার করিতেছি, তাহা আপাততঃ অনেকাংশে তুচ্ছার্থ, অস্পষ্টার্থ ও বিরুদ্ধার্থ। অপরা-বিদ্যার কথা ছাড়িয়া, "যয়া তদক্ষরমধি-গম্যতে" সেই পরাবিদ্যাতেও আমাদের মত অনধিকারী পাঠকের ও বিচারকের গোল যথেষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি, দর্শনশাস্ত্রকারেরা, যে উদ্দেশ্যেই হউক, শ্রুতিবাক্যগুলির ব্যাখ্যা সব সময়ে ঠিক একই রূপ দেন নাই। অথচ, মূলদর্শনকার ও ভাষ্যকারদের মধ্যে অনেকেই অধ্যাত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন ও ভগবৎ-পদ-বাচ্য। এ সমস্ত সংশয় ও আপত্তির কথা বেশী করিয়া ফেনাইয়া বলার প্রয়োজন নাই। আমাদের অনেকেরই মনে এ সকল সংশয় জাগিয়াছে ; বিশেষতঃ, আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ বেদপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া, বিধর্ম্মীর দল ও নাস্তিকের দল একেবারে গোড়া ধরিয়া টান মারিতে কসুর করেন নাই। আজকালকার বিলাতী পণ্ডিত ও তাঁহাদের দেশী শিষ্যের দল যেভাবে বেদের আলোচনা-গবেষণা করিতেছেন, তাহাতে সাবেক আস্তিকের দলকে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতে হইয়াছে। 'নাস্তিক' কথাটা শুনিয়া চটিবার কোনই হেতু নাই। যিনি আমাদের পূর্ব্ব-ব্যাখ্যাত গুরুপরম্পরাগত শব্দধারা ও জ্ঞানধারাকে মানিতে ও স্বকীয় জ্ঞান-বিশ্বাসের কষ্টিপাথর রূপে গ্রহণ করিতে নারাজ, তিনিই নাস্তিক। পারমার্থিক ভাবে কষ্টি-পাথর কি না, ইহা প্রশ্ন নহে ; কারণ, সে প্রশ্নের দুইটা উত্তর নাই। ব্যাবহারিক ভাবে ক পাথর কি না, ইহাই

প্রশ্ন। যিনি উত্তর দিলেন, হাঁ,—তিনি আস্তিক; যিনি উত্তর দিলেন, না,—তিনি নাস্তিক।

আমি নাস্তিকের খাতায় নাম লিখাই নাই; কিন্তু ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন খপর রাখেন যে, বেদশব্দ ও বেদার্থ সম্বন্ধে কতটা মূঢ়তা আমার অন্তরটাকে মলিন করিয়া রাখিয়াছে, এবং কত-না সংশয় আমার চিত্তকে চঞ্চল-পীড়িত করিয়া দিয়াছে। আমরা এখানে সকলেই এক গোত্র; সুতরাং এ পাপ কথা আর লুকাইব কার কাছে? পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং আজও বলিতেছি যে, "বেদে আছে" এই কথা শুনিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না; কথাটাকে একটুখানি নাড়িয়া-চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দুষ্প্রবৃত্তি আমাদের মনে জাগিতেছে। যে প্রাচীনেরা শুনিবার পর মনন নিদিধ্যাসন করিয়া শেষ-কালে দর্শনে সেই শোনা কথাটিকে মিলাইয়া দেখিবার পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে বেদ সম্বন্ধে একটা অন্ধ-বিশ্বাসকেই পাকা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এমন ত মনে হয় না। তবে প্রাচীনদের ছিল জীবনই বেদ,—বেদকে উপলব্ধি করাই ছিল জীবন; সকলের না হউক, কাহার-কাহারও ত বটেই। পশ্চিমদেশের বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের তথ্য-সিদ্ধান্ত পরীক্ষায় না মিলাইতে পারিলে, নিশ্চিন্ত সুস্থির হইতে পারিতেছেন না; দিনের পর দিন, বর্ষের পর বর্ষ, বিজ্ঞানাগারে অথবা নিসর্গ-মন্দিরে তাঁহাদের পরীক্ষার ধ্যান-সমাধিকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর এবং ক্রমশঃ সার্থক করিয়া দিতেছে। এই নবীনদের জীবনই বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের উপলব্ধি করাই জীবন। আমরা না এ-দিকে, না ও-দিকে। তর্ক করিতে বিলক্ষণ শিখিয়াছি, কিন্তু প্রাচীনদের নিদিধ্যাসন সাক্ষাৎকারের দিকে ভিড়িতে নারাজ; বিজ্ঞানাগারে অবসর-মত উঁকি-ঝুঁকি মারিতে এবং সময়ে-সময়ে জেরা কাটিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে আমরা জানি; কিন্তু যোগীর মত তদ্গত চিত্তে পরীক্ষার পাত্র ও টিউব লইয়া কিছুদিন পড়িয়া থাকিবার বল আমাদের নাই; মাক্‌সওয়েল, লর্ড কেল্‌ভিন বা আয়েনষ্টাইনের মত মাথার মধ্যে বড় রকম একটা থিওরি ফাঁদিয়া, অপূর্ব্ব কৌশলে সেটাকে গড়িয়া তুলিবার মত মনীষা ও একনিষ্ঠাই বা আমাদের ভিতরে তেমন দেখিতে পাইতেছি কোথায়? সর্ব্বনাশের রাস্তা দুইটি; এবং দুইটিকেই আমাদের বর্জ্জন করিয়া সোজাসুজি ধীরপদক্ষেপে, অকুতোভয় হইয়া, লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। লক্ষ্য সেদিনকার সেই সত্যলোক—যেখানে কষ্টিপাথরের খোঁজে আসিয়া পরেশ-মাণিক পাইয়া বসিব। বর্জ্জনীয় পথ—একদিকে যেমন অন্ধ, তামসিক আস্তিক্য, অন্যদিকে সেইরূপ অন্তঃসার-শূন্য, নিষ্ফল সংশয়বাদ। প্রশ্ন হইল—মন্ত্রশক্তি সত্য-সত্যই কি আছে? একজন বলিয়া উঠিলেন—নিশ্চয়ই আছে; শাস্ত্র কি মিছা বলিতেছেন? নিজের জীবনে কোনও রূপ পরীক্ষা করার প্রবৃত্তি নাই, নিজের সাধনায় কষিয়া-মাজিয়া দেখার কোনই আগ্রহ নাই; কথাটা শুনিলাম, আর স্বচ্ছন্দে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলাম। এ একটা ব্যাধি—আফ্রিকাদেশে না কি একপ্রকার sleeping sickness—নিদ্রারোগ আছে, এটা তার চেয়েও মারাত্মক। দিল্‌কো সাচ্চা রাখিয়া যে জন রাম রহিম জুদা না করিল, তার বিশ্বাসের মাহাত্ম্যের অবশ্য অবধি নাই; এবং সে বিশ্বাস জীবনে আসিলে, আর কিছুর অপেক্ষাও নাই। কিন্তু দিল্‌কো সাচ্চা রাখিতে বলিতে হইতেছে আমার মত মিথ্যাচার জীবকে, যার জীবনটা "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি" করিতে-করিতে অকূলে বান্‌চাল হইবার দাখিল হইয়াছে! মনে সংশয় গজ্‌গজ করিতেছে, মুখে শাস্ত্রের দোহাই দিলে মিথ্যাচার হয়। এবং এই মিথ্যাচারের ফলে, আমি যখন "মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে" নিপতিত হইতেছি, তখন না রাম না রহিম আমায় ধরিয়া ফেলিয়া বাঁচাইয়া দিতেছেন। এ প্রকার তামসিক আস্তিক্যের কোনই দাম নাই। ইহা আত্মার অবসাদই সূচিত করে। পক্ষান্তরে, একপ্রকার সর্ব্বনেশে সংশয়বাদও আছে। এই সংশয়বাদের পাণ্ডারা সবজান্তা পুরুষ;—খবরের কাগজের লিডারেট্ রাইটারেরা এবং মাসিক পত্রের সমালোচকের দল ইঁহাদের কাছে হারি মানিয়া যান। মন্ত্রশক্তি সত্য কি?—প্রশ্ন হইল। ইঁহারা বিনা পরীক্ষায়, বিনা বিচারে একতরফা ডিক্রি দিলেন—ও-সব বুজরুকি, "প্রমাণাভাবাৎ"। হণ্টার কমিশনে বন্দী নেতৃবৃন্দকে পুলিশের পাহারায় বিচার কক্ষে এক-আধদিন হাজির হইতে দিতে সরকার বাহাদুরের আপত্তি ছিল না; কিন্তু এই সর্ব্বজ্ঞ বিচারকের দল মন্ত্রপক্ষের উকিলমহাশয়দের যে দু'একখানা ছেঁড়া-খোঁড়া পুরালো দলিল বা অন্ততঃ বা একটু-আধটু প্রমাণ আছে, তাহার দিকে একবার করুণা-

কটাক্ষপাত করাটাও নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়া মনে করেন; উকিল বেশী চাপিয়া ধরিলে মেজাজ হারাইয়া Contempt of Courtএর proceedings সুরু করিয়া দেন! ইঁহারা একটা হেতুও দর্শাইয়া থাকেন—প্রমাণাভাবাৎ। কিন্তু ইঁহারা অজগরবৃত্তি ধরিয়া বসিয়া থাকিবেন, আর প্রমাণ বেচারী পশুপক্ষীর মত ছুটিয়া আসিয়া ইঁহাদের মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট হইবে, এরূপ আশা করা কি সঙ্গত হইবে? রেডিয়াম সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রমাণ, তাহা কি এমনি করিয়াই বৈজ্ঞানিকের হাতের কাছে উপনীত হইয়াছিল? বিজ্ঞানে কোন কোনও বড় তথ্য অতর্কিতভাবে আসিয়া আমাদের কাছে ধরা দিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাকে পাকা সিদ্ধান্ত রূপে খাড়া করিতে, নানা দিক হইতে নানা রূপ প্রমাণের দ্বারা পরীক্ষা করিতে, কত বৈজ্ঞানিক আচার্য্যকে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ করিতে হইয়াছে। ঘাসের উপর যে নীহার-বিন্দুটি ঝক্ঝক্ করিতেছে, অথবা পদতলে যে ধূলি-রেণুগুলি সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে-করিতেই হয় ত দু'চারজন টিণ্ডাল পার হইয়া গেলেন। একটা নূতন গ্রহ আবিষ্কার করিতে কত গণাগাঁথা, কত ভূয়োদর্শন পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। আকাশের একস্থানে একটুকু নীহারিকা লইয়া একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ হয় ত সারাজীবনটা এমনি বিভোর হইয়া আছেন যে, আমার মত একজন আনাড়ী 'নীহারিকা' নামটা শুনিয়া ভাবিবে, এটা নিশ্চয়ই জ্যোতিষী মহাশয়ের প্রিয়তমা প্রণয়িনীর নাম! দৃষ্টান্ত গাড়ী-গাড়ী উপনীত করা যাইতে পারে। কথাটা এই যে, 'প্রমাণাভাবাৎ' এই হেতুটি দেখাইবার পূর্ব্বে প্রমাণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরীক্ষাটা সারিয়া লওয়া দরকার। হয় ত হইতে পারে, কোন-কোনও বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহাদি করিবার গরজ আমার নাই; আমি দার্শনিক বা গণিতবিৎ,—রসায়নশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রমাণের অনুসন্ধান ও পরীক্ষা আমি হয় ত আমার এলাকার বাহিরে ভাবিতে পারি। আমি কিন্তু এসব ক্ষেত্রে রায় দিবার অধিকারী নহি। রসায়নশাস্ত্রের প্রসঙ্গ উঠিলে আমার চুপ করিয়া থাকা বা সরিয়া পড়াই কর্ত্তব্য। যেটা নিজে দেখি নাই; অপরে দেখিয়াছে বলিতেছে,—কিন্তু তাহার সাক্ষ্য কতদূর বিশ্বাস-যোগ্য তাহা পরীক্ষা করিয়া লইবার প্রবৃত্তি বা অবসর যেখানে আমার নাই; সেখানে কথা না কওয়াই ঠিক। যাঁহার মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে প্রমাণ পর্য্যালোচনা করার প্রবৃত্তি বা অবসর নাই, তাঁহার ও-সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য না করাই শ্রেয়ঃ। যিনি কতকদূর পর্য্যন্ত প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া মনের কবাট বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত নয়। নিজে তাঁহাকে নূতন প্রমাণের খোঁজ লইতে হইবে; অপর কাহারও দ্বারা বা দৈবাৎ নূতন প্রমাণ তাঁহার সম্মুখে প্রেরিত হইলে তিনি অপক্ষপাতে তাহাকে তুলিয়া লইয়া পরখ করিয়া দেখিবেন; যে ধারণা তাঁহার মধ্যে হইয়া রহিয়াছে, তাহার অনুকূল হইলেই প্রমাণটা গ্রাহ্য, আর প্রতিকূল হইলেই হেয়,—প্রমাণই নহে,—এমনটা ভাবিলে চলিবে না। এ কথাগুলা বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের "সদা সত্য কথা কহিবে" প্রভৃতি নীতিবাক্যের মত সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। বিজ্ঞান শিখিতে গিয়া এ কথাগুলি কেহই ভুলে না; বুড়া বয়সে যাঁহারা বিজ্ঞানের গণ্ডী একটু-আধটু অতিক্রম করিয়া অধ্যাত্ম-বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারাও এ কথাগুলি ভুলিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু আমাদের সবজান্তা সংশয়বাদীরা কোন আসরেই চুপ করিয়া হটিয়া আসিবার পাত্র নহেন। বেদ বা শাস্ত্রে তাঁহারা সাক্ষাৎ 'জননী' হইলে কি হইবে, বেদ সম্বন্ধে তাঁহাদের জেরা আপত্তি প্রভৃতির বহর ও ঘটা দেখিলে, স্বয়ং সগরসন্ততিগণের প্রসূতিকেও লজ্জা পাইতে হইত। বেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা, তাহা একান্তই বাজে আলোচনা, তাহার দ্বারা বর্ত্তমানে আমাদের কোনই উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই, এইরূপ ভাবিলেও সত্যের অপলাপ করা হইবে। এখনও ভারতবর্ষে কোটি কোটি নরনারীর জ্ঞানধারা ও কর্ম্মধারা মুখ্যতঃ বেদ-নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতেই প্রবাহিত হইতেছে; এখনও আমাদের ছোট বড় সকল রকম অনুষ্ঠানে মন্ত্র ও তন্ত্রের আধিপত্য খুবই বেশী। ভাল হউক, মন্দ হউক, ইহাদের পরীক্ষা একান্ত আবশ্যক। আমাদের জাতীয় জীবনে এতটা স্থান ইহারা জুড়িয়া বসিয়া আছে; কিন্তু এতটা স্থান অধিকার করিয়া থাকিবার যোগ্য কি ইহারা? ইহারা কি একটা চিরন্তন সত্যের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, সনাতন? অথবা, প্রাচীন যুগে ইহাদের যতই সার্থকতা থাকুক না কেন, বর্ত্তমান যুগে ইহারা অনাবশ্যক জঞ্জাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—

আমাদের বর্ত্তমান জীবনধারাকে অযথা সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছে; সুতরাং যত সত্বর আমরা এই আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারি, ততই ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের পক্ষে মঙ্গল। অথবা ভাবিব যে, ইহাদের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অপগত হয় নাই; ইহাদিগকে দেশের ও যুগের ঠিক উপযোগী করিয়া লইতে পারিলে ইহাদের প্রয়োজন এখনও বড় কম হইবে না। এ সমস্ত প্রশ্নের গুরুত্ব নিতান্ত সাধারণ নহে; কারণ, আমাদের বেদ প্রভৃতি মিশর ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের ভূস্তরে প্রোথিত প্রাচীন যুগের নিদর্শনগুলির মত বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সকল সজীব সম্পর্ক হারাইয়া বিলীন হইয়া নাই। অনেকাংশে আগাছা পরগাছার প্রাদুর্ভাব হইলেও, বেদ-মহীরুহ এখনও সজীব এবং এখনও তাহার শাখা-প্রশাখার বিপুল আলিঙ্গনের মধ্যে সমগ্র আর্য্য-সভ্যতা ও হিন্দুসমাজ বিরাজ করিতেছে। ইহা কি সত্যসত্যই বিষবৃক্ষ যে, ইহার আওতায় থাকিয়া এবং ইহার ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া এত বড় জাতিটা অবসন্ন, মৃতকল্প হইয়া গেল; ছায়ার তলে অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিতে-থাকিতে ভুলিয়া গেল যে, একটা উদার, ভাস্বর, মুক্তাম্বর তলে বিশ্বমানবের জীবনের ভাব ও সাধনাগুলি মহাপারাবারের উর্ম্মিরাশির মত মুক্তির আনন্দে ও স্বাধীনতার গর্ব্বে ফাঁপিয়া উঠিতেছে? অথবা বেদ সত্যসত্যই অমৃত ফল প্রসব করিতে সমর্থ—এমন একটা শান্তি ও অভয় নিজের পুণ্য-কলেবরের নিম্নে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে যে, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও, ঐ অকূল ভবজলধির ঝড়-তুফানের মধ্য হইতে মানবাত্মা আশ্বস্ত ও সুস্থির হইতে পারে? এ সমস্যার একটা বিহিত সমাধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রাচীন ভাব ও সাধনাগুলির সঙ্গে নবীন ভাব ও সাধনা-গুলির, বেদের সহিত বিজ্ঞানের একটা বোঝাপড়া হওয়া খুবই দরকার। কারণ, আমাদের এই ভারতবর্ষে প্রাচীন যে শুধুই পুরাতত্ত্ব বা প্রত্নতত্ত্ব হইয়া যায় নাই; প্রাচীনে ও নবীনে, সেকালে ও একালে, এমনধারা মাখামাখি অন্য কোনও দেশে এমন ভাবে হইয়াছে কি না, আমার জানা নাই। প্রাচীন ভাব ও কর্ম্মবিধিগুলি প্রাচীন হইয়া একেবারে ইজিপ্সিয়ান মমির মত পুরাতত্ত্বের সামিল হইয়া পড়িলে গোল থাকিত না; মমিকে তার নীরব, অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন সমাধি-কক্ষ হইতে বাহির করিয়া যাদুঘরে লোক-চক্ষুর পরীক্ষার সম্মুখে হাজির কর, বিজ্ঞানাগারে লইয়া ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা কর, সে কথা কহিবে না। কাণে শুনিবার মতন করিয়া আত্ম-কাহিনী বলার দিন তার কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের বেদ, তন্ত্র প্রভৃতি যে পুরাতন হইয়াও নূতন; এখনও গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরীর পুণ্যোদক-শীকর-সংস্পর্শে স্নিগ্ধ-মধুর, প্রসন্ন-গম্ভীর বেদমন্ত্র ও পৌরাণিক স্তব-গাথা-গুলি শত সহস্র নরনারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া, সেই সামগান ঝঙ্কারিত প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তকে আমাদের পরিচয় ও মমতার মধ্যে সজীব ও সজাগ করিয়া রাখিয়াছে; এখনও দৈন্যপীড়িত রোগক্লিষ্ট ভারতের পল্লীবাসের মাথার উপর সেই ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যকের আকাশে 'বাতাঃ' পূর্ব্বের মত ঠিক মধু ক্ষরণ না করিলেও, হোমযজ্ঞের ধূমগন্ধ-রেণুগুলি বহন কখন-কখনও করিয়া থাকে; এখনও ভারতের গ্রামে-গ্রামে, প্রান্তরে-প্রান্তরে 'পন্থানঃ' ঠিক 'শিবাঃ' না হইলেও, মন্দির ও দেবায়তনগুলি ঠিক সুন্দর ও সযত্ন-রক্ষিত না হইলেও, বেদপন্থী সমাজের চরণ অঙ্ক সহস্রশঃ ধারণ করিতেছে এবং তীর্থযাত্রীর অবনত মস্তক-স্পর্শে নিজেদের সঞ্চিত মালিন্য কতকটা মুছাইয়া লইতেছে! আমি হয় ত বিজাতীয় ভাবের ও কর্ম্মের আবর্ত্তে পড়িয়া পাক খাইতেছি, দিশেহারা হইয়াছি; কিন্তু তথাপি কেমন করিয়া ভুলিব, হে এয়ি সনাতনি! তোমার ঐ বিশ্বরূপ-ভারতের কোটি-কোটি নরনারীর হৃদয়ে পাতা তোমার সিংহাসন; কেমন করিয়া ভুলিব, বর্ত্তমানের উপর তোমার সংযত শাসন ও প্রভাব, এবং ভবিষ্যতের দিকে তোমার শান্ত অভিযান! তাই বলিতেছিলাম, বেদ জিনিসটা উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া রাখিবার জিনিস নয়—ভারতীয় জীবন যাহাকে অবলম্বন করিয়া পুষ্ট, বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এবং এখনও অশেষ দৈন্য ও গ্লানির মধ্যেও যাহাকে আশ্রয় করিয়া মুখ্যতঃ টিকিয়া আছে, সে জিনিসটা উপেক্ষার জিনিস নয়। তাহার একটা নূতন করিয়া পরিচয় লওয়া, হিসাব-পরিমাণ লওয়া, সওয়াল-জবাব লওয়া, বড় কাজ বই বাজে কাজ নয়। সওয়াল-জবাব করিয়া যদি তৃপ্তি না পাই, তবে না হয়, বেদ এতটা বাহাল থাকিলেও, তাহাকে ক্রমশঃ আস্তা-

দের চিন্তা ও কর্ম্মরাশি হইতে সরাইয়া বাতিল করিয়া দিব। প্রয়োজন বুঝিলে আমরা না হয় সকলে সেই ইজিপ্সিয়ান মমির মত বেদের ও তন্ত্রের পুঁথি কয়খানাকে ভূ-গহ্বরে আঁধার সমাধির মধ্যে যাহাতে কীটভুক্ত হইয়া পঞ্চত্ব না পাইতে পারে, এমন ভাবে না হয় আবদ্ধ করিয়া রাখিব। কিন্তু সে প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে কি? প্রশ্নটার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিয়াছি, কারণ, আমরা কটাক্ষে একবার বিশ্বরূপটি দেখিয়া লইয়াছি। এখন, প্রশ্নের জবাব পাইতে হইলে আমাদের কি করিতে হইবে? প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, বেদমত ও বেদবিধি কি পরিমাণে সত্যের উপর স্থাপিত, কতটা যথার্থ? বেদমন্ত্র দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিব। ভাল; কিন্তু দেবতা ও পিতৃগণের সত্তা কোথায় ও কি ভাবে? মন্ত্রের সঙ্গে তাঁহাদের সত্তার সম্পর্ক কিরূপ? এ অনুষ্ঠানের কতটাই বা যাথার্থ্যানুমোদিত, কতটাই বা কল্পিত, রূপক বা প্রতীক? সাহেব পণ্ডিতেরা সভ্যসমাজের অনেক ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠানকে পূর্ব্বতন বর্ব্বর-সমাজের অনুষ্ঠান প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ, অনুবৃত্তি অথবা প্রতীক মনে করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে হয়ত তাহাই বটে; কিন্তু আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়েও তাহাই কি না? বৈদিক যজ্ঞ ও মন্ত্র কি সেই বর্ব্বরযুগের মোহকলিল ইন্দ্রজাল (ম্যাজিক), যাহা সর্ব্বথা না হউক, অনেকাংশেই নিষ্ফল ও অর্থহীন আড়ম্বর মাত্র? সামান্ত animism বা ঐ রকম একটা সূত্র অবলম্বন করিয়া সেই বর্ব্বর-সমাজের বুজরুকি ও তুক্-তাক্‌গুলি ক্রমশঃ দানা বাঁধিয়া জটিল ও বিশাল হইয়াছিল; সিন্ধু-সরস্বতী-তীরে আসিয়া আমরা সেই প্রাচীনতর বুজরুকিগুলারই আবার মাথা-তোলা survival দেখিতে পাইতেছি; ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই; এবং এগুলা অত গুরুগম্ভীরভাবে নেবার মত জিনিসও নহে। আমরা ত বেজায় সভ্য হইয়াছি, কিন্তু আমাদের বিবাহ-বিধির বরযাত্রা, স্ত্রী-আচার প্রভৃতি অনেক অনুষ্ঠানে কি আমরা সেই প্রাচীন বর্ব্বরসমাজের বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ,—ইন্দ্রজাল প্রভৃতির সুস্পষ্ট নিদর্শন আবিষ্কার করিতে পারি না? বেদ ও তন্ত্রের আসল ব্যাপারগুলার এই রকম একটা ব্যাখ্যা বিলাতী পণ্ডিতেরা দিয়াছেন, এবং সে ব্যাখ্যা আমাদের অনেকের কাছেও বেশ রুচিকর হইয়াছে। কিন্তু সত্যসত্যই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—আসল ব্যাপারখানা কি? ঐ সমস্ত বেদমত ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের মূলে কি কোন সত্য নিহিত আছে, পুরাতত্ত্ব ছাড়া? বেদমত শুনিয়া আপনারা বিস্মিত হইবেন না। পরাবিদ্যা বা উপনিষৎগুলিতে জগতের যেমন হউক একটা কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা ত আছেই; পরন্তু বেদের যে ভাষাটাকে অপরা বিদ্যা বলিয়া আমরা সম্প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই ক্রিয়াকাণ্ড স্বরূপ সংহিতা ও ব্রাহ্মণেও মতবাদ অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। উল্কা লাল বা সোমরস তেজস্কর এই রকম কতকগুলি তথ্য বিবৃতি (statements of facts) লইয়াই বেদ নহে। যেই বেদ বলিলেন, দেবতার উদ্দেশে স্বর্গকামকে যজন করিতে, অমনি নানা প্রশ্ন ও মতবাদের মধ্যে আমরা গিয়া পড়িলাম। দেবতা কাহারা? কি স্বরূপ তাঁহাদের? তাঁহাদের কি মন্ত্রাত্মক শরীর, না ভৌতিক কোন প্রকার শরীর বা বিগ্রহ আছে? স্বর্গ কি ও কোথায়? আমার যজন অনুষ্ঠানের সহিত দেবতা ও স্বর্গের সম্পর্ক কিরূপ? মরণকালে আত্মার সত্তা থাকে কি না? প্রেতলোকে প্রয়াণ আছে কি না? এই সকল মতবাদ ঐ একটুখানি বৈদিক ব্যবস্থার অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এখন বিলাতী পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিয়া এই কথাটা জোর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে—এ সকল মত-বাদের মূলে কি পরিমাণে সত্য রহিয়াছে? স্বর্গ, দেবতা, মন্ত্র, আত্মার জন্মান্তরপ্রাপ্তি,—এ সকল কথা কি পরিমাণে যথার্থ? কষ্টিপাথরে কষিয়া-মাজিয়া এ কথাগুলির পরখ করিয়া লইতে ইচ্ছা করে। আর, নানা বিপ্লব ও রূপান্তর সত্ত্বেও, আমরা যখন এখনও মুখ্যতঃ বেদশাসিত ও বেদানুবর্ত্তী, তখন শুধু প্রত্নতত্ত্ব করিলে আমাদের চলিবে না; পরীক্ষা ও বিচার করিয়া আমাদের দেখিতে হইবে, এই বেদের কোন্ অংশই বা উপাদেয় এবং কোন্ অংশই বা হেয়। এইরূপ পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা শুধু বেশী নহে, ঐকান্তিক হইয়া পড়িয়াছে; কারণ, জাতি-হিসাবে, একটা বিশিষ্ট প্রাচীন সভ্যতা-হিসাবে আমরা বাঁচিব কি মরিব, ইহারই সমস্যা আমাদের সাম্‌নে উৎকটভাবে দেখা দিয়াছে। ইহাকে যেমন একদিকে অস্বীকার করার উপায় নাই, তেমনি অন্যদিকে নিশ্চিন্তভাবে ধামা-চাপা দিয়া ফেলিয়া রাখারও উপায় নাই। আর, এই সমস্যার সত্য-সত্যই একটা সমাধান আমাদের পাইতে হইলে, শুধু ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী

বা ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কীটদষ্ট পুঁথিগুলার ধূলি ঝাড়িয়া প্রত্নতত্ত্ব করিলে চলিবে না;—আবার সেই বিজ্ঞানাগারে আমাদের ঢুকিতে হইবে;—দেখিতে হইবে, নূতন বিজ্ঞানের রেডিয়াম, ইলেকট্রন্, রঞ্জন-রে প্রভৃতির মধ্যে সেই প্রাচীন বেদ-বিজ্ঞানের সত্যতার কোনরূপ আভাষ ইঙ্গিত ধরা পড়িতেছে কি না। আবার সেই তপোবন-সিদ্ধাশ্রমের দিকে আমাদের যাত্রা করিতে হইবে;—দেখিতে হইবে, যোগজ-প্রত্যক্ষের কোরকগুলি, পাপড়িগুলি ধীরে-ধীরে খুলিয়া তাহার মধ্যে স্যার অলিভার্ লজ্, স্যার আর্থার কোনান্ ডইল প্রভৃতির মনীষা দৃষ্টির সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া দিয়া অচিন্তিত-পূর্ব্ব বাস্তব ইন্দ্রজাল, সুস্থির হইয়া জাগিয়া বসিয়া আছে কি না। পরীক্ষার পরিসর ও গভীরতা এতদূর পর্য্যন্ত না হইলে, শুধু পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বে কুলাইবে না।

বেদের অংশবিশেষ উপাদেয় এবং অংশবিশেষ হেয়; এবং তাহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে,—এ কথা শুনিয়া ক্ষোভের বা ভয়ের কোনই কারণ নাই। আমরা অনেকেই মুখে বেদবাক্যে সায় দিই। বেদের যেটুকু বুঝি এবং নিজের জীবনে বরণ উদ্‌যাপন করিয়া লইতে প্রস্তুত হই, সেইটুকুই আমার কাছে উপাদেয় অংশ; আর যে অংশ বুঝি না বা ভুল বুঝি, অথবা বুঝিলেও, নিজের জীবনে স্বীকার করিয়া লইয়া, নিজের ভাবসাধনা ও কর্ম্মসাধনার মধ্যে সাকার করিয়া তুলিতে প্রস্তুত হই না, সে অংশে আমি মুখে গোলে-হরিবোল দেওয়ার মত সায় দিয়া গেলেও, সেটা আমার কাছে প্রকৃত প্রস্তাবে হেয়। আমি তাহাকে না-বোঝার মধ্যে, ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে, অবজ্ঞার মধ্যে বনবাস দিয়া রাখিয়াছি। আমাদের অনেকেরই বেদবিশ্বাস বা আস্তিক্য এই জাতীয়। ইহাকে ঠিক আস্তিক্য বলে না। বেদ জীবনবেদ না হইলে আস্তিক্য ভুয়ামাল হইয়া থাকে। আমাদের অনেকের ঈশ্বরে বিশ্বাস সেরূপ। ব্রহ্মদর্শী ঋষি না হওয়া পর্য্যন্ত, চরমবেদ সাক্ষাৎ করা না পর্য্যন্ত, বিশ্বাস ও আস্তিক্যে কিছু-না-কিছু ভেজাল থাকিবেই; এবং যে ব্যক্তি ভেজাল ধরিয়া দিল, তাহার মাথা লইবার হুকুম দিলে সত্যের অপলাপই করা হইয়া থাকে,—তাহাতে বিশ্বাস ও আস্তিক্যের বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত হয় না। ভাবের ঘরে চুরি করার চেয়ে আত্মঘাত আর নাই; এবং আত্মঘাতীর চেয়ে বড় অবিশ্বাসী ও নাস্তিক কে? "আত্মানাং বিদ্ধি" ইহাই বেদ—আত্মাই সব এবং এই সবটাকে জানিলেই চরমবেদ জানা হইল। অতএব হেয় ও উপাদেয়, এই কথা দু'টি শুনিয়া ক্ষোভ করিলে চলিবে না। জ্ঞানের মধ্যে, উপলব্ধির মধ্যে যেট'কে সুস্থির ভাবে ধরিতে পারিয়াছি, তাহাকেই আমি স্বীকার, অঙ্গীকার করিয়াছি; আর, যেটাতে আমার সংশয়, প্রমাদ, কুণ্ঠা ও কৃপণতা, সেটা স্বয়ং বেদ হইলেও আমার দূরে, বাহিরে, অস্বীকৃত, অনাত্মীয় হইয়া পড়িয়া আছে। মুখে "বসুধৈব কুটুম্বকম্" বলিলে কি হইবে, কথায় কথায় "বেদ শব্দব্রহ্ম" আওড়াইলে কি হইবে,—যতক্ষণ কায়মনোবাক্যের মিল না হইতেছে, ততক্ষণ কেহ বা আমার অরি, কেহ বা মিত্র,—কোনটা আমার উপাদেয়, কোনটা আমার হেয়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে এ কথা শুনিয়া, কেহ-কেহ হয় ত বেদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অথবা অশ্বডিম্বিক ব্যাখ্যা, এইরূপ একটা অপরূপ সামগ্রী দেখিবার প্রত্যাশা করিতেছেন। আপনাদের আশাভঙ্গ করিতে চাহি না,—হালের বিজ্ঞানের তরফ হইতে আমাদের পুরান ঘরওয়া কথাগুলির পরীক্ষা করিয়া লওয়ার দুরভিসন্ধি এ অধম লেখকের একটু আধটু আছে। তাহার পরিচয় আপনারা ক্রমশঃ পাইবেন। মন্ত্রশক্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, আমাকে পূর্ব্বে দুই-এক দিন বিজ্ঞানের রেডিয়াম্, ইলেকট্রণ প্রভৃতি লইয়া এমন হাতসাফাই এবং অসাধ্যসাধন-নিপুণতা দেখাইতে হইয়াছিল যে, আমার কোন-কোন বিশিষ্ট বন্ধু আমার বৈদিক-রেডিয়ামকে অশ্বডিম্বেরই মাসতুত ভাই বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অনুযোগ করিবার উপায় আপাততঃ দেখিতেছি না। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া তিনটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ না রাখিলে আমাদের গোলে পড়িবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিব মনে করিলেই অমনি দেওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও বিচারে অতি সতর্কতা সহকারে প্রমাণ সংগ্রহ, প্রমাণ বিশ্লেষণ, প্রমাণ সমালোচন করিতে হয়। যাঁহারা বিজ্ঞানাগারে ঢুকিয়া দেখিয়াছেন, অথবা বৈজ্ঞানিকদের লেখা পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর এ কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। ফল কথা, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছেলেখেলা নহে। পক্ষান্তরে, যতক্ষণ

পর্য্যন্ত না পুরাপুরিভাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত চোখ-কাণ বুজিয়া বসিয়া থাকিব, বেদের কথায় কাণে আঙ্গুল দিব,—এরূপ পণ করিয়া থাকা-টাও সঙ্গত হইবে না। বিজ্ঞান যাহাকে প্রমাণ বা demonstration বলে, সেটা ঘটিবার পূর্ব্বে, অনেক সময়ে অনেক তথ্যের পূর্ব্বাভাষ আমরা প্রকারান্তরে পাইয়া থাকি। পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের অবস্থা-বিষয়ে কোন-কোনও অংশে সৌসাদৃশ্য (analogy) দেখিয়া আমরা আন্দাজ করি, হয় ত মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিমান্ জীব বাস করিয়া থাকে। এ আন্দাজটাকে প্রমাণিত সত্য বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে। কিন্তু আবার, আন্দাজটাকে একেবারে তুচ্ছ, হেয় করিয়া দিলেও, প্রমাণসংগ্রহ ও প্রমাণ-ব্যবস্থার পথটাকে রুদ্ধ বা সঙ্কীর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে। Analogy বা উপমানের কদর বিজ্ঞানে নিতান্ত কম নয়। জলে ঢেলা ফেলিয়া তরঙ্গ-সৃষ্টি দেখিয়া লইলাম; অথবা একগাছা দড়ি বা তারকে কাঁপাইয়া তরঙ্গের হিসাব লইলাম। এই দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া, এবং এই দৃষ্টান্তের উপমানে বায়ু, ঈথারে কত-না তরঙ্গ-সৃষ্টি ভাবিয়া লইয়া, বৈজ্ঞানিকের মাথা বড়-বড় সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া তুলিতেছে। লাটিম আমরা অনেকেই ঘুরাই, এবং চুরুটের ধোঁয়ার কুণ্ডলাকারে উর্দ্ধগতি আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু হেল্‌ম-হোল্‌জ এবং লর্ড কেল্‌ভিনের মাথা ঈথারে যে লাটিম ঘুরাইয়া দিয়াছে, সেটাকে ছেলেখেলা বলিবে কে? ঈথারে চুরুটের ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকান যে সকল অণুর সৃষ্টি করিয়াছে, সে-গুলিকে বিশুদ্ধ গঞ্জিকা-ধূম-প্রসূত বলিবার সাহস কাহার? হঠাৎ একটা-কিছু সাদৃশ্য দেখিয়া অনেক বড় থিওরিই বৈজ্ঞানিকদের মাথায় গজাইয়া উঠিয়াছে। নজির আর কত দেখাইব? অতএব যাঁহারা মনে করেন, হয় বিজ্ঞানের নির্ম্মম অগ্নি-পরীক্ষায় এখনই শ্রুতিকে একদম উত্তীর্ণ হইতে হইবে, নয় সে প্রাচীনা-তপস্বিনীর বেশে আমাদের সাম্‌নে উপস্থিত হইলেও তাহাকে পাকা অসতী বলিয়া পত্রপাঠ বিদায় দিতে হইবে,—যাঁহারা এই সরাসরি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতাগুলি আর একবার উল্টাইয়া দেখিলে ভাল হয়। নিউটন্ শিষ্ট বৈজ্ঞা-নিক, কিন্তু এ্যাল্‌কেমিতে বিশ্বাস করিতেন; তাঁহার সেই এ্যাল্‌কেমি, প্রাচীন পণ্ডিতদের সেই Philosopher's Stone গত দুই-আড়াই শতাব্দী ধরিয়া গোঁড়া বৈজ্ঞানিক-দের কত বিদ্রূপই না সহিয়া মরমে মরিয়া রহিয়াছে! কিন্তু, বিজ্ঞানেরও বোধ হয় ভাগ্যবিধাতা পুরুষ কেহ আছেন; তোমার-আমার, এমন কি, স্পেন্‌সার-হাক্সলির ভোট গ্রাহ্য না করিয়াই তিনি বোধ হয় বিশ্বমানবের দৃষ্টিকে সময়ে-সময়ে নূতন দিকে ফিরাইয়া দেন, বুদ্ধি ও সংস্কারগুলিকে সময়ে-সময়ে একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া দেন। এই বিংশ-শতাব্দীর পূর্ব্বাহ্নেই বিজ্ঞানে এই প্রকার একটা যুগ-বিপর্য্যয় সূচিত হইয়া গিয়াছে। এ্যাল্‌কেমি আর খ-পুষ্প অথবা নরশৃঙ্গবৎ একটা নিতান্ত আজ্‌গবি কোন ব্যাপার নহে। রসায়নশাস্ত্রের অণু (Atoms) গুলার স্বত্ব যে দলিলের উপর, সে দলিল কায়েমি বা পাকা নহে। অণু ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যাইতে পারে, যাইতেছে; একজাতীয় অণু অন্যজাতীয় অণুতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; থোরিয়াম রাদার্‌ফোর্ড সাহে-বের পরিভাষা মত থোরিয়াম x নামক অভিনব পদার্থে বিব-র্ত্তিত হইতেছে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের মিলি-য়াছে। রূপার চাকৃতি বা সোণার চাকৃতি বা কাগজের টুক্‌রা যে মুহূর্ত্তে শূন্যে মিলাইয়া গিয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণের নির্ব্বাণ পদবী লাভ করে, ইহা আমাদের মত গরীব মাষ্টার-কেরাণীর দল, যাঁহাদের ব্যাঙ্কে খাতা আরম্ভ করিবার সৌভাগ্য এ জন্মে কস্মিন্‌কালে হইবে না, প্রতিক্ষণেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু এক মুঠা ধূলি লইয়া বৈজ্ঞানিকের কাছে উপনীত হইলে, তিনি যে তাহাকে বনমানুষের হাড় ছোঁয়াইয়া এক মুঠা সোণা করিয়া দিতে পারেন, অন্ততঃ ভবিষ্যতে পারি-বেন, এমন কল্পনা আবার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—এ কথাটা আমি কিছুদিন হইতে শুনিতেছি। কথাটা শুনিলেও, কথাটা ভাঙ্গা সকলের পক্ষে সর্ব্বথা নিরাপদ নহে; বিশেষতঃ, যাঁহাদের গৃহিণী গহনাপত্রের জন্য বায়না-আব্‌দার এখনও করিতে ছাড়েন না। সে যাহাই হউক, একদিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার গুরুত্ব যেমন আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, তেমনি অন্যদিকে আবার সতত সজাগ থাকিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে, কোথায় কোন্ সৃষ্টিকৌশলের ও মানব-প্রকৃতির মহারহস্য ইঙ্গিতে কতকগুলি চিহ্ন বা সঙ্কেত মাত্র পাঠাইয়া, নিজের অবস্থিতি আমাদের জ্ঞাপন করিয়া দিতে চাহিতেছে, নিজের অর্থ আমাদের কাছে উন্মোচন করার উপক্রম করিতেছে। এবংবিধ সঙ্কেতগুলি

(analogies) দিগ্‌দর্শনের মত তথ্যের রথ্য আমাদের বিভ্রান্ত দৃষ্টিকে ধরাইয়া দেয়। সাদৃশ্য ও সঙ্কেতে শুধু যে প্রেমের রাজ্যে পূর্ব্বরাগ সূচিত হয় এমন নহে; জ্ঞানের রাজ্যেও সাদৃশ্য দেখিয়া এবং সঙ্কেত বুঝিয়াই আমরা সত্যালোকের একটা হদিশ পাই।

গগন-সীমান্তে সাগরের নীলজলের ঢেউয়ের চপল বাহু ছিনাইয়া ভানু তাড়াতাড়ি প্রকাণ্ড একটা বহ্নি গোলকের মত কখন উঠিয়া পড়িবেন দেখিতে বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়াছি; তপনদেব ভারিখি়া দেবতা; তাঁহার "বরেণ্যং ভর্গঃ"; তাঁহার কি আর অত বেলা পর্য্যন্ত সাগরের লহরীপাশের মধ্যে পড়িয়া থাকা ভাল দেখায়? তাই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িতেছেন। কিন্তু তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হইলে কি হইবে, উষার অরুণরাগ অনেক আগেই জানাইয়া রাখিয়াছিল, তাঁহার বিপুল, বরণীয় দেবকান্তি নীলসিন্ধু জলে কোথায় কি ভাবে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমি দার্শনিক, শুষ্ক তর্ক-ব্যবসায়ী,—কবিত্ব আমার আসে না; তবে কথাটা এই যে, সত্যের নির্ম্মল প্রভাতের সূচনা হইয়া থাকে অনেক স্থলেই উষার অস্পষ্ট আলোছায়ার মধ্যে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের এ কথাটা ভুলিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ইহাই আমাদের প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সত্যের চরম, এমন কি, সুব্যবস্থিত কষ্টিপাথর নহে। এ কথাটা আমরা গতবারে খোলসা করিয়া বলিয়াছি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উৎরাইলেই পাকা সিদ্ধান্ত হইয়া গেল, এবং না উৎরাইলেই পচিয়া গেল,—এরূপ মনে করিলে গোঁড়ামি হইবে। বিজ্ঞান স্বয়ং অসিদ্ধ; প্রতিনিয়ত তার মতবাদ (theories), এমন কি পরীক্ষালব্ধ ফলাফল পর্য্যন্ত বদ্‌লাইতেছে; কদাচিৎ বা ডিগ্‌বাজি খাইতেছে। সুতরাং এই শিথিল ভিত্তির উপর কোনও পাকা এমারৎ তুলিতে গেলে আহাম্মুকি হইবে। "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" তাবৎ কোনও জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত কি না তাহা জানি না; যাহাকে আমরা বিজ্ঞান বা (science) বলিতেছি, তাহা যে কোন অংশেই সে প্রকার নহে, তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। বিজ্ঞানের অন্ত আইন-কানুন ত বদ্‌লাইতেই পারে; কিন্তু যে গণিতের ভিত্তির উপর নিউটন, লাপ্লাস্, লাগ্রাঞ্জ, গাউস প্রভৃতি মহাশিল্পিগণ বিজ্ঞানের মায়াপুরী গত দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া তুলিয়া বিশ্বামিত্রের মত ভাবিতেছিলেন, আমরা এক-একজন ব্রহ্মা,—আজ সেই মায়াপুরী যে ভোজবাজী, তাহা বৈজ্ঞানিকেরাই কবুল করিতেছেন। ডাক্তার Bertrand Russel Newtonian Dyanamics সম্বন্ধে বলিতেছেন—ইহা "first rough sketch of the ways of Nature"—প্রকৃতি-রাজ্যের ব্যবস্থার একটা প্রাথমিক মোটামুটি নক্সা মাত্র,—প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্য ধারাপাত বই আর কিছুই নহে। অথচ বিশ-পঁচিশ বর্ষ পূর্ব্বেও বৈজ্ঞানিকেরা এই ধারাপাতখানা হাতে করিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেন। ম্যাক্, পোঁয়াকারে, কার্‌ল পিয়ার্সন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানের গোঁড়ামিতে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেছিলেন এবং নানা রকম জেরা কাটিতেছিলেন পূর্ব্ব হইতেই; কিন্তু আইন্‌ষ্টাইন্, মিন্‌কভ্‌স্কী প্রভৃতি নবীনেরা দেশ ও কালের (Space and Timeএর) যে অপরূপ খিঁচুড়ি বানাইয়া, আমাদের মতন অবৈজ্ঞানিক হইতে সুরু করিয়া রয়েল সোসাইটি পর্য্যন্ত সকলের পাতে পরিবেশন করিতেছেন, তাহাতে ভয় হয়, সে গুরুভোজন শীঘ্রই আমাদের মগজে উঠিয়া অচিরাৎ আমাদের fourth dimension of spaceএর একটা অপরোক্ষ জ্ঞান দিয়া ফেলিবে! ফল কথা, সবই ওলট-পালট হইয়া যাইতেছে; দুই আর দু'ইএ যে চার হয়, এ কথাটা বলিতে গেলেও কোন্ দিন বা হালের পণ্ডিত মুখ চাপিয়া ধরেন! ভরসা কিছুই নাই। বিজ্ঞানে যখন এই প্রকার "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা" অবস্থা, তখন তাহার থিওরিগুলিকে একান্ত ভাবে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে, তাহার পরীক্ষালব্ধ ফলাফলগুলিকে হালের অভ্রান্ত বেদ ভাবিতে আমরা নারাজ। তাই বলিয়া বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও বিচার অকেজো—এ কথা কেহই বলিবে না। আংশিক ভাবে হউক, সন্দিগ্ধ ভাবে হউক, সাপেক্ষ ভাবে হউক,—এ প্রকার পরীক্ষা ও বিচারও তথ্য-নির্ণায়ক হইয়া থাকে; একেবারে নিশ্চিন্ত ও নিঃসংশয় না করিয়া দিলেও, দৃষ্টিকে প্রসারিত, বিচারশক্তিকে সাহসপ্রাপ্ত ও জ্ঞানকে পুষ্ট করিয়া দেয়। এই জন্য বেদ প্রভৃতিকেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় মিলাইতে আপত্তি নাই। কিন্তু এখনই মিলাইতে অসমর্থ হইলেই যে বেদ পত্রপাঠ বুজরুকিতে পরিণত হইল, এমন নহে। বিজ্ঞানের দ্বারা যতটুকু বুঝি তাই ভাল। যেখানে

বুঝিতেছি না, সেখানে কোনও রূপ সংকেতসূত্র (suggestive analogies) আছে কি না, তাহাও দেখা দরকার। যেখানে তাহাও পাইতেছি না, হয় ত বিরোধই দেখিতেছি, সেখানে Goetheএর মত "more light"এর জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে; সরাসরি বেদ-পক্ষে বা বিজ্ঞানপক্ষে রায় দিয়া ফেলিলে হঠকারিতা হইবে, সত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইবে।

সে দিন বলিয়াছিলাম এবং আজ আবার বলিতেছি, এইরূপ পরীক্ষায় আস্তিকের ভয়ের কোন কারণ নাই। আমরা সাধারণতঃ যে ভাবে বেদে বা শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া থাকি, তাহাকে বিশ্বাস বলে না; তাহা বিশ্বাসের অভিনয় মাত্র। বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাতে পর্ব্বত টলিয়া থাকে সন্দেহ নাই; কিন্তু যে বিশ্বাস আমার ভিতরে থাকিয়া জীবনকে নূতন ভাবে গড়িয়া দিল না, সে বিশ্বাস অশক্ত, তাহার বোঝা বহিয়া আমি কেবল একটা মিথ্যার বোঝা, ভূতের বোঝা বহিতেছি। "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"—কিন্তু ভক্তি যদি ভান মাত্রই হয়, তবে শত শতবার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়া যাইলেও, সে ভক্তি দ্বারা কৃষ্ণ মিলিবে না। আস্তিক্যের দিক হইতে আশঙ্কা আছে,—যদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা মানে শুধুই থিওরি ও শুষ্ক তর্কের গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া মরা হয়। অপরোক্ষ জ্ঞান সাক্ষাৎ ব্রহ্ম—যে মূর্ত্তিতেই অপরোক্ষ জ্ঞান আমাদের কাছে উপনীত হউক না কেন;—বিজ্ঞানাগার হইতেই আসুক, আর সিদ্ধাশ্রম হইতেই প্রেরিত হউক। এই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করিলেও ক্রমে ব্যপেতভী, নির্ভয় হইবার কথা। এইজন্য সত্যকার বিজ্ঞান হইতে ভয় নাই। সত্যকার বিজ্ঞান হইতেছে—ভূয়োদর্শন, বিশিষ্ট দর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ। ভয় আছে বিজ্ঞানের ছলাকলার কাছে; বিজ্ঞার নামে একটা অবিদ্যা আসিয়া আমাদের স্কন্ধে অনেক সময়ে চাপিয়া বসে;—সে জেরা কাটিবে, তর্ক করিবে, এলোমেলো ভাবে কল্পনা-জল্পনা করিবে, কিন্তু পরীক্ষার নামে সাক্ষাৎ জড়ভরত হইয়া বসিবে। এই প্রকার বিজ্ঞানাভাসকে আমরা দূর হইতে নমস্কার করিতেছি। তাল পড়িয়া টিপ করে, না, টিপ করিয়া তাল পড়ে—এই মহারহস্যের আলোচনা করিতে-করিতে কিছুদিন বাঙ্গালী মস্তিষ্কের হয় ত অপব্যবহার হইয়া থাকিবে; কিন্তু পশ্চিমদেশেও বৈজ্ঞানিক-মহলে এ জাতীয় মস্তিষ্কের অপব্যবহার যে অজ্ঞাত, তাহা মনে হয় না। জেরার মুখে তর্কের টানে কত বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে পথভ্রান্ত হইয়া আবর্ত্তে ঘুরিয়া মরিতে হইয়াছে—এ কথা বিজ্ঞানের ইতিহাসের অনেক নিষ্ফল পরিচ্ছেদ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আমাদের জানাইয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত আজ আর দিব না। ফল কথা, বিজ্ঞানের মত বিজ্ঞান হইলে তাহার কাছে ভয় থাকে না। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বেদকে মিলাইতে গিয়া আমাদের সাবধান হইবারও প্রয়োজন আছে, আবার আশ্বস্ত হইবারও হেতু আছে। এ সম্বন্ধে ইহাই আমাদের দ্বিতীয় কথা।

—তৃতীয়তঃ, আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাই তত্ত্বব্যবস্থার পক্ষে যথেষ্ট নহে; চরম কষ্টি-পাথর নহে। অণুবীক্ষণ বা ঐরূপ যন্ত্র-সাহায্যে হয় ত ধরিতে পারিলাম না—কিসের গুণে গঙ্গোদক অনেক মারাত্মক রোগের বীজাণু ধ্বংস করিতে সমর্থ। এ ক্ষেত্রে হতাশ্বাস না হইয়া আমাদের প্রকৃষ্টতর উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। পশ্চিমদেশের পণ্ডিতেরা বাথ ও ব্যাক্সটন নামক স্থানের জলে ভৈষজ শক্তি (medicinal property) আবিষ্কার করিয়াছেন। খবরের কাগজের চটকদার সংবাদ নহে—আধুনিক বিজ্ঞানের প্রামাণিক (standard) গ্রন্থে পড়িয়াছি; ঐ জল যে রেডিও অ্যাক্টিভ, তাহাও আমরা জানিতে পারিয়াছি। এই রেডিও-activityর দরুণই কি ঐ ভৈষজশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে? যে বস্তু স্বতঃই বিভিন্ন ভাবে তাড়িতশক্তি (α. β. γ. rays) বিকিরণ (radiate) করিতে সমর্থ, তাহাকে আধুনিক বিজ্ঞানের পরিভাষায়, আমরা radio-active body বলিয়া থাকি। হয় ত অল্পাধিক পরিমাণে নিখিল বস্তুই এই শক্তিসম্পন্ন। এ সামর্থ্যে বস্তুর দানাগুলার মধ্যে কি ব্যাপার যে সূচিত হয়, তাহার আলোচনা আগামী বারে বেদের জড়তত্ত্বের আলোচনা স্থলে আমাদিগকে বিশেষ ভাবে করিতে হইবে। আপাততঃ radio-activityর একটা মোটা লক্ষণ দিয়াই আমরা ছাড়িয়া দিলাম। এখন প্রশ্ন এই—রেডিয়াম, থোরিয়াম, পলোনিয়াম বা অপর যে সকল বস্তুতে এই তাড়িত-অণু-বিকিরণ-সামর্থ্য বিশেষ ভাবে আছে, সেগুলিকে কিরূপ পরীক্ষায় আমরা ধরিয়া ফেলিতেছি? আগে কেমন করিয়া জানিতেছি যে, এই বস্তুসকল তাড়িত-

অণুপুঞ্জ মহাবেগে নিজেদের ভিতর হইতে ছটকাইয়া দিতেছে? এটা ধরিয়া ফেলিতে সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষা হার মানিয়াছে; যে spectroscopeএর সাহায্যে আমরা বহুদূরবর্ত্তী গ্রহনক্ষত্রগুলির নির্ম্মাণের মালমসলা জানিতে পারিয়াছি, সে যন্ত্রও এখানে পরাস্ত। এক ফটোগ্রাফিক মেথড্, আর এক ইলেক্ট্রিক্ মেথড্,—এই দুই উপায়ে আমরা বস্তুজাতের এই অত্যদ্ভুত শক্তির সন্ধান পাইয়াছি, এবং সন্ধান পাইয়া জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই বিশ বছরের মধ্যে একেবারে বদ্লাইয়া ফেলিয়াছি। সাপের হাঁই বেদেয় চিনিতে পারে—radio-activity ধরা পড়িলেন, তাড়িতশক্তি পরিমাপের সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্ম হিসাবী যন্ত্রের কাছে। এখন এই কথাটি মনে রাখিয়া গঙ্গোদক লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার মধ্যে radio-activity আছে কি না; যদি থাকে, তবে তাহাই তাহার বীজাণু ধ্বংস-শক্তির মূল কি না। পশ্চিমের সখের আড্ডায়, জল-মাটি লইয়া পরীক্ষা করিতে Sir J. J. Thomsonএর মত বৈজ্ঞানিকও লজ্জা পান না; আর আমরা গঙ্গাজল লইয়া পরীক্ষা করার প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপন করিলে সেটা বেজায় কুসংস্কার হইয়া গেল,—বাম্নাইর গোলামি হইয়া গেল, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের স্কন্ধে যে বিলাতী ভূত চাপিয়াছে, সেটা 'গঙ্গা' নামে ছাড়িয়া পলাইল না,—তাই অগত্যা খাস শ্বেতদ্বীপের বাথ ও ব্যাক্সটন নামক স্থানের তীর্থোদক ছড়াইয়া ইহাদের ভূতাপসরণের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। সে যাহাই হউক, অণুবীক্ষণ হার মানিলেই পরীক্ষা ছাড়িয়া দিতে হইবে এমন নহে; সূক্ষ্মতর যন্ত্র-সহায়তায় প্রকৃষ্টতর উপায়ে পরীক্ষা জুড়িয়া দিতে হইবে; radio active bodies সম্বন্ধে আজিকালি যেরূপ হইয়াছে। আবার, electric method পর্য্যন্ত যেখানে পরাভূত হইল, সেখানে আমরা পরীক্ষার চরম হইয়াছে বলিয়া ছাড়িয়া দিব কি? এইখানে বিজ্ঞানাগার হইতে বাহির হইয়া সিদ্ধাশ্রমের অভিমুখে যাত্রা করিব কি না, এটা আমাকে বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। সিদ্ধাশ্রম মানেই বুজরুকির আড্ডা, ইহা স্থির করিয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কারবার নাই; পক্ষান্তরে সিদ্ধাশ্রমমাত্রেই ব্রহ্মলোক—সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্ব-শক্তিমত্তার ভূমি—এইরূপ যাঁহারা ভাবিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গেও আমাদের কারবার নাই। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বলিয়া সত্য-সত্যই যদি একটা কিছু থাকে, তবে তাহার প্রামাণ্য কি, দৌড়ই বা কতদূর,—এটা আমাদের পরীক্ষা করিয়া হেস্তনেস্ত করিয়া লইতে হইবে। যেখানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলি হার মানিল, সেখানে সংযম অর্থাৎ ধারণা-ধ্যান-সমাধি তত্ত্বনির্ণয় করিবে? করে কি না ইহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। সিদ্ধাশ্রম এই পরীক্ষাটা না কি করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন; বিনা বিচারে তোমাকে সে দাবী গ্রাহ্য করিতে আমি পরামর্শ দিই না; কিন্তু বিনা বিচারে তাহাকে অগ্রাহ্যই বা করিবে কি ব্যবস্থার বলে? ফল কথা, বিজ্ঞানাগারের উপরে একটা সিদ্ধাশ্রম থাকিলেও থাকিতে পারে; বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষকে যাচাই করিয়া লইবার মত একটা প্রকৃষ্টতর অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব হইতে পারে; এ কথাটা গোলদীঘিতে দাঁড়াইয়া বলিলে আমার শ্রোতৃবৃন্দ সহিষ্ণু রহিতেন কি না বলিতে পারি না; কিন্তু এই তত্ত্ববিদ্যাসমিতির গৃহে, মঞ্চোপরি আরোহণ করিয়া, চারিধারে 'মহাত্মা'গণের আশ্বাস-দৃষ্টির নিম্নে এ কথা বলিতে আমি সঙ্কুচিত হইলাম না। শেষ পর্য্যন্ত দেখিলাম, বেদের বৈজ্ঞানিক আলোচনা নিতান্ত সহজ নয় ও নিরাপদ নয়; তবে স্কন্ধে নিতান্তই দুষ্ট সরস্বতী ভর না করিলে, এ আলোচনা চক্ষুতে জ্ঞানাঞ্জন লেপিয়াই দেয়,—ঠুলি বাঁধিয়া দেয় না বা ভেল্কি লাগাইয়া দেয় না; প্রাণে অভয়ই আনিয়া দেয়, সংশয় অবিশ্বাসে পীড়িত ও অবসন্ন করিয়া দেয় না। আমরা বেদের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে ভাবে সম্পর্ক পাতাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিলাম, সেই ভাবে না লইলে গোল পাকাইয়া আরও জমাট হইতে পারে। বেদপন্থীদের গোঁড়ামি আছে এবং তাহা ভয়ানক সন্দেহ নাই; কিন্তু বিজ্ঞান-নবিশদের গোঁড়ামি যে নাই, এমন নয় এবং সে গোঁড়ামি সাক্ষাৎ 'বুদ্ধিভ্রংশ'—যাহা হইলে, গীতা বলিতেছেন, 'প্রণশ্যতি'।

আধুনিক বিজ্ঞানের মহাতীর্থ পশ্চিমদেশ। সেখানকার তীর্থের পাণ্ডা মহাশয়েরা নিতান্ত মন্দ লোক ন'ন। তাঁহাদের নূতন দিক্ হইতে ভাবিবার-চিন্তিবার প্রবৃত্তি আছে; প্রয়োজন হইলে তৈয়ারি ধারণা-সংস্কারগুলিকে একেবারে ঢালিয়া সাজিবার সাহসও আছে। সে দেশে 'বেদ' নাম না দিয়া হউক, বস্তুতঃ মানবের প্রাচীন জ্ঞান-বিশ্বাসগুলির

(তা ভূত-প্রেত সম্বন্ধেই হউক আর অধ্যাত্মশক্তি সম্বন্ধেই হউক) একটা সত্যকার পরীক্ষার বেশ মরসুম জমিয়া গিয়াছে। কিন্তু পাণ্ডা মহাশয়দের এদেশী 'ছড়িদার'-পুঙ্গবগণকে আমরা আঁটিয়া উঠিতে পারিব কি? ইঁহারা বিজ্ঞানের পক্ষে কোমর বাঁধিয়া কতকটা বাজে গোল পাকাইয়া থাকেন; এ গোল থামাইয়া দিবার জন্য তাঁহাদের বিজ্ঞান-দুর্য্যোধনের উরুটা দেখাইয়া না দিলে আমাদের চলিবে না। ম্যাক্ পোঁয়াকারে প্রভৃতি যাঁহাদের নাম পূর্ব্বেই করিয়াছি, তাঁহারা উরুর ভঙ্গুরতার সংবাদ খুবই রাখেন এবং সাবধানে কথাবার্ত্তা কহেন। নিউটনের মানসপুত্র যে Dynamical science, তাহার উরু ইতিমধ্যে আইনষ্টাইন প্রভৃতির গদাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিউটনের হয় ত এত বড় মনীষা ছিল যে আইনষ্টাইন্‌কে সাম্‌না-সাম্‌নি পাইলে তাঁহার সকল পাণ্ডিত্যাভিমান তিনি অবলীলাক্রমে চূর্ণ করিয়া দিতে পারিতেন। এ রহস্যটা আগামীবারে একটু খোলসা করিয়া বলিতে হইবে।

শেষ কথা, চাই ফিরিয়া উপনিষদের সেই দিন, যখন পরীক্ষা দ্বারা তত্ত্ব সাক্ষাৎকার না করিলে কেহ নিজেকে চরিতার্থ মনে করিত না। পরীক্ষক বিজ্ঞানাগারে যতটা চলিতে পারে চলুক, সিদ্ধাশ্রমে গিয়া যতটা পরিসমাপ্ত হইতে পারে তাহাও হউক। আমাদের মধ্যে জ্ঞানবিশিষ্ট, বিশ্বাস অকুতোভয় এবং সাধনা একনিষ্ঠ ও সুস্থির করিবার জন্য প্রাচীন বেদের সঙ্গে নবীন বেদের বা বিজ্ঞানের একটা বোঝাপড়া করার প্রয়োজন খুবই হইয়াছে। এ বোঝাপড়াটা না হইলে পুরাতনেও আমাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকিবে না, নূতনেও অনুরাগ ও অধ্যবসায় হইবে না। পরীক্ষার মত পরীক্ষা হইলে—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

"কব্ মুঝু ডাকল ?"

[শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্-এ]

(১)

কব্ মুঝু ডাকল রাধা ?—
মেরি সাধয়ি তোঁহারি নাম,—ভণয়ি, জপয়ি কত,
কো-ও-টী জীবন ভেল ভোরা;
"রা-আ-ধা, রা-আধা" ডাকি,—
'আধ' নাহি মি-ই-লয়ি;
'কা-আ-লিম' ভেল তনু ঘোরা;
মেরি জনম-মরণ-ভর রাধিকা সাধা;
তবহুঁ না আজু হাম্ পেখনু রাধা!

(২)

মেরে লাগি কাঁদল রাধা ?—
হাম্ রা-আ-ধা লাগয়ি রোয়ি,—লা-আ-খ লা-আখ যুগ,
জা-আ-গত নিদে হেরি তোঁহে;
রাধিকা-প্রণয়-ডোরে,—আজহুঁ বাঁধয়ি রয়ি,
হে-এ-রয়ি দিবানিশি গেহে;
হাম্ তবহুঁ না বু-উ-ঝনু আদি সমাধা।
—জনম-মরণ-ভর পেখয়ি রাধা!

(৩)

আজহুঁ না চিননু রাধা!
মেরি আঁ-আঁখ যুগল জুরি,—রা-আ-ধিকা দিঠি আলা,
প্রা-আণ বহন-বায় সেহি,—
নিখিল-ভুবন ভর,— করুণা-দরিয়া-ধারা,
'অমর' করত 'মরে' তোঁহি!
হাম্ কৈছনে আজু-অব জানব রাধা?
—আর-ত লাখ-যুগ না-করয়ি সাধা!

(৪)

তব্-তো মু' চি-নব রাধা,—
যব্ কো-ও-টী জনম্ আরু,— গোকুল-কুল-তটে
বাঁশরী ফুকারি গল-রোধা;
আঁখ-যুগল-আলা, জীবন-বহন-বারে
ডারয়ি দিব ঋণ শোধা;—
যব্ সুরয কিরণ ডারি ভৈ যাবে আঁধা;
—তবহুঁ নয়ন-ভর পেখব রাধা!

মা

[অনুরূপা দেবী]

(৩৮)

ভাইফোঁটার পর বাড়ী ঘরের একরকম বিলি-বন্দোবস্ত সারিয়া অরবিন্দ ও ব্রজরাণী আর একচোট বেড়াইতে বাহির হইল। বেলা মেয়েটী দেখিতে মন্দ নয়,—রংটাও তাহার একটু ফরসা,—সেইটিকেই সে এবারে চাহিয়া লইল। পরের ছেলে আর কখন লইবে না প্রতিজ্ঞা থাকিলেও, সে সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিল না। একটা কাহাকেও অবলম্বন না পাইলে যে থাকিতে পারে না!

কাশী আসিতেই এবার গোধূলিয়ার কাছাকাছি বড় রাস্তার উপরেই বেশ একখানা ভাল বাড়ী জুটিয়া গেল। ঠিক তাহার সাম্‌নাসাম্‌নি আর একখানা প্রায় তত বড়ই বাড়ী। সেখানে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তক্ষণই লোকের ভিড় লাগিয়া থাকে। প্রথমে উকিলের, তৎপরে দ্বিপ্রহরেও জনসমাগম দেখিয়া, ডাক্তারের আন্দাজ করিয়া, শেষকালে দিন দুতিন পরে খবর লইয়া ব্রজরাণী জানিতে পারিল যে, উহা কোন্ একজন পণ্ডিতের। উক্ত পণ্ডিতটি বুঝি জ্যোতিষী।

আবার দু'চারদিন গত হইলে, একদিন খবর পাওয়া গেল, ঐ জ্যোতিষী লোকটির নিজের জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বড়-একটা অধিকার নাই,—অল্পসল্প একটুখানি অক্ষর পরিচয় আছে মাত্র। ইনি যে শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাহার নাম ভৃগু-সংহিতা। কোন্ সে পুরাকালে,—যে যুগে মানুষ নিজের বিদ্যার পরিচয় নিজেই জাহির করিয়া বেড়ানর পরিবর্ত্তে, তাহা চির-রহস্য-যবনিকার তলদেশে সযত্নে লুক্কায়িত রাখিতে চাহিয়া,—যাঁহা হইতে উত্তরাধিকারিত্বে বুদ্ধি, বিদ্যা, বিবেক সমস্তই ধারাবাহিক ভাবে পাইয়া আসিয়াছেন,—সেই গোত্রপতি, বংশপতি ঋষি নামেই নিজের পরিচয়কে মিলাইয়া দিতেন, সেই যুগেরই কোন 'ভার্গব' এই শাস্ত্রের প্রণেতা। জ্যোতিষ এবং ত্রিকালজ্ঞের দিব্যদৃষ্টি—এই দুইয়ে মিলাইয়া ভৃগু-সংহিতার এই 'কুণ্ডল্যাধ্যায়' বিরচিত। সম্পূর্ণ শাস্ত্র পাওয়া যায় নাই। ভারতের অধিকাংশ রত্ন-সম্ভারের মতই উহাও বৈদেশিক শাসন যন্ত্রের তলে দলিত হইয়া গিয়াছে। হিন্দু-শাস্ত্রকে শ্রদ্ধা দিয়া জীয়াইয়া রাখিবার লোকের দৈন্য সেই সুদূর অতীত বৌদ্ধযুগ হইতেই যে আরম্ভ হইয়াছিল। এই লুপ্ত রত্নোদ্ধার হইয়াছে নেপাল রাজ্য হইতে। অল্প দিনের কথা,—বিগত মিউটিনির সময় এই প্রদেশেরই এক ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষীয় অত্যাচারের ভয়ে দেশত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান,—ভৃগু-সংহিতা তাঁহারই সম্পত্তি ছিল। পলায়ন কালে কিছু খোয়া গিয়াছে, বাকি যাহা ছিল, পুত্র ও জামাতাকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইনি সেই জামাতা, ইহার অংশে শুনা যায় না কি,—চারি লক্ষ কুণ্ডলী আছে। নিজের গৃহে রক্ষিত জন্ম-পত্রিকা হইতে রাশিচক্রটি ছকিয়া লইয়া গিয়া উঁহাকে দিলে, প্রত্যেক লগ্নচক্রের সূচীপত্র মিলাইয়া ঠিক উহারই প্রতিরূপ আর একটী রাশিচক্র সেই বহু পুরাতন অতীত যুগের লক্ষ লক্ষ কুণ্ডলীর মধ্য হইতে পাওয়া যাইবে। তাহারই সহিত সুললিত শ্লোকচ্ছন্দে সেই ভাগ্যচক্রের অধিকারীর ভাগ্যফল-লিখিত পূর্ণ কুণ্ডলীও পাওয়া যায়। অতীতের কথা ইহাতে সংক্ষিপ্ত। মাত্র বিশেষ-বিশেষ ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকুই প্রদত্ত থাকে; নতুবা নিশানা হইবে কেমন করিয়া? বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎই ইহার লক্ষ্য। মানব-জীবনের ভাল-মন্দ, ঘাত-প্রতিঘাতের প্রত্যেক সমাচারটুকু, কোন্ স্থলে কোন্ গ্রহের অবস্থানজনিত কি ফল, কোন্ দুঃখই বা অপ্রতিবিধেয়, কিসেরই বা প্রতিবিধান সম্ভব, সে প্রতিকার কি? এ সকল কথাই শরণাগতের জন্য ঋষিদ্বয়,—ভৃগু শুক্র পরস্পর কথোপকথনচ্ছলে জানাইয়া দিতেছেন। অতীত জীবনের কোন মহা ভ্রান্তি ইহ-জীবনের এই সমাগত অশান্তিকে বরণ করিয়া আনিয়াছে, কি উপায়েই বা সহজে লঘুচিত্ত মানব জীবনের সেই ভুল-ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত সমাধা হইয়া অতীত পাপের ক্ষালন

হইতে পারে, এইটিকেও ইঁহারা কৃপা-কটাক্ষ করিতে ভুলিয়া যান নাই। পরিশেষে এই জীবনান্তে কোন্ গতি লাভ হইবে, তাহারও আভাষ দিয়াছেন। আরও একটা কথা,—ভৃগুঋষি জন্মান্তরের মহাপাতক বলিয়া যে পাপের উল্লেখ করিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, সে পাপ পূর্ব্ব জন্মের কি না জানি না, কতকটা এজন্মের তো বটে।

ব্রজরাণী পথে-ঘাটে ভবঘুরে গণৎকারদের হাত দেখাইয়া অনেক পয়সা খরচ করিয়াছে,—কিন্তু ভাল জ্যোতিষীর খবর এ পর্য্যন্ত পায় নাই। একবার কলিকাতাতেই একজন নামজাদা ভাগ্য-ব্যবসায়ীর শুভাগমন হইয়াছিল। সাহেবী ধরণে ঘড়ী ধরিয়া তিনি ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন। হাত দেখিয়া ব্রজরাণীকে তিনি তাহার বন্ধ্যাত্ব-মোচনার্থ কবচ প্রদান করেন। পাঁচ সাত শত টাকা তাহারই যাগ-যজ্ঞে খরচ হয়। কিন্তু ফল? যেমন সাত্বিক ধর্ম্ম, ফলও তো তারই অনুরূপ হইবে। এবার এই অভিনব ব্যাপারের সন্ধান পাইয়া পরম পুলকিত হইয়া ব্রজরাণী পত্র লিখিয়া মায়ের নিকট হইতে কোষ্ঠি আনাইল; এবং অরবিন্দকেও তাহার খানার জন্ম ধরিয়া পড়িল। অরবিন্দ প্রথমে উপেক্ষায় কাটাইয়া, শেষে নাছোড়বান্দা দেখিয়া কহিল,—"কেন ও-সবের মধ্যে যাচ্চো!—কি বলতে কি বলবে,—শেষে কেঁদে-কেটে খুন হবে। না হয় তো শাস্ত্রটার উপরেই শ্রদ্ধা হারাবে;—কাজ কি!"

ব্রজরাণী কহিল, "আমি শ্রদ্ধা হারালে আমিই হারাবো,—শাস্ত্র তো আর তাতে খোঁড়া হয়ে যাবে না। তুমি লিখে দাও।"

"মুখের উপর কি লিখে দেবে, তার কি কিছু ঠিক আছে?"

ব্রজরাণী অপ্রসন্ন ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "কি-ই বা আর এমন বল্‌বেন?"

অরবিন্দ রহস্য করিয়া বলিল, "ভৃগু ঋষি তো আর অরবিন্দ বোস ন'ন। শ্রীমতী ব্রজরাণীকে তাঁর ভয় কিসের? যদি কিছু বল্‌বার থাকে, না বলবেনই বা কেন?"

ব্রজরাণী ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমান-ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, "যদি কিছু বল্‌বার থাকে, বলবেন। সেটা শোন্‌বার সৎসাহস আমার আছে। তাই যদি না সইতে পারবো, তা'হলে ওঁর দোরে যাচ্চিই বা কেন? সংসারে যারা মন রেখে কথা কয়, সে রকম লোকের তো 'আকাল' পড়ে নি।"

অরবিন্দ একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া বলিয়া গেল, "তবে তুমিই উচিত কথা শুনে নাও। আমার ঢের শোনা হয়ে গিয়েছে।"

প্রথমে সংক্ষেপে শুনিয়া, নিজের কি না যাচাই করিতে হয়। তাহাই লিখিয়া আনা হইল। তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ,—"উচ্চ-কুলোদ্ভব কায়স্থ-কন্যা, পিতা ধনী, স্বামী মহাধনী। পিতা মৃত, মাতা ও তিন ভ্রাতা বর্ত্তমান। এক ভ্রাতা কৃতী। শ্বশুর-শ্বশ্রূ মৃত। পুত্রহীনা। স্বামী বিদ্বান্, সচ্চরিত্র; কিন্তু তথাপি ইনি একাকী পতিপ্রিয়া নহেন। স্বামীর পুত্র বিদ্যমান। জন্মান্তরের মহাপাপের ফলে ইনি নিজে পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত। প্রতিকার? আছে; কিন্তু প্রায় অপ্রতিবিধেয়। কি পাপ? নকল নহিলে জানা যাইবে না। নকলের জন্য বলা হইল।"

জীবন-রহস্যের এই ইঙ্গিতটুকু ব্রজরাণী বারবার করিয়া পাঠ করিল। যতবারই পড়িল, ততবারই ভিতরটা তাহার লজ্জায়, ভয়ে চমক খাইয়া খাইয়া উঠিল। অভিমান, অপমানের উষ্ণতাও মনের মধ্যে দেখা না দিল যে, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। 'একক পতিপ্রিয়া নহেন!' সে তো ব্রজরাণী সেই বিবাহের দিন হইতেই জানে। এ আর নূতন কথা কি তিনি জানাইয়াছেন? মনোরমা সুন্দরীই যে পতির ধ্যানের কেন্দ্র, প্রেমের উৎস, উহাঁকে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দিয়াই যে স্বামী তাহার আজ হৃত-সর্ব্বস্ব। সেই রিক্ত অন্তরের বিরাট শূন্যতার ফাঁকটা দিয়া আজ এই দীর্ঘকালেও যে হতভাগী ব্রজরাণী তাঁহার কাছেও পৌছিতে পারে নাই, সে কি বুঝিতে কিছু বাকী থাকে? এই দুঃখটাই যে নারী-জীবনের চরম দুঃখ, সে না কি সেই সহৃদয় ঋষি-বুদ্ধির অগোচর? স্বামী যে বাহিরে উহাঁর সম্বন্ধে অত বড় নির্লিপ্ত, ইহাতে জগৎ ভোলে ভুলুক, রাণীও কখনও ভুলে নাই, আর যাঁদের চোখে ধুলা দেওয়া যায় না, তাঁরাও ভুল করেন না।

কিন্তু এ লইয়া নালিশ-মোকর্দ্দমা চলে না। অপ্রিয়-সত্য সহ্য করিবার সাহস দেখাইয়া এ অশান্তি নিজেই সে কিনিয়াছে। নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল,

যে, এতদিনে ত যখন উঁহার প্রিয়তমকে উনি পূজা করিতে ছাড়িলেন না, তখন আমি কাঁদিতে বসিলেই কি আর উঁহার মন্ত্র-বিস্মৃতি ঘটিবে? তার পর সহসা কৌতূহলী হইয়া উঠিয়া এই কথা মনে-মনে ভাবিতে লাগিল, 'আচ্ছা, সত্যিই যদি উনি তাকেই অত ভালই বাসেন, তা'হলে এতটা কাল ধরে কি করে এমন নিঃসম্পর্ক হয়ে রয়েছেন? যাকে ভালবাসবো, দুঃখে তাকে ডুবিয়ে রাখবো,—এ আবার কেমন ধারা ভালবাসা রে বাপু? দণ্ডবৎ করি অমন ভালবাসার পায়ে। বিধাতাকে আমায় পতির প্রিয়া না করে অপ্রিয়া করেছেন, যে রক্ষে করেছেন!"

(৩৯)

এত সাধের ভৃগু-সংহিতা,—এ সংহিতা পাঠ করিতে-করিতে ব্রজরাণী স্তম্ভিত হইয়া রহিল,—লজ্জায় মাটিতে মিশিতে চাহিল। শত-শত অতীত বর্ষের কীটদষ্ট, পুরাতন জীর্ণ পুঁথির পাতায় এই যে এক মানব-জীবনের ফলাফল,—কোন্ সে অজ্ঞাত লেখক লিখিয়া গিয়াছেন,—বহু শতাব্দী অন্তে, এই বর্ত্তমান যুগের এই বঙ্গদেশীয়া ব্রজরাণীর জীবন-কথার সহিত কেমন করিয়া এ সম্মিলন সাধন করিল? এ কি শুধু জ্যোতিষ গণনা? অথবা, ত্রিকালজ্ঞের ত্রিলোক-বিজ্ঞাত জ্ঞাননেত্রে উদ্ভাসিত ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের, ইহ-পর সমস্ত লোকের চির যুগ এবং এবং যুগান্তরের গর্ভমায়া সমুদায় মানব ও মানবীর জীবন-রহস্য আলেখ্য লেখনের ন্যায় চিত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন! স্থূল প্রত্যক্ষ দর্শনেও এ শাস্ত্রের অপূর্ব্বত্ব যে অস্বীকার করিবার নহে! যদি শুদ্ধ মাত্র জ্যোতিষ-বিদ্যারই এ ফল হয়, তবে যাঁদের হস্তে গণনা-বিদ্যার এত বড় উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাঁদের শক্তিকে প্রণিপাত! ইহার আরম্ভ ভৃগু শুক্রের কথোপকথনচ্ছলে। পূর্ব্বজন্মে ইঁহারা রাজা-রাণী ছিলেন। সপত্নী সন্তানের প্রতি অন্যায়াচরণের ফলে এজন্মে ইঁহার মহাবন্ধ্যাত্ব-প্রাপ্তি! কৃচ্ছ্রসাধ্য পূজাজপাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা সন্তান লাভ ঘটিলেও, তাহার জীবিত থাকা কোন মতেই সম্ভব নয়। এমন কি পোষ্য সন্তানের পর্য্যন্ত ইঁহার সংস্পর্শে আয়ুক্ষয় সম্ভাবনা।

ব্রজরাণীর শিথিল মুষ্টি হইতে বিচ্যুত হইয়া ধর্ম্মাধিকরণের মহা-বিচারকের বিচারের রায় লেখা দণ্ডপত্রখানা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। নিজে সে যেন কোন্ সুদূর জন্মজন্মান্তরের পরপার হইতে ভাসিয়া-আসা কোন্ সে এক অজ্ঞাত জীবনের বিস্মৃতির অতল তলে তলায়িত অতীতের অন্ধকারের নিবিড়-তায় ডুবিয়া যেন তাহারই তলায় তলাইয়া যাইতে লাগিল। কবেকার সে যুগ? ইতিহাসের কোন্ অঙ্কে তাহার স্থান? কোথাকার সে এক ক্ষুদ্র রাজ্য, অথবা বৃহৎ সাম্রাজ্য? গত জীবনে কোন্ প্রদেশে তাহার জন্ম হইয়াছিল? যে মহারাষ্ট্রীয় মেয়েদের নিজস্ব পুত্রী-পরিচ্ছদ সুন্দর স্বাধীন ভাব ও নির্ব্বিকার শান্ত মুখের দিকে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যায়, দেশের গৌরব বলিয়া মনে গর্ব্ব আসে, যে সব উৎকল নারীর হরিদ্রারঞ্জিত বদন ও নির্লজ্জ কাপড় পরা, পথের মধ্যে চোখে পড়িলে লজ্জায় শরীর কুঞ্চিত হইয়া যায়, 'তর্কি ঝুম্মকওয়ালি, পাটিসাঁটা, টিকলি আঁটা' বেহার প্রদেশীয়া অথবা দোষে-গুণে, পরানুকরণে নিজের নিজস্ব পর্য্যন্ত বর্জ্জনোন্মুখী বঙ্গ-বধূই সে আগের জন্মেও ছিল? কি ছিল? কোথায় ছিল? হিন্দু না মুসলমান, পার্শী, জৈনী, শিখ অথবা খৃষ্টীয়ান? কোন্ জাতি, কোন্ গোত্র, কোন্ ধর্ম্মী, কোথায় বাস? তার পর আবার সে ভাবিতে লাগিল, 'আচ্ছা সে জীবনেও কি ইনিই সেই রাজা ছিলেন? আমরা কি সে দিনেও এম্নি দুই সতীন ছিলাম না কি? সে বারে নিশ্চয়ই আমি দো-রাণী ছিলাম? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই! তা' না হইলে এজন্মেও উনি আমাকেই ভালবাসিতেন। তবে জন্মান্তরে বোধ করি সো-রাণী মনোরমা আমায় স্বামী ও স্বামীর ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেই সর্ব্বস্ব ভোগ করিয়াছিল,—তাই এ জন্মে আমাকেই তার সর্ব্বনাশের হেতু হইতে হইয়াছে। 'দো' হইলেও ঢেঁকিশালের মহলটা দখল করিতে হয় নাই বটে, কিন্তু মহারাজের মনটা? সেটা আর আমি কেমন করিয়া পাইব? দেখ, এই জন্যই কথায় বলে যে, 'স্বভাব যায় না মলে!' যে যার প্রিয় থাকে, তা সে একজন্ম পরেও থাকে। আচ্ছা, তবে যে 'পরপুত্র'-পীড়নের পাপটা ভৃগুমুনি আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন, তা আমি যদি দুর্দ্দশাপন্ন 'দো' রাণীই ছিলুম, তো সতীনের ছেলের পীড়ন কেমন করে আমি করতে গেলুম শুনি? হিংসে,—তা হয় ত মনে-মনে করে থাকতে পারি। এ-জন্মেও তো অনেক সময়—দূর হোক গে, এ-জন্মের কথা আবার এর ভিতর টেনেটুনে আনি কেন? এ-জন্মে এমন কিছু মহাপাতক আমি করি নি, যার জন্যে নিজের ছেলে দূরের কথা,—

পরের ছেলেকেও আমার ছোঁয়াচে মরে যেতে হয়। আমার জন্মান্তরের পাপের ভোগ রয়েছে বলেই হয় ত আমাকেই এরা জোর করে এদের এই অশান্তির মধ্যে টেনে এনেছে। সে অপরাধ তো আর আমার নয়। আমি তো আর স্বয়ম্বর-সভায় দাঁড়িয়ে আমার জন্মান্তরের রাজার গলায় জোর করে স্বয়ম্বরের মালা পরিয়ে দিই নি।

"উঃ জন্মান্তর ধরে এই সতীনের জ্বালা! আবার আসছে জন্মেও এম্‌নি তাল ঠোকাঠুকি চলবে না কি? ভয় করে যে! আমি তা হোলে এবার মরে ভূতই হবো, মানুষ না হয় আর হবো না। ভৃগু ঋষি এত বল্‌তে পারেন, আর কি করলে মেয়েমানুষ জন্মটা ঘুচে গিয়ে আসছে জন্মে পুরুষ হ'য়ে জন্মাতে পারা যায়, এই কথাটাই কি বল্‌তে পারেন না? আমি তা হলে ভাল করে জেনে নিতুম যে!"

(৪০)

অজিত যে-দিন বাল্য-চপলতার বশে চারিদিকের কাণা-ঘুষা হইতে জাত সন্দেহটাকে ঠাকুরমার মুখ হইতে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া লইবার বড় আশাতেই তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া ছাদে তুলিয়াছিল, সে-দিন তাহার কাঁচা সোণার মত কচি প্রাণে এতটুকু সন্দেহ থাকিলে হয় ত সেই মিথ্যা ও সত্যকে সে মাটি-খোঁড়া করিয়া বাহির করিতে যাইত না। কিন্তু জ্ঞাতে হোক, অজ্ঞাতে হোক,—অজগরের ঘাড়ে পা পড়িয়াছে, আর কি রক্ষা থাকে? সাপের বিষ-দাঁতের চিহ্ন শোণিতের ঝলকে নির্ম্মল হইয়া উঠিতে ছাড়িবে কেন?

সে প্রথমে খানিকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। তার পর হঠাৎ,—ছাদের যে দিক্‌টায় দিনের আলো চলিয়া গিয়াছে,—অথচ জ্যোৎস্নার আলো তখনও নামিতে সময় পায় নাই বলিয়া অন্ধকার ছায়া করিয়া আছে,- সেইদিকে চলিয়া গেল। উঁচু আলিসার একটা কোণ ঘেঁসিয়া একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ নীচের দিক্‌ হইতে উঠিয়া আসিয়া আকাশের দিকে মাথা তুলিয়াছে, তাহারই উপর সে উপুড় হইয়া পড়িল। তার পর অনেকক্ষণ তাহার কোন সাড়া-শব্দই রহিল না। নিজের কোন কথাই তাহার মনে তখন স্থান পাইতেছিল না। শুধু এইটুকুই মনে রহিল যে, সে যেন কেমন করিয়া আজ তাহার পায়ের হারাইয়া ফেলিয়াছে! সমস্ত বুক জুড়িয়া অত্যন্ত কঠিন একটা বেদনা সমুদায় প্রাণটাকে মোচড় দিতে লাগিল। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই সে যেন তাহার ভিতর-বাহিরের সমস্ত চেতনাটাকেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অসাড়তার একটা সূক্ষ্ম আবরণ তাহার উপর চাপা পড়িয়া যেন তাহার চোখের দৃষ্টি, কাণের শোনা এবং ত্বকের স্পর্শ পর্য্যন্ত কিছুক্ষণের জন্ত তাহার অনুভূতির অতীত করিয়া দিল। তার পর যখন সে আচ্ছন্ন-ভাবটা দূর হইল, তখনও তাহার মনে হইল, ক্লান্তি একটা ভারের মত তাঁহার সমস্ত শরীরটাকে চাপিয়া ধরিয়া আছে। মাথার উপরে তখন সাদা মেঘের পুঞ্জ খণ্ড-খণ্ড হইয়া দূরে-দূরে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। হাপরে-পোড়া সোণার মলিন পাতের মত দীপ্তিহীন চাঁদের উপরে যেন স্বর্ণকারের হাতের চক্‌চকে শাণ পালিস পড়িয়া তাহাকে নূতন-তৈরী গহনার মত উজ্জ্বল দেখাইতেছে। চাঁদকে বেড়িয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা চন্দ্রমণ্ডল পড়িয়াছে, রামধনুর মত সেটার বর্ণচ্ছটা চাঁদের ঔজ্জ্বল্যের আশে-পাশে ঠিক যেন পালিস-পাতের 'ব্রেস্‌লেটের' গায়ে চুণি পান্না-বসানর মত মনে হইতেছে। আকাশের গায়ে শতাবলী হারের মত স্তবকে-স্তবকে নক্ষত্রমালা ঝুলিয়া আছে। ছাদের মাটির উপরে সেইদিকে চাহিয়া অজিত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দূরের-অদূরের মন্দিরের মঙ্গল-আরতির বাদ্যধ্বনি পৃথিবীর বুক চিরিয়া-চিরিয়া একটা কাতর কান্নার মত যেন সেই চন্দ্র নক্ষত্রে বিভাসিত আকাশের বুকের দিকেই ঠেলিয়া-ঠেলিয়া উঠিয়া আসিতে লাগিল।

পড়া-শোনায় অজিতের অখণ্ড মনোযোগ। এই ক্ষুদ্র পণ্ডিতটি এ-পাড়ার ছোট-বড় সকলের আদরে-আদরেই আজ এত-বড়টি হইয়া উঠিলেও, এখন বিদ্যার খাতিরে সে সবার কাছেই সম্ভ্রমের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। পাড়ার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণও ক্ষুদ্র শিশুর এত অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ ও অবাক্‌ হইয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসেন যে, এই বয়সে এত বিদ্যা হইলে, বাঁচিবে সে কোন্‌ অবিদ্যার জোরে? সেই অজিত এবার বাড়ী ফিরিয়া অবধি আসন্ন পরীক্ষার কথা যেন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কোলের উপর বই রাখিয়া সে জানালার বাহিরে কোথায় কোন্‌ অনির্দ্দেশ্যের অভিমুখে চাহিয়া থাকে। তাই বলিয়াই কি সে সেই শেওলা-ধরা, পাড়-ধসা, আধমজা পুকুরে কলমীদলের মধ্যে পানকৌড়ির ডোবা-ওঠা,

অথবা কলমী-শাকের বুকের মাঝখানে ডাঁটা তুলিয়া একটা যে ঐ রক্ত-কহ্লার পুষ্প সবুজ শাড়ীর আধ-ঘোমটা দেওয়া পল্লীবধূর নোলক-চুম্বিত রাঙ্গা ঠোঁটের একটী ফোঁটা সরস হাসির মত দুলিয়া উঠিয়াছে, উহারই নাচন-কোঁদন এ সব কিছু দেখিতে পায়? কিছু না। জানালার ফাঁকে ঐ যে শীতকালের ফ্যাকাসে আকাশের খানিকটা দেখা যাইতেছে, এই বালকটির মনের মাঝখানে যে আকাশটা আছে, সেটাও ঠিক এমনধারাই শূন্য এবং বিরসতার ধূসর রংয়ে এই রকমই রঞ্জিত। তা এমন মনের ফাঁকে যেখানে আপনার গরজের উপরেই ফাঁকি চলিতেছিল, সেখানে চোখের তারা দু'টা যে ফাঁকা-মাত্রই দেখিবে, সে আর বিচিত্র কি? এম্‌নি ব্যথা-জড়, নিরুদ্যম চিত্ত লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া জীবনের সব-চেয়ে অমূল্য সুযোগকে সে প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিল।

সেদিন জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে স্কুলের ছুটী ছিল। বাড়ী মেরামতের পর অন্দর-বাহিরের মধ্যস্থ এই ঘরটা অজিতের পড়িবার ঘর হইয়াছিল। মনোরমা ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তক্তাপোষের উপর বই ছড়াইয়া এবং তাহারই মধ্যে দুই পা ছড়াইয়া দিয়া অজিত বসিয়া জানুর উপর 'হিষ্ট্রী-অব্‌ ইংল্যাণ্ড'-খানা খুলিয়া রাখিয়া অন্যমনে একদিকে চাহিয়া আছে।

মনোরমা ডাকিল, "অজিত!"

অজিত প্রথমটা একটু চম্‌কাইয়া উঠিয়াছিল। তার পর যেন নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া, ইতিহাসের নোট লেখা খাতা ও পেন্‌সিল টানিয়া লইল; এবং পরিত্যক্ত বই-খানা পড়িবার উপক্রম করিয়া, মুখ তুলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিল। সেই মুখ আর হাসি দেখিয়া মনোরমার বুকের ভিতরের রক্তটা ছলাৎ করিয়া উঠিল। কি বিবর্ণ ও শুষ্ক সে মুখ! আর কত করুণ সেই হাসিটুকু! সে হাসি যেন শুকতারার মত উজ্জ্বল, আবার শিশিরের মতই নির্ম্মল। সে হাসিতে মনোর চোখে বিশ্বের আলো ফুটিয়া উঠিত, ঝঙ্কারে পাখীর কলকাকলী, বীণার সুর, কর্ণের তারে-তারে ঝঙ্কার দিত। শুধু এই হাসির আলোটুকুতেই যে সে তাহার প্রাণের অন্ধকারকে বহুদূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। সে চাঁদ যদি রাহুগ্রাসে আজ পতিত হয়, তবে এই হতভাগিনী মা বাঁচে কি দেখিয়া?

ছেলের কাছে তক্তাপোষের একধারে বসিয়া-পড়িয়া মনোরমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "কাশীর চিঠিপত্র কিছু এলো রে?" অজিত কথা না কহিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, আসে নাই। কিছু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া মা কহিল, "তোর ঠাকুর-মায়ের অসুখ দেখে এলেম, তার পর চিঠিতেও অসুখ বাড়ার খবর পাওয়া গেল; আর তো কোন খবরই নেই। কেমন আছেন, কে জানে!" অজিত কিছুই না বলিয়া ইতিহাসের বইখানা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া পড়ায় মন দিল। কিন্তু তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখা না গেলেও, মনোরমার সন্দেহ হইল, তাহার সব মুখখানাই রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, এবং চোখ দুইটা জলে ছল-ছল করিতেছে।

তখন মনোরমার হঠাৎ মনে হইল, হয় ত ঠাকুরমার অসুখের খবর অজিতের এই চলচ্চিত্ততার কারণ। ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ভালই আছেন হয় ত। তুইতো তাঁর চিঠিখানার জবাব দিয়েছিলি?" অজিত জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিল; তার পর ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—"না।" নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া মনোরমা কহিল, "সে কি রে, ঠাকুরমার চিঠির জবাব দিস্‌নি! ভুলে গিয়েছিলি বুঝি? তা' কাল একখানা মনে ক'রে লিখে দিস্‌।"

অজিতের নিকট হইতে বাক্যে বা ইঙ্গিতে কোনই উত্তর না পাইয়া, মনোরমা অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া, অজিতের মুখপানে চাহিয়া দেখিল, সে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া স্থির, নিশ্চল দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া আছে। অগ্রাণের এই শীতের হাওয়ায়ও তাহার কপালে বড়-বড় ঘামের ফোঁটা জমিয়া উঠিয়াছে।

এইটুকু ছেলের পক্ষে এতবড় অসম্ভব আত্মদমনের প্রয়াস মনোরমার বিস্ময়কে যেন কতকটা বেদনায় ও কতকটা বিরক্তির দিকে টানিয়া আনিল। সে তখন কাছে আসিয়া, নিজের আঁচল দিয়া কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতে-দিতে একটুখানি অপ্রসন্ন স্বরে বলিয়া ফেলিল, "চব্বিশ ঘণ্টাই যে অমন ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকিস্‌, তোর হয়েছে কি অজিত? পড়াশোনা পর্য্যন্ত ত ছেড়ে দিচ্ছিস্‌ দেখ্‌তে পাচ্ছি!"

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের গায়ে এতটুকু বাতাসের ঝাপ্টা লাগি

লেই যেমন বৃষ্টি আসে, তেমনি মায়ের কথায় অজিতের চোখ দিয়া নিঃশব্দে বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অশ্রুগোপন-চেষ্টায় আবার সে নোট-লেখা এক্সারসাইজ বুকখানা মুখের কাছে খুব উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া, তাহারই আড়ালে মুখ লুকাইল। কিন্তু চোকের জল যে থামাইতে পারে নাই, বইয়ের আড়াল হইতে যে বড়বড় জলের ফোঁটা বুকের উপর ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল, সাক্ষ্য দিতে লাগিল। শিলাবৃষ্টির শিলার মতই তাহা মনোরমার হৃদ্‌পিণ্ডে একটা করিয়া ঘা দিয়া-দিয়া পড়িতেছিল।

"অজিত!—অজিত, এই বয়সে এমন মনগুমোটে ছেলে তুই কেমন করে হলি বল দেখি? যদি কিছু দুঃখ-কষ্ট মনের মধ্যে হয়েই থাকে, সে কথা খুলে বল্লেও তো হয়।"

এবার বইখানা নামাইয়া ফেলিয়া অজিত একবার উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিয়াই, তৎক্ষণাৎ আবার প্রাণপণ বলে সে আবেগ নিরোধের চেষ্টা করিতে-করিতে করতলের উল্টা পিঠে চোক ঢাকা দিল। চেষ্টাটা চোখের জল মুছিবার জন্যই বোধ করি করা হইল, কিন্তু—

মনোরমা আঁচল দিয়া নিজের অবাধ্য চোখ দুইটাকে মুছিয়া লইল। তার পর ছেলের চোখের উপর হইতে হাতের আবরণ খসাইয়া দিয়া, তাহাকে বরাবরের মতই বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল।

"অজি, মাণিক আমার, চুপ কর!" মায়ের বুকে কিছুক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া-শেষকালে ছেলে চুপ করিল বটে, কিন্তু আভ্যন্তরিক কান্নার রুদ্ধ উৎস তখনও মধ্যে-মধ্যে তাহার শরীরটাকে গভীররূপে কুঞ্চিত করিয়া তুলিতে ছাড়িল না।

"ঠাকুমার জন্যে মন কেমন করে?"

ক্ষণকালমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া, যেন আত্ম-পরীক্ষা করিয়া লইয়াই সে সবেগে মাথা নাড়িল,—না। "কাশী যেতে ইচ্ছে হয় না? ঠাকুমা বলেছেন আবার গ্রীষ্মের ছুটীতে আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন।"

ছোট ছেলে ভূতের ভয়ে যেমন করিয়া মাকে জড়াইয়া ধরে, তেমনি করিয়া মার বুকে লুকাইয়া ভয়ত্রস্তস্বরে অজিত বলিয়া উঠিল, "না, মা, ওঁদের কাছে আর আমরা যাবো না।"

"কেন অজিত?" মনোরমার কণ্ঠে বিস্ময়ের সহিত উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইল। "কেন যাবিনে?"

আবার কিয়ৎক্ষণ দ্বিধায় ইতস্ততঃ করিয়া, অকস্মাৎ সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া ফেলিয়া, অত্যন্ত দ্রুতকণ্ঠে অজিত বলিয়া ফেলিল, "ঠাকুমা আমাদের ভালবাসেন,—কিন্তু ও'ও তো বাবার বাড়ী।" স্বরে তাহার নিদারুণ অভিমান ধ্বনিত হইল। ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। কর্ণমূল অবধি সমস্ত মুখখানা সূর্য্যরশ্মি-বিভাষিত অপরাহ্ণ বেলার পশ্চিম আকাশের মত সমুজ্জ্বল লালের আভায় জ্বলিতে লাগিল।

মনোরমা ক্ষণকাল মূঢ়ের মত অবাক্ হইয়া থাকিয়া, তেমনি বিমূঢ়ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "এ কথা বল্‌ছিস কেন? এঁর বাড়ী, তা—কি হয়েছে?"

"বাবা আমাদের ত্যাগ করেন নি?" বলিতে-বলিতেই মুখ ফিরাইয়া লইয়া অজিত সবেগে উঠিতে গেল; কিন্তু মনোরমা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া ছিল,—তাই পারিল না। নিজের এই আকস্মিক আঘাতের সমুদয় বিস্ময়-বিহ্বলতা ও বেদনা এক নিমেষের মধ্যে কাটাইয়া ফেলিয়া সে সহজ-গম্ভীর গলায় ডাকিল "অজিত!"

এ কণ্ঠকে অজিত চিনিত,—মনে-মনে ইহাকে সে অত্যন্ত সঙ্কোচ করিত। যতদূর তাহার পক্ষে সম্ভব, সংযত হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াই মায়ের পায়ের উপর নজর রাখিয়া জবাব দিল, "মা!"

"আমি বল্‌চি, তিনি আমাদের ত্যাগ করেন নি। বাপের আদেশ পালন কর্‌বার জন্য শুধু দূরে রেখেছেন। এ কথা তোমার বিশ্বাস হয়?"

ধীরে-ধীরে—ভোরের শিশিরে আর্দ্র শুভ্র শেফালির ন্যায় অশ্রু-ধৌত নির্ম্মলতায় অজিতের শোণিতার্দ্র কাতর চিত্ত একটী মুহূর্ত্তেই জুড়াইয়া স্নিগ্ধ হইয়া গেল। বিদ্রোহী অন্তঃকরণ নিজের অপরাধের গুরুত্ব সঙ্গে-সঙ্গে অনুভব করিয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। মায়ের দুই পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া অজিত মাকে প্রণাম করিল। এই মায়ের কথায় যে দিন অবিশ্বাস আসিবে, সে দিনের পূর্ব্বে এ পৃথিবীর আলো বায়ু অজিতকে যেন গ্রহণ করিতে না হয়। ঠিক এই কথাটিই বালক-অজিতের মুখে বা মনে না আসিলেও, ঠিক এই কথাটিই মানুষ-অজিতের বুকের মধ্যে ছিল, এ কথা জোর করিয়াই বলা যায়। (ক্রমশঃ)

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মূলানুসন্ধান *

[শ্রীবিপিনবিহারী সেন বি-এল্ বিদ্যাভূষণ]

কবি লোক-শিক্ষক। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় কেবল শিক্ষিত সমাজের জন্য তাঁহার কাব্য রচনা করেন নাই। নিরক্ষর জনসাধারণের জন্যও তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দীন-হীন কাঙ্গালের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চণ্ডী-কাব্য রচনার উদ্দেশ্য নিরক্ষর জনসাধারণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার,—তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি শিক্ষা দেওয়া। তাই তিনি সমুদায় শাস্ত্র হইতে তিল-তিল করিয়া সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এই কাব্য-তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই কাব্যে তিনি কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহারও অবিদিত নাই। আমার বোধ হয়, যাঁহারা চণ্ডী-কাব্যের মধ্যে কেবল মৌলিকতার অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা কবির গৌরবের হানি করেন। ধরিতে গেলে, তাঁহার কাব্যে বিরাট্ হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ অতি সরলভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে বেদ আছে, উপনিষদ আছে, দর্শন আছে, পুরাণ আছে, ইতিহাস আছে, স্মৃতিশাস্ত্র আছে, এমন কি, তন্ত্রশাস্ত্রের মারণ-বশীকরণের পর্য্যন্ত অভাব নাই। তিনি নিজে বলিয়াছেন,

"গুণি রাজা মিশ্র সুত সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামুন্যা নগর বাসী সঙ্গীত অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥"

এই অনেক পুরাণের মধ্যে, কোন্ স্থান হইতে তাঁহার কাব্যের কোন্ অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয়ের চেষ্টার জন্যই এই সামান্য প্রসঙ্গের অবতারণা। এইরূপ প্রবন্ধ সঙ্কলনের উপযুক্ত শক্তি, শিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি আমার কিছুই নাই; সুতরাং পদে পদে অক্ষমতা লক্ষিত হইবে। তবে ইহা কবিকঙ্কণ-চণ্ডী সম্পাদনরূপ বিরাট্ ব্যাপারে কাষ্ঠ-মার্জ্জারের সামান্য সহায়তা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, এইমাত্র ভরসা।

"ব্রহ্মার সমান পুত্র হইলা চারিজন" হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টি-প্রকরণ রচনায় কবিকঙ্কণ শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধের সৃষ্টি-বর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থলগুলি তুলনায় সমালোচনার যোগ্য—

ব্রহ্মার মানস পুত্র হৈলা চারিজন।
সনৎ কুমার আর সনক সনাতন॥
সনন্দ হইলা তথা চারির পুরাণ।

ইহার মূল—

"ভগবদ্ধ্যান পূতেন মনসান্যাং স্ততোঽসৃজৎ। ৩
সনকশ্চ সনন্দশ্চ সনাতন মামাত্মভূ।
সনৎকুমারঞ্চ মুনীন্ নিষ্ক্রিয়ানূর্দ্ধরেতসঃ॥ ৪।

চারি পুত্র ত্যজেন বাপের অনুরোধ।
বিধাতার হৃদয়ে বাড়িল বড় ক্রোধ॥
সেই ক্রোধ হৃদয়ে রহিল বিধাতার।
তথি জন্ম হৈলা নীললোহিত কুমার॥
বাল্য ভাবে মহাদেব করেন রোদন।
নাম ধাম জায়া মোর কর নিযোজন॥

ইহার মূল—

সোঽবধ্যাতঃ সুতৈরেবং প্রত্যাখ্যাতোঽনুশাসনৈঃ।
ক্রোধং দুর্ব্বিষহং জাতং নিয়ন্তুমুপচক্রমে॥ ৬
ধিয়া নিগৃহ্য মাণোঽপি ভ্রুবোর্ম্মধ্যাৎ প্রজাপতেঃ।
সদ্যোঽজায়ত তন্মন্যুঃ কুমারো নীললোহিতঃ॥ ৭।
সবৈরুরোদ দেবানাং পূর্ব্বজো ভগবান্ ভবঃ।
নামানি কুরুমে ধাতঃ স্থানানিচ জগদ্গুরো॥ ৮।

আপনার তনু ধাতা কৈল দুইখান।
বাম ভাগে হইল নারী দক্ষিণে পুমান॥
শতরূপা নারী হইল রুচিবর তনু।
পুরুষ হইল স্বায়ম্ভুব নামে মনু॥

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ইহার মূল—

এবং যুক্তকৃতস্তস্য দৈবঞ্চা বেক্ষতস্তদা।
কস্তরূপমভূদ্দ্বিধা যৎ কায় মভিচক্ষতে ॥ ৫১।
তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যতঃ ॥ ৫২।
যস্তু তত্র পুমান্ সোহভূন্মনু স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্।
স্ত্রীয়াসীচ্ছত রূপাখ্যা মহিষ্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫৩।

গুণ ভেদে এক দেব হইলা তিন জন।
রজোগুণে হৈলা বিধি মরালবাহন ॥
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে করেন পালন।
তমোগুণে মহাদেব বিনাশ কারণ ॥

সৃষ্টিপ্রকরণের এইস্থলে মুকুন্দরাম বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের সাহায্য লইয়াছেন।

সংক্রান্তায়াং সিসৃক্ষায়াং পুরুষে তত্র তাদৃশে।
শক্তিমান্ পুরুষোহভূতস্ত্রিবিধশ্চ:গুণৈস্ত্রিভিঃ ॥৯৬।
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চাপি রজঃ সত্ত্ব তমোময়াঃ।
ত্রীনেতান্ পুরুষান্ জাতান্ দদর্শ পরমা জাতা।
পরমোপাধয়ো ভূতাস্তদা তে পুরুষাস্ত্রয় ॥ ৯৭।

বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ মধ্যখণ্ড ৬ অধ্যায়

ভগবানের বরাহ রূপ ধারণ ও জলমগ্না ধরিত্রীর উদ্ধার প্রবন্ধ রচনায় কবি শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ১৩শ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়াছেন।

"মনুর প্রজা-সৃষ্টি" শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের ৫৪, ৫৫, ও ৫৬ শ্লোক অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। শ্লোক তিনটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তদা মিথুন ধর্ম্মেণ প্রজাহ্যেষাং বভূবিরে ॥৫৪।
সচাপি শতরূপায়াং পঞ্চাপত্যান্যজীজনৎ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ তিস্রঃ কন্যাশ্চ ভারত।
আকুতির্দেবহুতিশ্চ প্রসূতিরিতি সত্তম ॥ ৫৫।
আকুতিং রুচয়ে প্রাদাৎ কর্দ্দমায়তু মধ্যমাম্।
দক্ষায়াদাৎ প্রসূতিঞ্চ যত আপূরিতং জগৎ ॥ ৫৬।

"ভৃগু মুনির যজ্ঞ" রচনায় কবিকঙ্কণ শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ হইতে ৮ম শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন। ভাগবতকার যে ঘটনা পাঁচটী মাত্র শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই সরল ভাষায় পল্লবিত আকারে এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

কবি শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯ম হইতে ১৭শ শ্লোক অবলম্বন করিয়া তাঁহার "দক্ষের শিব-নিন্দা" রচনা করিয়াছেন। এস্থলেও তিনি মূল ঘটনা বজায় রাখিয়া বর্ণনা পল্লবিত করিয়াছেন।

দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপ প্রবন্ধের

"এমন শুনিয়া নন্দী দক্ষের বচন।
কোপে কম্পমান তনু লোহিতলোচন ॥
দক্ষে শাপ দিতে নন্দী জল নৈল হাতে।
না হইবে দক্ষ তোর গতি মুক্তিপথে ॥
মহাদেবে দক্ষ যেন বল কুবচন।
অচিরাতে হবে তোর ছাগল বদন ॥

ভাগবতের যে দুইটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া এই অংশ রচিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

বিজ্ঞায় শাপং গিরিশানুগাগ্রণী-
র্নন্দীশ্বরো রোষ কষায় দূষিতঃ।
দক্ষায় শাপং বিসসর্জ্জ দারুণং
যে চান্বমোদং স্তদবাচ্যতাং দ্বিজাঃ ॥ ১৯
বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোহস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্ত মুখোহচিরাৎ ॥ ২২

শ্রীমদ্ভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ ২য় অধ্যায়।

"পরস্পরে দুইজনে হৈব প্রতিকূল।
জামাতা শ্বশুরে যেন ভুজঙ্গনকুল ॥

হইতে আরম্ভ করিয়া "দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপে"র অবশিষ্টাংশ এবং "শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনা" শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধের উমারুদ্র সংবাদ নামক তৃতীয় অধ্যায় অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। কবি এ স্থলে অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনাদি করিয়াছেন। যে স্থলে ভাগবতকারের সতী বলিতেছেন, "যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে চলুন আমরা সকলেই গমন করি।" সেই স্থলে মুকুন্দরামের সতী দক্ষালয়ে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া কেবলমাত্র বলিতেছেন—

"তুমি আজ্ঞা দিলে নাথ যাই পিতৃবাসে।"

ভাগবতকারের শিব যে স্থলে বলিয়াছেন, "যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া তুমি তথায় গমন কর তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে না। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির স্বজন-সন্নিধানে পরাভব সদ্যই মরণের নিমিত্ত কল্পিত হয়।"

যদি ব্রজিষ্যতি হায় মদ্বচো
ভদ্রং ভবত্যা ন ততো ভবিষ্যতি।
সম্ভাবিতস্য স্বজনাৎ পরাভবো
যদা স সদ্যো মরণায় কল্পতে ॥ ২৫।

কবিকঙ্কণের শিব এতদূর অগ্রসর হন নাই, তিনি এক কথায় বলিয়াছেন—

"বাপ ঘরে যদি চল, তবে নাহি হবে ভাল,
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন।"

কবিকঙ্কণের শিবের কথার মধ্যে আমরা ভাগবতকারের শিবের কথার ন্যায় ভবিষ্যতের আভাষ পাই না।

"গৌরীর দক্ষালয়ে গমন" "দক্ষের প্রতি গৌরীর নিবেদন" এবং "সতীর দেহত্যাগ" প্রবন্ধের শেষ অংশ, অর্থাৎ

"হৃদয় সরোজে বান্ধি শিবের চরণ।
দৃঢ় করি ভগবতী পরিল বসন ॥
যোগেতে ছাড়িল তনু জগতের মাতা।"

শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায় অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। এ স্থলেও কবি মূল আখ্যায়িকার স্থানে-স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনাদি করিয়াছেন। ভাগবতকারের সতী শিবের অনুমতি না পাইয়া বন্ধু দর্শন বাসনায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া একবার ঘর একবার বাহির এইরূপ করিতে থাকেন এবং স্নেহবশতঃ রোদন করিতে-করিতে অশ্রুধারায় ব্যাকুল হইয়া শিবের প্রতি সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিকঙ্কণের সতী অনুমতি না পাইয়াই কোপবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। উক্ত ৪র্থ অধ্যায়ের ৩১ হইতে ৩৪ শ্লোক এবং চতুর্থ স্কন্ধের "দক্ষযজ্ঞ বিধ্বংস" নামক পঞ্চম অধ্যায় অবলম্বন করিয়া মুকুন্দরাম তাঁহার "দক্ষযজ্ঞনাশে শিবদূতের গমন ও "দক্ষ-যজ্ঞ ভঙ্গ" রচনা করিয়াছেন। উভয়ের উপাখ্যান-ভাগ এক হইলেও বর্ণনায় পার্থক্য আছে। বীরভদ্র কর্ত্তৃক দক্ষের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া যজ্ঞকুণ্ডে ফেলিবার কথা উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষের ছাগ-মুণ্ড, বীরভদ্রের কৈলাস গমন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শিবের স্তব, ও দক্ষের জীবন লাভ প্রভৃতি বিষয়গুলি ভাগবতকারের পরিকল্পিত হইলেও, উহার বর্ণনাভঙ্গী, আভ্যন্তরীণ খুটিনাটি' (detail) গুলি কবিকঙ্কণের নিজের। উহার জন্য তিনি কাহারও নিকট ঋণী নহেন।

"শিব নিন্দা শ্রবণের করিব প্রতিকার।
তোমার অঙ্গজ তনু না রাখিব আর ॥"

ইত্যাদির কল্পনা ভাগবতকারের নহে। কবি এ স্থলে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের পরিকল্পনার সাহায্য লইয়াছেন;—অবশ্য কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের সতী দক্ষালয়ে গমনোপলক্ষে বলিতেছেন—

"যদি শ্রোষ্যামি তে নিন্দাং তদা ত্যক্ষ্যাম্যহং তনুং।
কথ্যতে ভবতাপ্যেবং মন্নিন্দা শ্রোষ্যতে ত্বয়া ॥
যত্র ত্বয়া ন গন্তব্যং তজ্জাতাহং নতে প্রিয়া।
অতএব ময়া তজ্যং দেহশ্চোভয়থা শিব ॥
দক্ষজেন শরীরেণ নাহং তে নিকটোচিতা।
ইতি কৃত্বা কিয়ন্তেদং শরীরং বিহিতং ময়া ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্য-খণ্ড, ৬ অধ্যায় ৮৬, ৮৭ ও ৮৮ শ্লোক।

শ্রীমদ্ভাগবতকার সতীর দেহত্যাগের পর হিমালয়ের গৃহে জন্ম ও শিবের সহিত বিবাহের কথা দুইটী মাত্র শ্লোকে শেষ করিয়াছেন—

এবং দাক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্ব্বকলেবরম্।
জজ্ঞে হিমবতঃ ক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রুম ॥
তমেব দয়িতং ভূয় আবৃঙ্‌ক্তে পতিমম্বিকা।
অনন্য ভাবৈক গতিং শক্তিঃ সুপ্তেব পুরুষম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায় ৫৫ ও ৫৬ শ্লোক।

"সতী স্কন্ধে শিবের ভ্রমণ" বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্য খণ্ড দশম অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক অবলম্বনে রচিত হইয়াছে—

এবং বিলপ্য বহুধা হর প্রাকৃত লোকবৎ।
বাহুভ্যাং তাং পরিষ্বজ্য জগ্রাহ শিরসা পিতাম্ ॥১৭
গৃহীত্বা শিরসা কালীং দেবীং দাক্ষায়ণীং শিবঃ।
পরমং মোদমাপন্নো জগদাত্মানমাত্মনা ॥১৮
কদাচিচ্ছিরসাধায় কদাচিদ্বামপাণিতঃ।
কদাচিদ্দক্ষিণে হস্তে ধৃত্বা দাক্ষায়ণীং শিবঃ॥
ননর্ত্ত ধরণীখণ্ডে মহা তাণ্ডব পণ্ডিত ॥২১
তত্রোপায়ং বিনিশ্চিত্য বিষ্ণু পালন পণ্ডিতঃ।
সতী দেহং মহাদেব শিরস্থং ভীত ভীতবৎ।
সুদর্শনেন চক্রেণ চিচ্ছেদ খণ্ডশঃ শনৈঃ ॥২৯
চক্রেণ বিষ্ণুপাচ্ছিন্না দেব্যা অবয়বাস্ততে।
নিপেতুর্ধরণৌ বিপ্র সা সা পুণ্যতমা ক্ষিতি ॥৩১
কচিৎ পাদৌ কচিজ্জঙ্ঘে কচিজ্জিহ্বা কচিদ্ভুজৌ।

কচিৎস্তনৌ কচিৎকং কচিদ্বাহু কচিৎ করৌ ॥
কচিৎ পার্শ্বে কচিদ্ যোনি পপাত শিবমস্তকাৎ ॥৩২
যত্র যত্র সতী দেহ ভাগাঃ পেতুঃ সুদর্শনাৎ ॥
তে তে দেশা ধরাভাগা মহাভাগাঃ কিলাভবন্ ॥৩৩
তেতু পুণ্যতমা দেশা নিত্যং দেব্যাহ্যধিষ্ঠিতা।
সিদ্ধপীঠাঃ সমাখ্যাতা দেবানামপি দুর্লভাঃ।
মহাতীর্থানি তান্যাসন্ মুক্তিক্ষেত্রানি ভূতলে ॥৩৪

কিন্তু হিংলাজ, জ্বালামুখী, "ক্ষীরগ্রাম" বারাণসী ও "কামাখ্যা" ব্যতীত কবিকঙ্কণের পীঠস্থানগুলি তন্ত্রের পীঠস্থান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাতেও আবার তিনি হিংলাজে ব্রহ্মরন্ধ্রের পরিবর্ত্তে নাভিস্থল, জ্বালামুখীতে জিহ্বার পরিবর্ত্তে বক্ষঃস্থল ও ক্ষীরগ্রামে দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠের পরিবর্ত্তে পৃষ্ঠদেশ ফেলিয়াছেন।

"হিমালয়ের প্রতি নারদোপদেশ" "ইন্দ্রের প্রতি ব্রহ্মবাক্য" ও "হর কোপানলে মদন ভস্ম" রচনায় মুকুন্দরাম বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্য খণ্ড ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়াছেন। তুলনায় সমালোচনার জন্য নিম্নলিখিত স্থলগুলি উদ্ধৃত হইল।

কৃতাঞ্জলি দ্বিজবরে জিজ্ঞাসেন গিরি।
কোন বরে বিভা দিব মোর কন্যা গৌরী ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে—

হিমালয় উবাচ—

প্রভো ত্বমেক তত্ত্বজ্ঞো দুহিতুর্মে বরং বদ।
কস্মৈ দেয়া চ মে কন্যা কং প্রাপ্য সুখিনী ভবেৎ।১৫

যে স্থলে চণ্ডী-কাব্যে আছে—

হেমন্তের কথা শুনি বলেন নারদ।
গৌরী হইতে বাড়িবেক অনেক সম্পদ ॥
অচিরাতে হবে গৌরী হরের ঘরণী।

সে স্থলে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে—

নারদ উবাচ—

অস্তি যোগ্য পতিঃ শৈল দুহিতুস্তবনান্যথা।
যং প্রাপ্নুং যততে পুত্রী তব জানাম্যহং ভুতম্।
কৈলাসে বসতিস্তস্য ত্বয়া প্যেষ চ তিষ্ঠতি ॥১৬
মহাত্মা মহাবাহুঃ কুবেরো যস্য কিঙ্করঃ।
তস্মৈ দেহি সুতাং কন্যামর্চ্চনীয়ার দৈবতৈঃ ॥ ১৭ ॥

যে স্থলে চণ্ডী-কাব্যে আছে—

এমন সময়ে হর তপস্যা কারণে।
গঙ্গার নিকটে গেলা হিমালয়-বনে ॥
হর দেখি আনন্দিত হইল হিমালয়।
অঞ্জলি করিয়া নিবেদয়ে সবিনয় ॥
আমার আশ্রম আজি হইল পুণ্যশালী।
সংযোগ হইল যাহে তব পদধূলি ॥
আমার কামনা নাথ করহ সফল।
মোর কন্যা নিত্য দিবে কুশ পুষ্প জল ॥
হেমন্তের বচন শুনিয়া পশুপতি।
গৌরীকে করিতে পূজা দিল অনুমতি ॥
নানা উপহারে গৌরী পূজেন শঙ্করে।

সে স্থলে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে—

"ইত্যুক্তলন্তর্দধে শম্ভুরুমা পিত্রালয়ং যযৌ।
তদা নারদবাক্যেন জ্ঞাত্বা শৈলেশ্বর শিবম্।
শিবস্য পরিচর্য্যায়ৈ উমাং পুত্রীং দিদেশ হ ॥৩৮
পিত্রাজ্ঞয়া স্বাভিমতঃ সিষেবে সন্ততঃ শিবম্ ॥"

চণ্ডী কাব্যের যে স্থলে আছে—

ইন্দ্রের বচনে কাম হয়্যা ত্বরা যুত।
সঙ্গে নিল সহচর বসন্ত মারুত ॥
ফুলময় ধনু ফুলময় পঞ্চ বাণ।
মধুকর কোকিল করয়ে কল-গান।
ধেয়ানে আছেন হর অজিন আসনে।
ঝারি হাতে পার্ব্বতী আছেন সন্নিধানে ॥
সম্মোহন বাণ বীর পূরিল সত্বরে।
ঈষৎ চঞ্চল হর হইল অন্তরে ॥
ধেয়ান ভাঙ্গিয়া হর চারিদিকে চান।
সম্মুখে দেখিল চাপধারী পঞ্চ বাণ ॥
কোপদৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইলা মদন ॥

কন্দর্পস্তু সমাগত্য পুষ্পধন্বা স্ত্রিয়ান্বিতঃ।
সন্দধে পুষ্প ধনুষি মোহনাদিনি জৈমিনে ॥৪১
মূর্ত্তস্তত্র বসন্তোঽভূদ্ বিলসৎ পুষ্প সঞ্চয়ঃ।
তদ্দৃষ্ট্বা তু মহাদেবো বচস্যারম্ভমাত্মনঃ ॥৪২
তৎ কারণং মৃগ্যমাণো মণ্ডলীকৃত কার্ম্মুকম্।
কামং দদর্শ পার্শ্বস্থং দৃক্‌পাতাৎ ভস্ম চাকরোৎ ॥৪৩

এ স্থলে কুমারসম্ভবে আছে—

অসি চক্র শূল শক্তি কত মত শর।
পাঁচ অস্ত্র শোভিত দক্ষিণ পাঁচ কর॥

ইহার মূল—

ত্রিশূলং দক্ষিণেধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ।
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ॥
খেটকং পূর্ণ-চাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেবচ।
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ॥
"বাম দিকে লম্বমান শোভে জটাজুট।"
"অঙ্গদ বলয়া হার হৈল দশভুজা—"

তপ্ত কল ধৌত জিনি বরণের আভা।
ইন্দিবর জিনি দুই লোচনের শোভা॥
শশিকলা শোভে মায়ের মস্তক ভূষণ।
সম্পূর্ণ শারদ ইন্দু জিনিয়া বদন॥

যে শ্লোকদ্বয় অবলম্বনে এই অংশ রচিত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

জটাজুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥

এই সকল স্থলেও কবি মূল গ্রন্থের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই।

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত উর্দ্ধং রজস্বলা॥ ৬৬
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥ ৬৭
তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহোঽষ্টম বর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে॥ ৬৮
সংবর্ত্ত সংহিতা।

সংবর্ত্ত সংহিতার এই শ্লোক তিনটি অবলম্বন করিয়া মুকুন্দরাম তাঁহার "খুল্লনার বিবাহ প্রস্তাব" কবিতায় লিখিয়াছেন—

"অষ্টম বৎসরে কন্যা বিভা দিলে হয় ধন্যা
তার পুত্র কুলের পাবন।
আহরিয়া বর আনি কহিয়া মধুর বাণী
পণ বিনা করে সমর্পণ॥
নবম বৎসরে যদি বর আনি যথাবিধি
তনয়া করয়ে সম্প্রদান।
তার পুত্র দিলে জল সুরপুরে পায় স্থল
পিতৃলোকে পায় বহুমান॥
কেহ না বুঝাল্য তোমা গত হইল দশ সমা
তথাচ না কৈলে কন্যা দান।
প্রবেশিলে একাদশে মদন হৃদয়ে বৈসে
নব রস হয় একুস্থান॥
না করিলে কর্ম্ম ভাল এগার বৎসর গেল
অপযশ করিলে সঞ্চয়।
দ্বাদশ বৎসর বেলা হয় কন্যা রজস্বলা
পুরুষেরে নাহি করে ভয়॥
তাবত পুরুষে ভয় যাবত পুষ্পিতা নয়
রহে সয়ে তার কামমনা।
নর দেখি অনুপাম যদি কন্যা করে কাম
পায় পিতা নরক যন্ত্রণা॥

এ স্থলে কবিকঙ্কণের বর্ণনা পল্লবিত। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে একটী করিয়া ব্যাখ্যা যোজনা করিয়াছেন এবং কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জনাদিও করিয়াছেন।

"অপ্রদাতা পিতাবাচ্য" সম্ভবতঃ মহাভারতের এই বচন অনুসারে তিনি কেবল পিতাকেই পাপভাগী করিয়াছেন, সংহিতাকার এ স্থলে পিতা, মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সকলকেই পাপভাগী করিয়াছেন। সংবর্ত্ত সংহিতার ৬৬ শ্লোকের ৩য় ও ৪র্থ চরণের "দশ বর্ষা ভবেৎ কন্যা অতঃ উর্দ্ধং রজস্বলা॥" স্থলে "দশমে কন্যকা প্রোক্তা দ্বাদশেতু রজস্বলা॥" এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। কবি সম্ভবতঃ এই পাঠান্তরের উপর নির্ভর করিয়া "দ্বাদশ বৎসর বেলা কন্যা হয় রজস্বলা" বলিয়াছেন।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥
মনুসংহিতা ৯ম অধ্যায় ৩য় শ্লোক।

মনুর এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

শৈশবে রক্ষিবে তাত যৌবনে প্রাণের নাথ
বৃদ্ধকালে তনয় রক্ষিতা।

হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্বের ৮৪ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়া মুকুন্দরাম তাঁহার "হরিবংশ কথা" বা কংশের জন্ম বৃত্তান্ত

রচনা করিয়াছেন। কূটবুদ্ধি রাম রায়, স্ত্রীজাতি অরক্ষিত অবস্থায় থাকিলে তাহাদের কলঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা, এই কথা সমর্থনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা হরিবংশ পাঠ করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিতেছে।

রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১১৭শ হইতে ১২০ শক্তি সর্গের সাহায্য লইয়া কবি তাঁহার "রামায়ণ কথন"এর শেষ অংশ রচনা করিয়াছেন। ধনপতিকে বিড়ম্বিত করিবার জন্য, রামায়ণ হইতে জানকীর অগ্নি-পরীক্ষার বিবরণ শুনাইয়া, রামদত্ত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া স্বমত সমর্থন করিতেছে।

কবিকঙ্কণ তাঁহার যতু-গৃহের কল্পনা মহাভারত, আদি পর্ব্ব, যতুগৃহ পর্ব্বাধ্যায়ের ১৪৪ অধ্যায়ের ৮ম হইতে ১১শ শ্লোক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এস্থলে তিনি মহাভারত হইতে কেবলমাত্র কল্পনা বা ideaটি গ্রহণ করিয়াছেন, অন্য কিছুই নহে।

ষষ্ঠে মাস্যন্ন মশ্রীয়াৎ চূড়াকর্ম্ম কুলোচিতম্।
কৃত চূড়ে চ বালে চ কর্ণবেধো বিধীয়তে॥

ব্যাস সংহিতা, প্রথম অধ্যায় ১৮ শ্লোক।

ব্যাস-সংহিতার এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ তাঁহার চণ্ডী, কাব্যে অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধাদি সংস্কারগুলির বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়ার পরিকল্পনা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

নিশ্চয় জানিনু যদি আমারে বঞ্চিল বিধি
নাহি পিতা জীয়েন পরাণে।
আসিয়া আপন দেশে করিয়া পুত্তলীকুশে
করিব পিতার পরিত্রাণে॥

এইরূপ মৃত দেহের অভাবে মৃত ব্যক্তির কুশ-পুত্তলি বা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দাহ করিবার ব্যবস্থা কূর্ম্মপুরাণ উপরিভাগের ২৩ অধ্যায়ে আছে।

কবিকঙ্কণ তাঁহার 'সগরবংশ উপাখ্যান' রচনায় রামায়ণ আদিকাণ্ডের ৩৮, ৩৯ ও ৪০ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়াছেন; এবং "ভগীরথের গঙ্গা আনয়নে যাত্রা" "জহ্নুমুনি হইতে গঙ্গার উদ্ধার" ও "সগরবংশ উদ্ধার" রচনায় উহার ৪১, ৪২ ও ৪৩ সর্গের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল স্থলে রামায়ণের বর্ণনা অপেক্ষা কবিকঙ্কণের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্যখণ্ড ২৪ অধ্যায় ৬ শ্লোক।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন—

অযোধ্যা মথুরা মায়া যথা কৃষ্ণ পদ ছায়া
কাশী কাঞ্চী অবন্তী দ্বারকা।
হরি পদ আর যত বিশেষ বলিব কত
এই পুরী মুক্তির সাধিকা॥

শ্রীপতির জগন্নাথ দর্শন প্রবন্ধ রচনায় কবি স্কন্দপুরাণ উৎকল খণ্ডের সাহায্য লইয়াছেন। সমস্ত উৎকল খণ্ডে যাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তিনি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

"বিস্তার উৎকল খণ্ডে কত কব একদণ্ডে
ঝাট চল করি প্রণিপাত।"

কবিকঙ্কণের সেতুবন্ধ বিবরণ বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। সমগ্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণের গল্পটি কবি ত্রিপদী ছন্দের ৪০টি মাত্র শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাকে "এক নিঃশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

সলিলে ডুবিলে মহী আশ্রয় করিল অহি,
শয়ন করিলা নারায়ণ।
সেই অবদান কালে প্রভুর শ্রবণ মলে
দুই দৈত্য কৈল মহারণ॥
মধু সে কৈটভনাম দুই দৈত্য অনুপাম
বিধাতারে কৈল বিড়ম্বন।
নাভিপদ্মে প্রজাপতি সে আমারে কৈল স্তুতি
তার আমি হইলাম শরণ॥

এই কবিতাংশ রচনায় কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮১ অধ্যায় (দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী মধুকৈটভ বধ) ৪৮ হইতে ৫৩ শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন।

মুকুন্দরাম "হনুমানের প্রতি ঔষধ আনয়নে দেবীর আজ্ঞা" ও "মৃত সৈন্যের পুনর্জীবন প্রাপ্তি" রচনায় রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১০২ সর্গের ২৯—৪১ শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন। রামায়ণের হনুমান বিশল্যকরণী, সাবল্যকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানকরণী চিনিতে না পারিয়া সমগ্র গিরিশৃঙ্গই আনিয়া

উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত বহুদর্শী চণ্ডী কাব্যের হনুমানের পক্ষে বিশল্যকরণী, অস্থিসঞ্চারিণী ও মৃতসঞ্জীবনী চিনিতে কষ্ট হয় নাই। এবার তিনি কেবল গাছই আনিয়াছেন, পাহাড় তুলিয়া আনিবার আবশ্যকতা হয় নাই।

"ধনপতির হর-গৌরী দর্শন।" কবিকঙ্কণ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বনে হর-গৌরী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ বিরাট্ কল্পনা, এরূপ মনোহর বর্ণনা কোন দেশের কোন কাব্যে আছে কি না সন্দেহ। শ্রীকালিকা পুরাণের ৪৪ অধ্যায়ে প্রথমে এই হর-গৌরী রূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল। মূলতঃ সেই কল্পনা অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ এই অংশ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু স্থানে-স্থানে অন্যান্য পুরাণের বর্ণনারও যে সাহায্য না লইয়াছেন এমন বোধ হয় না।

যোগেনাত্মা সৃষ্টি বিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামাঙ্গ প্রকৃতি স্মৃতঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ৮ শ্লোক।

এ স্থলে কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

মুদিত নয়নে সাধু ভাবে মহেশ্বর।
পার্ব্বতী হইল তার অর্দ্ধ কলেবর॥
বাম ভাগে সিংহ হইল দক্ষিণ ভাগে বৃষ।
পতি বাম ভাগে গৌরী দক্ষিণে মহেশ॥

মৎস্যপুরাণ ২৬০ অধ্যায়ের ১—১০ শ্লোকে আমরা অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির বর্ণনা দেখিতে পাই। উহার দ্বিতীয় শ্লোকে আছে—

ঈশার্দ্ধেতু জটাভাগ বালেন্দু কলয়াযুতঃ।
উমার্দ্ধে চাপি দাতব্যো সীমন্ততিলকাবুভৌ॥
বাসুকিং দক্ষিণে কর্ণে বামে কুণ্ডলমাদিশেৎ।৩
নানা রত্ন সমোপেতং দক্ষিণে ভুজগাঙ্কিতম্॥"

এ স্থলে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

অর্দ্ধ ফোঁটা হরিতাল অর্দ্ধেক সিন্দূর।
ডানি কর্ণে অহি বাম কর্ণে মণিপুর॥
ডানি ভাগে জটাজুট বামে অলি কেশ।
অর্দ্ধেক ভূষণ অহি অর্দ্ধ রত্নদেশ॥

হরগৌরী রূপের আধ্যাত্মিক অর্থ অতি গভীর। সৃষ্টি সম্বন্ধে ও ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দু দার্শনিকগণের চরম সিদ্ধান্ত যাহা তাহারই সমন্বয় এই হরগৌরী রূপ কল্পনা। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই-ই নিত্য—সমস্ত বিশ্বই পুরুষ-প্রকৃতির বিকাশ। উচ্চস্তরের মানব হইতে বায়ু-সাগরে ভাসমান ধূলিকণা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই চৈতন্যরূপী পুরুষের অংশ ও প্রকৃতির জড়াংশ রহিয়াছে; সর্ব্বত্রই এই অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত প্রকৃতি-পুরুষের লীলা। হরগৌরী রূপ এই বিশ্বের গূঢ়তম রহস্যের পরিচায়ক। কবিকঙ্কণ ধনপতির হৃদয়ে এই দার্শনিক তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিয়া ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন ও শিখাইয়াছেন যে, হরগৌরী বা পুরুষ-প্রকৃতি এইরূপে সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বঘটে বিরাজমান, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কিছুই নয়—"শক্তি শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদ কথঞ্চন"। তাই ধনপতির "কেবল ভাবিতে হয় ধ্যান নাহি রয়"; "অর্দ্ধ-নারী শিব বিনা না রহে ধেয়ান"। বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৩৮ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া কবি তাঁহার "কলির দোষ কীর্ত্তন" রচনা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

"নারদী পুরাণ মত কলির চরিত্র যত
শুন ঝিয়ে খুল্লনা সুন্দরী।

তুলনায় সমালোচনার জন্য নিম্নলিখিত অংশগুলি উদ্ধৃত হইল।

কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

মহা ঘোর কলিকালে বেদ নিন্দা করিবে ব্রাহ্মণে।

ইহার মূল

"ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে দ্বিজা বেদ-পরাঙ্মুখা।২৯
ন ব্রতানি চরিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা বেদ-নিন্দকাঃ॥"

কবিকঙ্কণের—"নীচ হবে মহীপাল" ইত্যাদির মূল—

"রাজানশ্চার্থ নিরতাস্তথা লোভপরায়ণাঃ।৪৬

তাঁহার—"ষোড়শ বৎসরে হইবে জরা।" মূল—

"পরমায়ুশ্চ ভবিতা তদা বর্ষাণি ষোড়শ।"৬৫

"ধার্ম্মিকে করিবে উপহাস" ইহার মূল

"ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে নরং ধর্ম্মপরায়ণং।
অসূয়া নিরতা সর্ব্বে উপহাসং প্রকুর্ব্বতে॥"৪২

ব্রাহ্মণগণ

"লোভে অতিপাপ মতি অকর্ম্মে সতার মতি
পরায়ে সতার অভিলাষ॥"

ইহার মূল

"লোভাভিভূত মানসঃ সর্ব্বে দুষ্কর্ম্মশীলিনঃ।
পরান্ন লোলুপা নিত্যং ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়॥"৪০
"করিবে অধর্ম্ম পথ পিতৃ হিংসিবেক সুত,
গুরু হিংসিবেক ছাত্রগণ
দারুণ কলির গতি বনিতা নিন্দিবে পতি"

ইত্যাদির মূল—

"দ্বিষন্তি পিতরং পুত্রা গুরুং শিষ্যা দ্বিষন্তি চ।
পতিং চ বণিতা দ্বেষ্টি কৃষ্ণে কৃষ্ণত্বমাগতে॥"৩৯

"পঞ্চ বর্ষে নারী গর্ভবতী" এবং "সপ্ত অর্দ্ধে নারী গর্ভবতী" ইহার মূল—

"পঞ্চমে বাথ ষষ্ঠে বা বর্ষে কন্যা প্রসূয়তে॥"৬৬
"দরিদ্র হইবে বৈশ্য ব্রাহ্মণ শূদ্রের শিষ্য
ভিক্ষাজীবী হবে সব লোক।"

ইত্যাদি কবিতাংশের মূল—

"ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা সর্ব্বে ধর্ম্ম পরাঙ্মুখা।
অন্নার্থাশ্চ ভবিষ্যন্তি তপঃ সত্য বিবর্জ্জিতা॥"৬৪

এবং

"কিঙ্করাশ্চ ভবিষ্যন্তি শূদ্রানাঞ্চ দ্বিজাতয়ঃ।"৩৮

"কলির গুণ কীর্ত্তন" ও উক্ত বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৩৮ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়া রচিত হইয়াছে।

যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈ স্ত্রেতায়াং হায়নেঽপিষৎ।
দ্বাপরে তচ্চ মাসেন চাহ রাত্রেণ তৎকলৌ॥৯৬
ধ্যায়ন্ কৃতে যাজন্ যজ্ঞে স্ত্রেতায়ং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্॥
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্যকেশবম্॥৯৭

বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৩৮ অধ্যায়ের এই শ্লোকদ্বয় অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

যেই ধর্ম্ম হয় সত্যে দ্বাদশ বৎসরে।
ত্রেতাযুগে এক অব্দে কহিনু তোমারে॥
দ্বাপরেতে সেই ধর্ম্ম হয় এক মাসে।
কলিতে সে ধর্ম্ম হয় রজনী দিবসে॥
ধ্যান করি হরি পদ পায় সত্য যুগে।
ত্রেতাযুগে হরি পদ পায় দান যোগে।
দ্বাপরে বৈকুণ্ঠে চলে পূজিয়া গোপালে।
হরি-সংকীর্ত্তনে পদ পায় কলিকালে।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম স্কন্ধ, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া মুকুন্দরাম তাঁহার গজেন্দ্র মোক্ষণ রচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০ হইতে ৩৪ শ্লোক ও তৃতীয় অধ্যায়ের ৩০ হইতে ৩৩ শ্লোকের উপর কবি বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পাণ্ড্য দেশীয় এক অতিশয় ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তিনি অগস্ত্যের শাপে পৃথিবীতে গজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত গজরূপী ইন্দ্রদ্যুম্ন একদিন করিণীগণ সহ যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে ত্রিকুট পর্ব্বতস্থ হ্রদের জলে অবগাহনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছিল। ঐ সরোবরে কুম্ভীরবেশী হুহু নামক গন্ধর্ব্ব বাস করিত। অনন্তর কুম্ভীর উক্ত হস্তীর পদ ধারণ করিয়া প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। হস্তী উপায়ান্তর না দেখিয়া নারায়ণের স্তব করিতে লাগিল। তখন ভগবান বিষ্ণু কুম্ভীরের সহিত তাহাকে উত্তোলন করতঃ চক্র দ্বারা কুম্ভীরের মস্তক ছেদন করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দেন। পরিশেষে কুম্ভীর ও গজেন্দ্র উভয়েই ভগবানের করস্পর্শে শাপ-মুক্ত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়, বিশেষতঃ প্রথম অধ্যায়ের ১৯—৩২ শ্লোক এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০—২৩ শ্লোক অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ তাহার অজামিলের মুক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উভয় স্থলে কবি শ্রীমদ্ভাগবতের মূল আখ্যায়িকার কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই।

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্ব খণ্ড ২য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ জপতপ পিতা—
পিতা মহাগুরু জন পরম দেবতা॥

ইমান্‌দার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

একবিংশ পরিচ্ছেদ

দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ফৈজু বাড়ীতে থাকিবার মতলব করিয়াছিল; কিন্তু নানী আসিয়া গল্প জুড়িয়া দেওয়ায় রহিমা বাড়ীতেই রহিয়া গেল। বেগতিক দেখিয়া ফৈজু বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল,—স্ত্রীর সহিত নিভৃত আলাপের প্রত্যাশায় ঘরে বসিয়া থাকিতে ভারী লজ্জা বোধ হইল।

রাত্রিতে পিতাপুত্রে যখন আহারে বসিয়াছেন, তখন রহিমা এ-ও সে কথার পর টিয়ার পিত্রালয়ে যাওয়ার কথা তুলিল। পিতা সংক্ষেপে গম্ভীরভাবে জানাইলেন, ফৈজুর শ্বশুর তাঁহার কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন, এখন কি উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য?

সংবাদটা পুত্রবধূর উদ্দেশে বিজ্ঞাপন করিলেও, বৃদ্ধ আসলে যে সেটা ফৈজুকেই প্রশ্ন করিলেন, ফৈজু সেটুকু বুঝিল। কিন্তু কি যে উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না, মাথা হেঁট করিয়া খাইতে লাগিল।

রহিমা শ্বশুর ও দেবরকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, এখানে আসিয়া এই অল্প দিনেই ছোট-বধূর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে, আরো কিছুদিন তাহাকে এইখানে রাখিলে ভাল হয়। অবশ্য পিতার পত্র আসিয়াছে শুনিয়া, সেও যাইবার জন্য ছেলেমানুষের মত আব্দার জুড়িয়াছে, কিন্তু কি এত তাড়াতাড়ি যাইবার.........? ইত্যাদি।

আরো কতকগুলো মন্তব্য-গুঞ্জন শুনাইয়া উপসংহারে রহিমা প্রশ্ন করিল, "তোমার কি মত ফৈজু?"

ফৈজু শুষ্কভাবে একটু হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, "আমার আবার মত কি? তোমরা যা ভাল বোঝ, কর।"

প্রসঙ্গটা ঐখানেই থামিল। পিতাপুত্রের-আহার শেষ হইলে, রোয়াকে বসিয়া দু'জনে কিছুক্ষণ এ-দিক্ ও-দিক্ কথাবার্ত্তা কহিলেন। তার পর রহিমা আহার করিয়া আসিলে, পূর্ব্বদিনের মত তাহাকে সঙ্গে করিয়া নানীর বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া, বৃদ্ধ স্বয়ং "বাবুদের বাড়ীর" উদ্দেশে চলিলেন।

দুয়ারে খিল লাগাইয়া আসিয়া, ফৈজু রোয়াকের উপর মাথার নীচে দু'হাত রাখিয়া, সটান লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া, চোখ বুজিয়া কি ভাবিতে লাগিল। টিয়া রান্না-ঘরে তখনো কি খুটখাট্ করিতেছিল, ফৈজু শুনিতে পাইল;—সেই জন্য ডাকাডাকি করিয়া, অসমাপ্ত কাযে বাধা দিয়া ব্যস্ত-বিক্ষুব্ধ করিতে চাহিল না। কায শেষ হইলে সে আপনিই আসিবে, সেটা জানা কথা; তাই নিরুদ্বিগ্নচিত্তে চুপচাপ শুইয়া, আপন মনে কি ভাবিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে টিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া কাপড়ে ভিজা হাত মুছিতে-মুছিতে আস্তে-আস্তে ঘরের দিকে চলিল। ফৈজু চোখ মেলিয়া চাহিয়া, মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এই-খানেই এস না,— এখন থেকে ঘরে কেন?"

থমকিয়া দাঁড়াইয়া টিয়া বলিল, "আস্‌ছি—কাপড়টা বদ্‌লে।" তার পর একটু থামিয়া, দুষ্ট কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলিল, "ওখানে কতটুকু সময়ই বা বস্‌তে পাব— তুমি এখ্‌খুনি তো তাড়া দিয়ে উঠ্‌বে?"

ম্লানভাবে একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল, "কি কর্‌ব? তোমার যে শরীর ভাল নয়। থাক্, আজকের মত একটু-ক্ষণ বস্‌বে এসো তো।"

স্বামীর ম্লান মুখের পানে চাহিয়া, টিয়ার তরুণ মুখের চপল কৌতুক-লীলা মুহূর্ত্তে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তাড়া-তাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া স্খলিত চরণে সে ঘরে ঢুকিয়া গেল।

একটু পরে ফর্শা কাপড়খানি পরিয়া, নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া, রোয়াকের নীচে দিয়া ঘুরিয়া গিয়া ফৈজুর পাশে দাঁড়াইল। চিন্তামগ্ন ফৈজু টের পাইল না, চোখ বুজিয়া নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া রহিল। টিয়া সলজ্জ-সঙ্কোচে একটু ইতস্ততঃ করিয়া, ধীরে-ধীরে স্বামীর বুকের উপর নিজের

হাত দু'খানি রাখিয়া স্নিগ্ধহাস্যে বলিল, "আমার হাত দু'টি কেমন ঠাণ্ডা হয়েছে তাখো! বেশ সুন্দর না?"

ফৈজু চমকিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। তার পর সহসা ব্যগ্র বাহু-বেষ্টনে স্ত্রীর কটি জড়াইয়া ধরিয়া, পাশে টানিয়া বসাইয়া, নিজের সশব্দ-স্পন্দিত হৃদপিণ্ডের উপর তাহার হাত দু'টা সজোরে চাপিয়া ধরিল;—কিন্তু স্ত্রীর মুখ পানে সহসা যেন চাহিতে পারিল না, বিচলিত ভাবে চোখ বুজিল। প্রবল শক্তি-প্রয়োগে, নিজের গোপন-চিন্তা-উদ্বেলিত হৃদয়ের অধীর মত্ততা নিঃশব্দে দমন করিয়া লইয়া, বুকের উপর সেই হাত দু'টি অধিকতর জোরে চাপিয়া ধরিয়া, নিজের অন্তরে-অন্তরে অতি সুগভীর ভাবে সে কি যেন অনুভব করিতে লাগিল। বুঝি সেই সাড়ে-তিন বৎসর পূর্ব্বের দুঃখ-দুর্য্যোগ-পূর্ণ অতীতের স্মৃতি মনে পড়িয়া গেল। সেই ব্যাধি-পীড়িতা কিশোরীর জর-তপ্ত শীর্ণ হাত দু'খানির জ্বালাময় স্পর্শ —যে স্পর্শস্মৃতি—বহু—বহু দিন ধরিয়া তাহার দৃঢ় শক্তি-বিশিষ্ট একনিষ্ঠ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের মাঝে, তীব্র বেদনায় দীপ্ত সজাগ হইয়া জাগিয়াছিল, যে বেদনার সাড়া সে অহোরাত্র নিজের বুকের সমস্ত শিরা-উপশিরার মাঝে, ক্ষুব্ধ স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া ফিরিতে দেখিয়াছিল,—তাহার যুবা-হৃদয়ের সমস্ত তৃষা-চাঞ্চল্য, যে রুক্ষ ব্যথার রুদ্র স্পর্শে শোক-মুহ্যমান হইয়া—এত দিন স্তম্ভিত নিস্পন্দ হইয়াছিল,—বুঝি আজ তাহাকে, এই নূতনতর কোমল শীতলতার, অভিনব আনন্দবাহী স্পর্শে, নব-উদ্বোধনের মাঝে সজীব করিয়া তুলিতে চাহিল। ফৈজু কোন কথা কহিতে পারিল না।

স্বামীর সেই গভীর চিন্তাশীলতার সুগভীর স্তব্ধ ভাব টিয়াকে বিচলিত করিয়া তুলিল। যা-হোক্ একটা কিছু শব্দ করিয়া সেই অসহ মৌনতা সজোরে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য অধীরচিত্তে সহসা সে বলিয়া উঠিল "আমার শেরগড় যাওয়ার কি ঠিক্‌ঠাক্ হোল তা হলে?"

সজোরে আত্মদমন করিয়া, শান্ত দৃষ্টি মেলিয়া, ফৈজু স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "তোমার মন কি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যাবার জন্যে?"

ফৈজুর কণ্ঠস্বরটা টিয়ার কাণে ভারী আশ্চর্য্য ঠেকিল। ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া, নিজের অজ্ঞাতেই সে বলিয়া ফেলিল, "না, তাতো হয় নি,—মন ব্যস্ত হবে কেন?"

অধিকতর কোমলকণ্ঠে ফৈজু বলিল, "কোন কষ্ট হচ্ছে কি এখানে—"

টিয়া আরো আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "না,—তা কেন হবে? দিদি আমায় মার চেয়েও বেশী যত্ন করে। কত সাবধানে রেখেছে। আমার বরং অত ভয় থাকে না, কিন্তু দিদিকে তো ফাঁকি দিতে পারি না, দিদি কত ভালবাসে আমায়—"

নিজের প্রকাণ্ড মুঠার মধ্যে টিয়ার দর্ম্মাক্ত হাত দু'টি চাপিয়া ধরিয়া ফৈজু বলিল, "তবে আর দিন-কতক থেকে যাও,—আমি জয়দেবপুর থেকে ফিরে আসি। তার পর আমি নিজে তোমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসব। কেমন, রাজী তো?"

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া টিয়া বলিল, "তুমি নিজে আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে? ঠিক তো? আচ্ছা, তা হলে আমি এখন যেতে চাই না। কিন্তু তুমি কত দিন পরে ফিরবে?"

ফৈজু বলিল, "মাসখানেকের মধ্যেই বোধ হয়; কিছু বেশী দিনও হতে পারে—"

টিয়া বলিল, "এই এত দিন তুমি সেখানে বসে থাকবে? এর মধ্যে এক-আধ দিনের জন্যেও আর বাড়ী আসবে না?"

ফৈজু হাসিয়া বলিল "অনেক দূরের রাস্তা যে! তা'হলেও খাজনার টাকা চালান দেবার জন্যে মাঝে মাঝে হয়তো আসতে পারি। মোদ্দা, মাস-দেড়েকের মধ্যে এ কিস্তির খাজনা আদায় করে প্রথম হাঙ্গামটা মিটিয়ে আসতে পারব বোধ হয়। সেই সময় তোমায় শেরগড়ে রেখে আসব। এখন তুমি যাবার মতলব ছেড়ে দাও।"

টিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, বোধ হয় মনে মনে কথাগুলার পুনরালোচনা করিয়া লইল। তার পর সহসা যার-পর-নাই বিস্ময়ের সহিত বলিল, "আচ্ছা, তোমারই বা হঠাৎ এ মতলব হোল কেন বল দেখি? আমায় এখানে রাখবার জন্যে এত জিদ্ করছ কেন এবার?"

ফৈজু কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় নানী বাহিরের দুয়ারে করাঘাত করিয়া ডাকিলেন "ফৈজু, ফৈজু—"

ফৈজু সাড়া দিয়া, ত্রস্তে উঠিয়া দ্বার খুলিতে গেল। টিয়া ততক্ষণে মাথায় কাপড় টানিয়া, একছুটে অন্ধকার ঘরে গিয়া লুকাইল। লজ্জায় তাহার বুক দুরুদুরু করিতে লাগিল! মাগো, ছিঃ! নানী বাড়ীতে ঢুকিয়া এখনি যদি

হঠাৎ দেখিয়া ফেলিতেন যে, টিয়া তাঁহার নাতীর কাছে বসিয়া, অমন অসঙ্কোচে তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে, তাহা হইলে, না জানি নানী কি-ই মনে করিতেন! লজ্জায় অস্থির টিয়ার এত হাসি পাইতে লাগিল, যে, অন্ধকার ঘরে মুখে কাপড় চাপিয়া, আপনা-আপনিই হাসিয়া আকুল হইয়া উঠিল।

ফৈজু দুয়ার খুলিতেই, নানী ও রহিমা বাড়ী ঢুকিল। রহিমা দুয়ারটা পুনশ্চ বন্ধ করিতে-করিতে সংক্ষেপে জানাইল, আজ নানীর বাড়ীতে জন-কয়েক কুটুম্বিনী আসিয়াছে; তাই স্থানাভাব বশতঃ তাহারা এইখানে শুইতে আসিল।

পল্লীগ্রামের ইহা চির-প্রচলিত প্রথা। এক বাড়ীতে অতিথি-কুটুম্ব আসিলে, তাহাদের থাকিবার জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীর লোক প্রতিবেশীর বাড়ীতে নিজে আশ্রয় লইতে যায়। ইহাতে কেহ কিছুমাত্র দ্বিধা-সঙ্কোচের ধার ধারে না।

রহিমার বক্তব্য শেষ হইতে না হইতে, নানী ফৈজুকে প্রশ্ন সুরু করিলেন —"ফৈজু এতক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়াছিল কেন? তাহার ঘুমই বা আসে নাই কেন? নাত্‌বৌ কতক্ষণ ঘরে গিয়াছে? সে জাগিয়া আছে, না ঘুমাইতেছে? ফৈজু সে সংবাদ জানে কি না?……" ইত্যাদি। ফৈজু প্রথমে সরল ভাবেই দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দিল। তা'র পর বেগতিক দেখিয়া নিরুত্তরে হাসিতে লাগিল।

নানীর অফুরন্ত প্রশ্ন ক্রমাগতই চলিতে লাগিল, কিছুতেই সে থামে না। কিন্তু দুষ্ট নাতীটির কাছে সন্তোষ-জনক কৈফিয়ৎ মোটেই আদায় হইল না। অগত্যা তাহাকে কটুকাটব্য বর্ষণ করিয়া নানী নাত্‌বৌয়ের সন্ধানে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রহিমা প্রতিবন্ধক হইয়া, নানীকে টানিয়া লইয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া, শয়নের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়া, চেঁচাইয়া বলিল "ফৈজু, তুমি শুয়ে পড়গে,—ঘরে যাও।"

ফৈজুও আজ এখন এইটুকুই চায়। রোয়াকের বিছানাটা গুটাইয়া লইয়া বারেণ্ডায় ফেলিয়া, একটু ত্রস্ত-চরণে সে নিজের শয়ন-কক্ষের দিকে চলিল। কিন্তু দুয়ারের কাছাকাছি হইতেই, ঘরের ভিতর হইতে টিয়া সবেগে আসিয়া অন্ধকারে তাহার উপর পড়িল!—ফৈজুর বুকে মাথা ঠুকিয়া টক্কর খাইয়া, টিয়া বেশ ভালরকমই একটা আছাড় খাইবার যোগাড় করিয়াছিল; ফৈজু বলিষ্ঠ-ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া, সামলাইয়া লইল; চুপি-চুপি বলিল, "আবার এখন ছুটছ কোথা? ঘরে চল, অনেক রাত হয়েছে।"

নিজের মাথায় হাত বুলাইয়া, টিয়া চুপি-চুপি ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "মাগো, কি মানুষ তুমি! ওম্নি করেই অন্ধকারে আসে?"

ফৈজু হাসিয়া বলিল "বাঃ, অন্ধকারে আসার দোষটা বুঝি একা আমারি? তুমি তীরের মত ছুট্‌ ছিলে কেন? ঘরে চল।"

টিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তুমি শোও গে, আমি নানীর সঙ্গে দেখা করে আসি,—বাড়ীতে মানুষ এলো, আর আমি শুয়ে থাক্‌ব, তা হবে না, সর।"

কিন্তু লৌকিকতা-আইনের অত সূক্ষ্ম ধারাগুলো আজ ফৈজুর আগ্রহ-উৎসুক মনের কোনখানে খুঁজিয়া পাওয়া দায়! কাযেই, বাধা দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "আজ থাক, কাল সকালে দেখা কোরো, এখন ওরা শুয়ে পড়েছে। কোন দর্‌কার তো নাই!"

টিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "দরকার না থাকলেও যেতে হয়। তুমি সে সব, কিছু জান না,—সর, আমি শুনে আসি।"

"আঃ!……আচ্ছা যাও; মোদ্দা শীগ্‌গী ফিরো—" বলিয়া ফৈজু হাত ছাড়িয়া দিল। টিয়া চৌকাঠ ডিঙাইয়া বাহিরে গিয়াই, অকস্মাৎ অসহনীয়-অভিমানের ঝাঁজভরা স্বরে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিল,—"হুঁ! আস্‌বে শীগ্‌গী! আমি এখন যত পারি, দেরী করে আস্‌ব আজ……"

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এই অদ্ভুত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া টিয়া অম্লান-বদনে দ্রুত প্রস্থান করিল! ফৈজু অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া—শেষে আপনা-আপনি নিঃশব্দে হাসিল! কি অদ্ভুত রহস্যময় ক্রোধ! অকারণ, পরম অসঙ্কোচে—শিশুর মত সরল-দুর্ব্বলতাপূর্ণ—একি বৃহৎ অভিমানের প্রতাপ!

কিন্তু থাক,—এ মান-অভিমানের অভিনয়-সমালোচনায় তন্ময় হইয়া থাকিবার মত চিত্তস্থৈর্য্য আজ তাহার নাই,—আজ ফৈজুর মন ভারী উতলা হইয়া উঠিয়াছে। টিয়াকে ক্ষেপাইয়া, এখন তাহার পিত্রালয়-গমনের মত-পরিবর্ত্তনটা

সুনিশ্চিত রূপে করাইয়া লইতে হইবে। জয়দেবপুর হইতে ফিরিয়া সে যেন টিয়াকে অন্ততঃ এক দিনের জন্তও এখানে দেখিতে পায়,—এটুকু বন্দোবস্ত করিয়া লইতেই হইবে।

ঘরের প্রদীপটা অত্যন্ত মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল ; সেটা উস্কাইয়া দিয়া, ফৈজু বিছানায় গিয়া বসিল। গোঁফে তা দিতে-দিতে নিজ মনে কি ভাবিতে লাগিল।

একটু পরে, ও-ঘরে রহিমার সুস্পষ্ট তিরস্কারের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। কাণ পাতিয়া একটু শুনিতেই ফৈজু বুঝিতে পারিল, টিয়াই বকুনী খাইতেছে! কারণটা বুঝিতেও অবশ্য বিলম্ব হইল না,—ফৈজুর আবার হাসি পাইল। পরক্ষণেই দেখিল, মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া, সলজ্জ-কুণ্ঠিত ভাবে টিয়া ঘরে ঢুকিতেছে। সপরিহাসে ফৈজু বলিল, "যাঃ! রসভঙ্গ হয়ে গেল!"

সন্ত্রস্ত ভাবে পিছনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া টিয়া বলিল, "দিদি—দিদি—"

সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফৈজু বলিল, "কে, খলিফা আস্‌ছ? এস, এস—"

বাহিরের অন্ধকার বারেণ্ডা দিয়া দ্রুত চরণে পুনঃ প্রস্থান করিতে করিতে, খুব সংক্ষিপ্ত, গম্ভীর বচনে রহিমা বলিয়া গেল, "কপাট বন্ধ করে দাও, আমরা ঘুমুতে যাচ্ছি—" সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেদের শয়ন-কক্ষে ঢুকিয়া সে সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিল।

রহিমা টানিয়া আনিয়া তাহাকে দুয়ার পর্য্যন্ত রাখিয়া গিয়াছে,—লজ্জার উত্তেজনায় টিয়ার হাত-পা ঘামিয়া উঠিয়াছিল। এইবার সহসা নিতান্ত অকারণেই ফৈজুর দিকে এক কোপ-কটাক্ষ হানিয়া, অকস্মাৎ বিদ্রোহের স্বরে বলিল "যাও,—তোমার ওপর আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছে!—ছিঃ!"

মৃদু-মৃদু হাসিতে-হাসিতে, দুয়ার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সুকোমল কণ্ঠে ফৈজু বলিল "নিজে মাথা ঠুকে নিজে-নিজেই মাথা গরম করে তুল্‌লে!"

গ্রীবা বাঁকাইয়া উষ্ণ অভিমানে টিয়া বলিল, "কেনই বা তুল্‌বো না? বেশ করবো, তুলবো, তোমার কি?"

হাসি-হাসি মুখে ফৈজু বলিল, "আমার অসুবিধা,—আর কি? একটা দরকারী কথা ঢুকিয়ে নেবার ছিল,—কিন্তু অমি ভাবে পাগলামী জুড়্‌লে—"

বাধা দিয়া টিয়া বলিল, "এইটে পাগলামী হোল! অমন করে মাথা ঠুকে গেলে—"

ক্ষিপ্র চতুরতার সহিত ফৈজু বলিল, "বাঃ, মাথা বুঝি একা তোমারি ঠুকে গেছে! আর আমার বুকটা বুঝি সে ধাক্কায় জখম্ হয় নি?"

থতমত খাইয়া, টিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! মুখে-চোখে বিদ্রোহের রেখা মিলাইয়া, অভাবনীয় বিস্ময়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ভীতি-ম্লান মুখে বলিল, "সত্যি লেগেছে? খুব লেগেছে?"

একটা ছোট কথার ঘায়ে, টিয়ার যে এতখানি শোচনীয় বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিয়া যাইবে, ফৈজু তাহা আদৌ অনুমান করিতে পারে নাই। টিয়ার মুখপানে চাহিয়া ভারী হাসি পাইল। মনে মনে একটু লজ্জাবোধও হইল,—ছিঃ এই নিতান্ত সরল-বুদ্ধি দুর্ব্বলের সঙ্গে,—কথার চালাকি খেলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা!.........অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া, গম্ভীর মুখে বলিল "কেনই বা লাগবে না, মানুষ তো আমিও—" কথাটা বলিতে বলিতে চট্ করিয়া টিয়ার হাত ধরিয়া টান দিয়া বলিল "এস—"

ফৈজুর মুখপানে চাহিয়া দারুণ সন্দেহে টিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠাট্টা হচ্ছে? না?"

ফৈজুর গাম্ভীর্য্য-আড়ম্বর লোপ হইল! সে হাসিয়া ফেলিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে, যথা-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা-মতে সকলে জয়দেবপুর রওনা হইলেন।

এবার বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইবার সময় ফৈজুর মন অত্যন্তই দমিয়া গেল। চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে মনের যে জোরটুকু লইয়া, বন্ধুর পরিহাসকে সে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল,—মনের সে জোরটুকু তখন যে কোথায় হারাইল, ফৈজু ঠিক করিতে পারিল না। বিদায়ের সময় টিয়ার দুটি হাত ধরিয়া—আবেগ ভরে পীড়ন করিয়া, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বলিল, "দেখো, ফিরে এসে যেন তোমায় দেখ্‌তে পাই।"

টিয়ার চোখ জলে তখন ভরিয়া গিয়াছিল। তবু সে ম্লান হাসি হাসিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "তুমি তো চৌকাঠ পার হলেই সব ভুলে যাবে!—"

পথে যাইতে যাইতে, ফৈজুর শুষ্ক মুখ এবং বিমর্ষ মন সবচেয়ে পরিষ্কার রূপে ধরা পড়িল মণ্ডলের চোখে! ফৈজুর ভাগ্য ভাল, তাই মিত্র মহাশয় সঙ্গে ছিলেন; না হইলে মণ্ডলের অসংযত পরিহাসে ফৈজুর দুরবস্থার সীমা থাকিত না। মণ্ডলের আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ফৈজু মিত্র মহাশয়ের পাশে স্থান লইল। মণ্ডল কিন্তু নিরস্ত হইবার পাত্র নয়,—সুযোগ পাইলেই ছোবল মারিয়া বসিত! মাননীয় জনের চক্ষুর অন্তরাল হইলে দুই বন্ধুতে অনেক সময় মুখোমুখী ছাড়িয়া হাতাহাতিও বাধাইয়া ফেলিত! রামটহল আজকাল ফৈজুকে বেশ খাতির করিয়া চলে; কারণ ফৈজু এখন—"নাউবজী" হইয়াছে! কাযেই ফৈজুকে আর ঠাট্টা-তামাসা করে না। তবে অন্য কেহ ঠাট্টা করিলে, সেও পিছনে থাকিয়া ঐকতান-বাদনে যোগ দিয়া, রসিকতা প্রকাশে কুণ্ঠিত হইত না! এমনি ভাবে হাস্য-পরিহাসে পথ সচকিত করিয়া, সকলে যথাসময়ে জয়দেবপুরে পৌঁছিল।

সঙ্কটপুরের বাবুদের নিযুক্ত প্রবল প্রতাপশালী লোকজনের রুদ্রনীতির কঠোর তাড়নায়, জয়দেবপুরের প্রজারা বহুদিন ধরিয়া উগ্রবিদ্রোহভাব পোষণ করিতেছিল। দু'চারটা মারামারি, পেটাপেটি, ফৌজদারী নালিশ ফ্যাসাদও ইতিপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছিল। উত্যক্ত প্রজার দল, একটা নূতন কিছু পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। এই নূতন শাসক-সম্প্রদায়ের আগমনে প্রথমটা তাহারা একটু সন্দেহ-চাঞ্চল্য অনুভব করিল; কিন্তু ইঁহাদের আশ্বাস ও সদ্ব্যবহারে শীঘ্রই তাহারা বিশ্বাস করিয়া, স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করিল। মাতব্বর প্রজারা মিত্র মহাশয়ের মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত হইয়া,—আপনা হইতেই অবুঝ-আনাড়ি, গোঁয়ার-গোছের একরোখা প্রজাদের বুঝাইয়া-পড়াইয়া ঠাণ্ডা করিলেন। ফৈজুর অমায়িক সৌহৃদ্যে গ্রামের যুবক সম্প্রদায় মুগ্ধ হইয়া প্রাণপণ উৎসাহে তাহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইল। ও-তরফের কর্ম্মচারীরা ভিতরে-ভিতরে ষড়যন্ত্র করিয়া, দুই-চারিজন শক্তিশালী গুঁণ্ডে গোছের প্রজাকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিবার চেষ্টায় লাগিয়াছিল; কিন্তু এ-তরফে, দুর্দ্দান্ত অনুরক্ত ডানপিটের দল, উত্তেজিত হইয়া, ও-তরফের শাসন-কর্ত্তাদের শাসাইয়া বলিল, "খবর্দার! মুণ্ড ট্যানে ছিঁড়ে ফেল্‌ব! দু-আনির মজুর—দু আনির মত থাক!"

চৌদ্দআনার তরফের লোকেরা, দুআনার তরফের শাসনকর্ত্তাদের নূতন নামকরণ করিল—"দু-আনির মজুর!"

যোলআনার মধ্যে চৌদ্দআনা বিষয়ের প্রভুত্ব হঠাৎ হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায়, ও-পক্ষের লোকেরা বড়ই ক্ষীণ-বল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকাশ্য বিদ্রোহে বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া, গোপন-যোগ-সাজসে ইহাদের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হইল না,—উল্টা বেশী করিয়া প্রজাদের বিরক্তিভাজন হইল।

প্রজারা বশীভূত হইল, নিরাপদে খাজনা আদায় হইতে লাগিল। কোন দিকে কোন গোলযোগের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, মিত্র মহাশয়ের অনুমতি লইয়া সুনীল কলিকাতা চলিয়া গেল। মিত্র মহাশয় আরো দিনকতক রহিলেন। তার পর সকল দিকে পরিপূর্ণ সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া, মিছামিছি কায কামাই করিয়া এখানে "সাক্ষী গোপাল" সাজিয়া বসিয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া, খাজনার আদায়ী টাকা লইয়া মণ্ডল মহাশয় সমভিব্যাহারে তিনি তিনি তেজপুরে ফিরিয়া গেলেন। তখনো অনেক খুচরা খাজনা আদায় বাকী,—কাযেই ফৈজু যাইতে পারিল না। আর ফৈজু যদি গেল না, তবে শ্যামলই বা কেমন করিয়া যায়? ফৈজুকে ছাড়িয়া যাইতে সে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না।

মিত্র মহাশয় চলিয়া যাইবার পর, একদিন নিভৃতে বসিয়া সযত্নে আঁকা-বাঁকা ছন্দে, তালব্য শ'এ, দন্ত্য স'এ' গাই-বাছুরের আকারে অক্ষর সাজাইয়া সুমতি দেবীকে "ভক্তি পুরঃসর প্রণাম নিবেদনে" শ্যামল জানাইল যে এখানে ফৈজু মামুর কাছে সে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, কোন কিছু দুষ্টামী করে না, মন দিয়া জমিদারী সেরেস্তায় কায শিখিতেছে, তাহার রান্না খাইয়া এখানকার সকলে খুব 'তারিফ্' করে। তাছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ফৈজু, এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল হরু সর্দ্দারের কাছে তাহাকে লাঠিখেলা শিখিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়াছে, ফৈজু নিজেও খুব লাঠি খেলিয়া থাকে। হরু সর্দ্দার ফৈজুকে

খুব ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, শীঘ্রই সে পূর্ব্ব-প্রভুর চাকরী ছাড়িয়া এখানকার স্টেটে আসিয়া নন্দীর কাজে বাহাল হইবে স্বীকার করিয়াছে। এখানে খুব আম হইয়াছে; সেখানে এ বছর আম-কাঁঠাল কেমন হইয়াছে?......... ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য বিচিত্র সংবাদের পর, সকলের কুশল প্রার্থনা করিয়া প্রণাম জানাইয়া পত্র শেষ করিল। তার পর ঠিকানা লিখিয়া চিঠিখানি ডাকে ফেলিবার পূর্ব্বে, হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায়, পুনশ্চ নিবেদনে 'দিদিমাকে প্রণাম' জানাইয়া অনেক কষ্টে ভাবিয়া-চিন্তিয়া 'মেজুর মা'কেও প্রণাম জ্ঞাপন করিল।

দিন দশ পরে পত্রের উত্তর আসিল। সুমতি দেবী লিখিয়াছেন, 'ফৈজুর কায শেষ হইলে উভয়ে যত শীঘ্র পারে যেন তেজপুরে ফিরে।'—আম-কাঁঠালের কোন সংবাদই তিনি লেখেন নাই দেখিয়া শ্যামল ভারী ক্ষুণ্ণ হইল।

পুরা দুই মাসের অবিশ্রাম চেষ্টায় ফৈজুর কায তখন অনেকটা শেষ হইয়া গিয়াছিল,—আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই সে বাকীটুকু গুছাইয়া লইবে। বাড়ীর জন্য প্রাণ ছটফট করিতেছে। সহস্র কর্ম্ম-কোলাহলে ডুবিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া কায করিতে-করিতে,—এক-এক সময় মনটা সমস্ত বাঁধন কাটিয়া কোথায় যে ছুটিয়া উধাও হইত, তাহার খোঁজ পাওয়া যাইত না। সুমতি দেবীর অনুমতি-পত্র পাইয়া, ফৈজু শেষ কাযটুকু গুছাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময় এক অভাবনীয় বিঘ্ন ঘটিল! যাত্রার দিন প্রাতঃকালে গ্রামের দুইজন মাতব্বর প্রজা আসিয়া সংবাদ দিল যে, সঙ্কটপুরের সেজ বাবুর খাস কর্ম্মচারী হরিহর খাজনার টাকা লইয়া যাইবার জন্য সম্প্রতি জয়দেবপুরে আসিয়াছিল। তার পর চিরাভ্যস্ত দুশ্চরিত্রতা বশে, পাশের গ্রামে কোন এক নাপিত রমণীর উপর অবৈধ অত্যাচার করিতে উদ্যত হওয়ায়, সেখানকার লোকেরা পর্শু রাত্রে তাহাকে ধরিয়া প্রহার দিয়াছে। রাগের মাথায় একজন হরিহরের কপালে কাটারির এক চোট বসাইয়াছিল, আঘাতটা সাংঘাতিক হইলেও রক্ষা ছিল না; কিন্তু হরিহরের পিতৃপুণ্য-বলে সেটা অল্পই হইয়াছিল। হরিহর রাতারাতি সঙ্কটপুরে পলায়ন করে। সেখানে সুপণ্ডিত প্রভু সেজবাবু চক্ষের নিমেষে জাল সাক্ষী যোগাড় করিয়া, হরিহরের কপালে সেই কাটারির দাগে দাগ মিলাইয়া আরো একটা ভালরকম চোট বসাইয়া, প্রচুর রক্তপাতের পর অজ্ঞান অবস্থায় হরিহরকে সহরের হাসপাতালে দাখিল করিয়াছেন। সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়াছে যে, জয়দেবপুরের চোদ্দআনা তরফের প্রজারা, একটা জল নিকাশী নালার স্বত্ব জবরদস্ত ভাবে দখল করিতে গিয়াছিল। হরিহর নিজের প্রভুর স্বত্ব রক্ষার জন্য আইনসঙ্গত ভাবে বাধা দিতে গিয়াছিল। ফলে প্রজারা তাহাকে প্রহারের চোটে মরণাপন্ন করিয়া ফেলিয়াছে...... ...ইত্যাদি।

উধোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে চড়িয়া, ফৈজুর বাড়ী যাওয়ার পথে অলঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিল দেখিয়া, ত্যক্ত-বিরক্ত-চিত্তে ফৈজু একবার ভাবিল, "চুলায় যাক্ প্রজাদের মামলা ফ্যাসাদ,—সে তো সুমতি দেবীর আদেশ পাইয়াছে,—চোখ বুজিয়া এখন নিজের পথে চম্পট দিক্—" কিন্তু তখনি মনে পড়িল, ফৈজুর সেইটুকু হঠকারিতার ফলে, অনেকগুলি নিরপরাধ প্রজার সর্ব্বনাশের সঙ্গে সুমতি দেবীর সমূহ ক্ষতি হইয়া যাইবে। ফৈজুকে বিশ্বাস করিয়া তিনি যে গুরু দায়িত্বের ভার দিয়াছেন,—যে দায়িত্ব বহনের জন্য, ফৈজু বুক ঠুকিয়া সমস্ত ক্ষতি সহিতে স্বীকৃত হইয়াছে,—সে বিশ্বাসের সম্মান রক্ষা হইবে না! ইহার কাছে স্ত্রীর চিন্তা, ধিক্!

মনের সমস্ত দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া ফৈজু আপনাকে কঠিন করিয়া তুলিল। শ্যামল যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া তল্পী-তল্পা বাঁধিতেছিল, ফৈজু আদেশ দিল, "থাক্, এখন নয়—"

মামলা বাধিল। ফৈজুর যত্ন ও চেষ্টায় পাশের গ্রামের লোকেরা সত্য সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইল। তাহাদের জমিদার একজন সদাশয় মুসলমান ভদ্রলোক। নানা কারণে তিনি বহুদিন হইতে সঙ্কটপুরের বাবুদের উপর হাড়ে চটিয়া-ছিলেন। এবার এই তুচ্ছ কেলেঙ্কারী ব্যাপার লইয়া, তাঁহাদের ধৃষ্টতা প্রকাশের স্পর্দ্ধা দেখিয়া, মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইয়া উঠিলেন। ব্যক্তিগত কলঙ্ক-জনক ব্যাপার বলিয়া, নিজে প্রকাশ্য ভাবে ইহাতে যোগ দিলেন না, কিন্তু এ ব্যাপারে সংসৃষ্ট প্রজাদের গোপনে অর্থসাহায্য করিয়া বিধিমতে লড়িবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

এই সূত্রে ফৈজুর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। জমিদার সাহেবের অনুগ্রহে ফৈজুর সকল কাজেই

সুবিধা ঘটিল। যথাসময়ে অনেক কাঠ-খড় পোড়াইয়া মামলা শেষ হইল। মিথ্যা মামলা ফাঁসিয়া গেল, সত্য প্রকাশ হইল। হরিহর সাত বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।—কিন্তু সেজ-বাবুর চাতুরী-বলে সে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িল! পুলিশ গ্রামে-গ্রামে তাহার সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল!

এই সব গোলমালে আরো প্রায় দুই মাস কাটিল। এইবার ফৈজু নিশ্চিন্ত হইয়া, টাকা-কড়ি ও জিনিস-পত্র গুছাইয়া তেজপুর রওনা হইবার উদ্যোগ করিল।

পরদিন প্রভাতে গো-যানে যাত্রা করিবার সমস্ত ঠিক-ঠাক,—বৈকালে সুমতি দেবীর এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল,—শ্যামলকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া সংক্ষেপেই তিনি লিখিয়াছেন যে, "ফৈজুর স্ত্রী পীড়িত, ফৈজু যেন শীঘ্র বাড়ী ফিরিবার চেষ্টা করে।"

এইবার ফৈজুর মাথা ঘুরিয়া গেল! অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চিঠিখানার দিকে চাহিয়া, খানিকক্ষণ হতবুদ্ধির মত নির্ব্বাক্ হইয়া সে বসিয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল, শ্যামল সাঙ্গোপাঙ্গে আসিয়া লাঠি খেলিতে যাইবার জন্য ডাকিল; শরীর ভাল নাই বলিয়া ফৈজু তাহাকে বিদায় দিয়া শুইয়া পড়িল। ক্ষুধাতৃষ্ণা অকস্মাৎ কোথায় উড়িয়া গিয়াছিল, রাত্রে জলস্পর্শ করিতেও প্রবৃত্তি হইল না; নিঝুম মারিয়া বিছানায় পড়িয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতে লাগিল।

রাত্রি দশটার পর প্রৌঢ় 'হরু সর্দ্দার' আহারাদি করিয়া কাছারী-বাড়ীতে শুইতে আসিল। হরু সর্দ্দার এখন ফৈজুর প্রধান লাঠিয়াল হইয়াছে। অন্য নগ্‌দী দুই জন তাহার অধীনে থাকে। হরু সর্দ্দার শুইতে আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল,—তত রাত্রে ফৈজু কাছারীর অন্ধকার রোয়াকে বিমর্ষ—চিন্তাকুল বদনে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছে।

হরু সর্দ্দার নানারূপে ফৈজুর কাছে অনেকবার উপকার পাইয়া বড়ই কৃতজ্ঞ ছিল। তার উপর, ফৈজুর শিষ্ট সদ্ব্যবহারের গুণে,—হরু সর্দ্দার তাহাকে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী বলিয়া যেমনি সম্মান করিত, পুত্রের মতন তেমনি স্নেহও করিত। মূর্খ নিরক্ষর হইলেও লোকটা বয়সে বড়, ফৈজুর চেয়ে 'মানুষ চিনিবার' ক্ষমতা তাহার ঢের বেশী,—সেইজন্য ফৈজু অনেক বিষয়েই সর্দ্দারের পরামর্শ ও মতামত জানিয়া কায করিত;—অধীনস্থ বলিয়া অবজ্ঞা করিত না।

ফৈজুর ব্যবহারের গুণে এই প্রৌঢ়ের মধ্যে এমন একটু অল্প দিনের মধ্যেই জোর জমিয়াছিল, যাহাতে সময়ে-সময়ে সে 'গায়ে পড়িয়াও' তাহার কাছে অনেক বিষয়ের সন্ধান লইত; আজও লইল! ফৈজুর মুখপানে চাহিয়া বিস্ময়ে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "শ্যামল ঠাকুর বল্লে, তোমার শরীর খারাপ হয়েছে। হাঁ বেটা, এ কি ঠিক খবর?"

ফৈজু দাঁড়াইল। বিবর্ণ মুখে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "না সর্দ্দার, আমার মনের ঠিক নাই আজ। বাড়ীতে অসুখের খবর পেয়ে আমার ভারী মন খারাপ হয়ে গেছে।"

কাহার অসুখ, কি অসুখ, কখন সংবাদ আসিল, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর জানিয়া সহানুভূতি-করুণ কণ্ঠে সর্দ্দার বলিল, "তাই তো বাবা, তুমি এমন ছটফট্ করছ,—বিকালে যদি একবার বল্‌তে আমায়, তা'হলে আমি তখুনি গাড়ী এনে তোমায় রওনা করে দিতুম,—এতক্ষণে কত রাস্তা চ'লে যেতে!"

উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল স্বরে ফৈজু বলিল, "সর্দ্দার, আমার মাথার ঠিক ছিল না,—না হলে আমি টাকা নিয়ে তখন যদি পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়তুম, তা হ'লে এই চৌদ্দ ক্রোশ পথ রাতারাতি পার হয়ে যেতুম যে!" একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল, "আমি এখুনি বেরিয়ে পড়তাম সর্দ্দার! কিন্তু সঙ্গে টাকা রয়েছে যে! অন্ততঃ রাত্রের রাস্তাটা পর্য্যন্ত সঙ্গে একজন লোক যদি পাই—"ফৈজু একটু থামিয়া আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে সর্দ্দারের মুখপানে চাহিল!

প্রৌঢ় সর্দ্দারের শরীরের শোণিত আজ শীতল হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু যৌবনের সকল-বাধা-অগ্রাহ্যকারী দৃঢ় উদ্যমের উষ্ণ উত্তেজনা একদিন সে শোণিত-প্রবাহে খর-স্রোতে বহিয়াছিল;—আজ এই উদ্বেগ-বিবর্ণ যুবার মুখপানে চাহিয়া সে কথা সর্দ্দারের মনে পড়িল! মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সর্দ্দার ধীরকণ্ঠে কহিল, "তুমি এখনি বেরিয়ে পড়বে? আচ্ছা চল, আমি হরিদাসকে শুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে, লাঠি-লণ্ঠন নিয়ে তোমার সঙ্গে যাচ্ছি!"

ফৈজুর সমস্ত বুকটা উদ্বেগে তোলপাড় হইয়া যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল! নিতান্ত অস্থির চিত্তেই হঠাৎ সে এই দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছিল! আশঙ্কিত

তাকিয়া দেখিবার সময় প্রায় নাই। এখন হরু সর্দারকে সহায় পাইয়া সে আর কোন দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতে চাহিল না। ব্যাগের মধ্যে টাকাগুলি গুছাইয়া লইয়া একবস্ত্রে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিল।

শ্যামল ঘুমাইতেছিল, তাহাকে জাগাইল না। কথা স্থির হইল, সর্দার ফৈজুকে কতকদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে। তারপর পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে আগামী কল্য প্রভাতে গোযানে জিনিসপত্র লইয়া শ্যামলকে সঙ্গে করিয়া তেজপুর যাইবে।

শ্যামলের যাহাতে কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, সেজন্য পুনঃপুনঃ হরু সর্দারকে সতর্ক করিয়া ফৈজু দ্রুত চলিল।

— —

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বেলা তখন আটটা বাজিয়াছে।

আহ্নিক সারিয়া সুমতি দেবী তখন রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া, এক বোঝা নারিকেল পাতা লইয়া, বঁটিতে চাঁচিয়া, পিসিমার আলোচালের মুড়ির খোলার জন্য কুঁচি তৈয়ারী করিতেছিলেন, এমন সময়ে রুক্ষ-বিশৃঙ্খলতার জীবন্ত প্রতি-মূর্ত্তির মত—দুশ্চিন্তা-মলিন, অনিদ্রা-শুষ্ক মুখে, অবসাদ-ক্লান্ত চরণে ফৈজু বাড়ী ঢুকিয়া, অভিবাদন করিয়া সামনে দাঁড়াইল। সুমতি দেবী ফৈজুর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমটা অবাক্ হইয়া গেলেন; তার পর সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি কি আমার চিঠি পেয়ে হঠাৎ চলে এলে?"

প্রাণপণ বেগে উর্দ্ধশ্বাসে এতখানি পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া ফৈজুর ঠোঁট দুইটা শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল! অতি কষ্টে ঠোঁট খুলিয়া, নিঃশ্বাস টানিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া, জড়িত স্বরে বলিল, "না,—আজই আমাদের আসবার সব ঠিক ছিল। শ্যামলকে নিয়ে হরুসর্দার আসছে,—আমি শুধু টাকা নিয়ে আগেই চলে এলুম।"

ফৈজুর মুখপানে চাহিয়া সুমতি দেবী ধীরকণ্ঠে বলিলেন "আমার চিঠি পাও নি?"

হাতের ব্যাগটা রান্নাঘরে রাখিয়া, থামের গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া, কপালের ঘাম মুছিতে-মুছিতে ফৈজু বলিল, "পেয়েছি, কাল বিকালে।"

ঈষৎ অনুতপ্ত স্বরে সুমতি দেবী বলিলেন, "তোমরা এত শীগ্রী আসবে জানলে আমি কখনই চিঠি লিখতাম না। দূরে থেকে অসুখের খবর শুনলে বড় ভয় হয়,—যাক, বাড়ীতে গিয়ে দেখা করে এসেছ?"

নত দৃষ্টিতে চাহিয়াই ফৈজু বলিল, "না, টাকাগুলো এখানে জমা করে দিয়ে যাব বলে, প্রথমেই আপনার কাছে এসেছি।"

স্নেহময় ভৎসনার স্বরে সুমতি দেবী বলিলেন, "সেটা তো পালাচ্ছিল না ফৈজু! কেন এত তাড়া? থাক, ব্যাগ ওইখানেই রেখে যাও,—এরপর এসে তুমি তোমার টাকা নিয়ে বোঝা-পড়া কোরো, এখন বাড়ী যাও।"

ফৈজু মাটীর দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া,—অলক্ষিতে তাহার মুখপানে ব্যথিত-করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সুমতি দেবী স্নেহময় আশ্বাসের স্বরে আবার বলিলেন, "ভাল হয়ে যাবে, ভাবনা কি? ছেলে-মানুষ, অনেক দিন মা-বাপের কাছ-ছাড়া হয়ে রয়েছে, বোধ হয় বেশী মন-টন কেমন করত, তাই ভেবে-ভেবে একটা অসুখ বাধিয়েছে। বেচারা একটু কাহিল হয়ে পড়েছে, এই যা,—যাই হোক, তুমি এখন বাড়ী যাও।—আমার ভূত কখন আসবে বল দেখি?"

সুমতি দেবীর প্রত্যেক সান্ত্বনা-কোমল কথাটিতে বোধ হইল যেন ফৈজুর বুকের উপর হইতে এক-একখানা ভারী পাথর নামিয়া গেল! এতক্ষণের পর হাল্কা হইয়া সহজ ভাবে একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল, "রাত্রি নটা-দশটার কম আপনার ভূত বোধ হয় এসে পৌছুতে পারবে না। গরুর গাড়ীর চলন কি না,—তাহলে আমি এখন আসি।"

সুমতি দেবী বলিলেন, "এস। তুমি কাল কখন বেরিয়েছিলে?"

এ প্রশ্নটার জন্য কাল রাত্রে ফৈজু বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা অনুভব করে নাই; কিন্তু আজ দিনের আলোয় সহসা অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ হইল। ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "রাত্রি দশটার পর।"

সুমতি দেবী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ভারী দুঃসাহসের কাজ হয়েছে! আচ্ছা, এখন যাও।"

প্রস্থানোদ্যত হইয়া ফৈজু সবিনয়ে বলিল, "পিসিমা ওপরে আছেন বোধ হয়, আমার সেলাম দেবেন। একটু পরে আস্‌ছি।"

ব্যস্ত হইয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "এখন তাড়াতাড়ি করে আসবার কিছু দরকার নাই ফৈজু,—এখন আমার সময় নাই, তুমি ও-বেলা এস।"

সুমতি দেবীর এই উক্তিটুকুর মূলে যে কি নিগূঢ় স্নেহ-করুণা সঞ্চিত ছিল, ফৈজু তাহা অন্তরে-অন্তরে অনুভব করিল,—কৃতজ্ঞতাভারে তাহার বেদনা-বিমর্ষ হৃদয়টা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সসম্ভ্রমে নত হইয়া অভিবাদন করিয়া ফৈজু নিঃশব্দে চলিয়া গেল—একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না।

নিজের বাড়ীতে আসিয়া চৌকাট ডিঙাইয়া বাড়ী ঢুকিতে ফৈজুর যেন পা কাঁপিতে লাগিল। এখনই বাড়ী ঢুকিয়া—টিয়ার অসুস্থ মূর্ত্তি চোখে পড়িবে,—বড়ই ভয় হইতে লাগিল। অবসাদে শরীর যেন ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। ক্লান্ত পা-ত্বখানাকে অতি কষ্টে টানিয়া, দুয়ার ঠেলিয়া বাড়ী ঢুকিতেই, একটী ছোট মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। ফৈজু চিনিল সে নানীর নাৎনী হালিমা। শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "কিরে, বাড়ীর সব ভাল আছে?"

ফৈজু জিজ্ঞাসা করিল তাহাদের—হালিমাদের বাড়ীর কথা; কিন্তু সে উল্টা অর্থ বুঝিয়া—টিয়ার কথা মনে করিয়া, উত্তর দিল, "ভাল আছে,—এখন ঘুমুচ্ছে—ঐ ঘরে।"

এত উৎকণ্ঠার মাঝেও—সরলা বালিকার এই সুমিষ্ট সরলতায় ফৈজু স্নিগ্ধ হইল! একটু হাসিয়া তাহার মাথাটা ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "না রে, না—তোদের বাড়ীর খবর জানতে চাইছি। নানী ভাল আছে? তোমার মা?"

"ভাল আছে সবাই—"

"খলিফা কোথায়?"

"আমায় এখানে বসিয়ে রেখে পুকুরে গেছে। তুমি এখন বাড়ীতে থাক্‌বে ফৈজু দাদা?"

শুষ্ক মুখে আবার একটু হাসি টানিয়া ফৈজু বলিল, "কেন, খেল্‌তে যাবে বুঝি? আচ্ছা যাও।"

মুক্তি পাইয়া,—এক লাফে চৌকাঠ ডিঙ্গাইয়া মেয়েটি দ্রুত অন্তর্ধান করিল। ফৈজু বারেণ্ডায় একপাশে জুতা ছাড়িয়া, নিঃশব্দ-পদে ঘরে ঢুকিল।

পাণ্ডু-বিবর্ণ মুখখানির দু'পাশে দু'খানি হাত রাখিয়া, দুয়ারের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া, টিয়া তখন অগাধে ঘুমাইতেছিল। তাহার মুখপানে চাহিয়া ফৈজুর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল! অবসন্নভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া, স্তম্ভিত নিষ্পলক নয়নে সে চাহিয়াই রহিল!

দুর্ব্বল রুগ্নের শ্রান্তির নিদ্রা,—অল্পক্ষণেই সে নিদ্রা আপনি ভাঙ্গিয়া গেল। যন্ত্রণা-কাতর অস্ফুট শব্দ করিয়া—অন্যদিকে পাশ ফিরিতে গিয়া সহসা ফৈজুর উপর দৃষ্টি পড়িতেই—সে চমকিয়া উঠিল! বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া থাকিয়া—ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—"তুমি! সরে এস।"

টিয়া নিজের দুর্ব্বল কম্পিত হাতখানি বাড়াইয়া দিল। ফৈজু দু' হাতে সে হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া, পাশে গিয়া বসিল। আভ্যন্তরিক উদ্বেগ-পেষণে তাহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল,—চেষ্টা করিয়াও সে কোন কথা কহিতে পারিল না,—অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল!

বিষণ্ণ মুখে একটু ক্ষীণ হাসিয়া টিয়া বলিল, "রাত্রে জ্বরের যাতনায় ভাল ঘুম হয়নি, এখন তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কখন এসেছ, কিছু টের পাইনি,—কখন এলে?"

কণ্ঠ ঝাড়িয়া ফৈজু বলিল, "এই আস্‌ছি।" তার পর টিয়ার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া, বেদনা-মথিত স্বরে বলিল, "কি এ হয়ে গেছ বল দেখি?"

স্বামীর মুখপানে চাহিয়া টিয়া একটু হাসিল। তার পর শ্রান্ত ভাবে চোখ মুদিয়া মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া,—স্বভাব-সিদ্ধ পরিহাস-স্নিগ্ধ কণ্ঠে চোক বুজিয়াই উত্তর দিল, "এই ঠিক হয়েছে, না? ভাল থাকলে মোটেই তোয়াক্কা রাখ না, চোক বুজে এড়িয়ে চল তো,—তার চেয়ে মাঝে-মাঝে অসুখ হ'লে একটু-একটু ভাবনা-চিন্তে মনে পড়বে, সেই ভাল।"

এই ন্যায্য-প্রাপ্য অনুযোগের আঘাতটুকুর জন্য ফৈজু অনেক দিন হইতেই মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু আজ এই অপ্রত্যাশিত দুঃখ-দুর্য্যোগের মাঝে এ আঘাত পাইয়া সহসা তাহার আশাতীত আনন্দবোধ হইল। টিয়া যে এমন করিয়া কথা কহিতে পারিবে, তাহা তো সে আশাই করে নাই! বুকভরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া

হাসিমুখে বলিল, "বল, বল, বলে নাও! যা মনে পড়ে, যা মুখে আসে, সব বল,—আমার তো কসুর হয়েই আছে; তুমিই বা মাপ্ করে চল্‌বে কেন? বল, আর কি বল্‌বে?"

সকরুণ ভাবে হাসিয়া টিয়া বলিল, "বল্‌বার এখন অনেক-কিছুই আছে, কিন্তু কি করবো বল, কথা কইতে ভারি কষ্ট হচ্ছে, কিছুই বল্‌তে পারছি না। খোদা আমায় মেরে রেখেছেন, তোমারি এখন সুবিধা! যাও, ওঠো এখন, হাত-মুখে জল দাও, তোমায় ভারী শুকনো দেখাচ্ছে —চেহারা এমন কালি মেরে গেছে কেন বল দেখি?"

ফৈজু একটু হাসিয়া বলিল, "আমার খুসী"!

স্বামীর হাঁটুতে মৃদু আঘাত করিয়া টিয়া হাসিমুখে বলিল, "আমার ওপর রাগ করে চুটিয়ে শোধ নেবার চেষ্টা বুঝি?—"কথাটা বলিতে-বলিতে, সহসা হাঁপাইয়া, নিঃশ্বাস টানিয়া, ব্যগ্র ভাবে ফৈজুর হাত দুইটা নিকটে টানিয়া লইয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "আমায় এবার তুমি বড্ড ভাবিয়েছ,—বড্ড বেশী! দেড় মাসের নাম করে গিয়ে তুমি—উঃ! শেষ ক'-দিন বড্ড বেশী রকম মন খারাপ হয়েই, বোধ হয় এই অসুখটা ধরে গেল; রাত্রে ঘুমুতে পারতুম্ না, আমার এত ভাবনা হোত—"কথা কয়টা বলিয়াই, হঠাৎ অপ্রস্তুত ভাবে থামিয়া, একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি ওঠো, আর বেশী কথা শুন্‌লেই তোমার রাগ হবে। যাও, হাত-মুখ ধোওগে।"

"যাচ্ছি—"বলিয়া ফৈজু বিমর্ষভাবে অন্য দিকে চাহিয়া খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। তার পরে মৃদুস্বরে বলিল, "শুধু জ্বর? না আর কিছু উপসর্গ আছে? ক'দিন থেকে এ রকম হয়েছে?—"

ব্যস্ত চঞ্চল হইয়া টিয়া বলিল, "তুমি উঠে যাও এখন, ডাক্তার আস্‌বার সময় হয়েছে।"

ফৈজু বলিল, "কোন্ ডাক্তার দেখ্‌ছে?"

টিয়া পাশের গ্রামের একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ডাক্তারের নামোল্লেখ করিল। পরক্ষণেই উৎকর্ণ হইয়া বাহিরের দিকে কাণ পাতিয়া—সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "ঐ ওঁরা এসেছেন,—তুমি উঠে যাও।"

ফৈজু উঠিতে যাইতেছিল, টিয়া বাধা দিয়া বলিল, "দাঁড়াও, আমাকে একটুখানি ধরে বসিয়ে দাও তো!"

ইতস্ততঃ করিয়া ফৈজু বলিল, "কেন কষ্ট পাবে? শুয়েই থাক না, আমি না হয় চলে যাচ্ছি।" ব্যগ্র-মিনতির স্বরে টিয়া বলিল "না—না, তোমায় যেতে হবে না, তুমি আমায় বসিয়ে দাও।"

বেশী বাদানুবাদের সময় ছিল না,—বোধ হয় শক্তিও ছিল না। ফৈজু হেঁট হইয়া সযত্নে স্ত্রীকে তুলিয়া বসাইল। গভীর ক্লান্তি-দৌর্ব্বল্যের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, স্বামীর বিষণ্ণ মুখ-পানে চাহিয়া, একটু সহজ ভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া টিয়া বলিল "রোগে মানুষকে কি জব্দই করে! নিজের হাত-পায়ের জোর শুদ্ধ বেদখল!—"

এতক্ষণ যে মনস্তাপ-পীড়নটা ফৈজু মনে-মনেই গোপন-অনুশোচনায় ভোগ করিতেছিল, এবার আর সেটা চাপিয়া রাখিতে পারিল না। উগ্র ক্ষোভে অধীর হইয়া অকস্মাৎ তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমারই আহাম্মকী! কি যে কুবুদ্ধি হোল,—কেনই যে অত জেদ্ করে তোমায় থাক্‌তে বলে গেলুম,—এগ্নি আপ্‌শোষ্ হচ্ছে আজ আমার—"

ব্যাকুল ভাবে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া, অনুনয়-কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া, কম্পিত স্বরে টিয়া বলিল, "না—না, তুমি তা মনে কোর না; তুমি নিজের ঘাড়ে সব দোষ টেনে নিও না। আমি তো নিজেই ইচ্ছা করে ছিলুম,—" তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। একটু থামিয়া, আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া, দৃষ্টি নামাইয়া—মৃদু স্বরে বলিল—"অসুখ যখন হবার হয়, আপনিই হয়,—কারুর দোষ নাই, ও সব খোদার মর্জ্জি!"

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এ কথাটা কাহারো মুখে শুনিলে, ফৈজু সরল চিত্তে, অকপট শ্রদ্ধায় মানিয়া লইতে পারিত; কিন্তু আজ পারিল না। সংসারের সহিত ইতিমধ্যে যেটুকু পরিচয় হইয়াছে, সেইটুকুর মধ্যেই—নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে অনেকগুলা শক্ত ঘা খাইয়া, অনেক রকম দেখিয়া, শুনিয়া—আজ তাহার আহত মনের মধ্যে কঠিন সত্যের তীব্র অভিজ্ঞতা জাজ্জ্বল্যমান!—অপর-সাধারণের মত আজ সে নিজের মূর্খতা-সৃষ্ট দুঃখকে 'খোদার মর্জ্জির' ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিজেকে নিষ্কৃতি দিতে কিছুতেই রাজী হইল না। ভিতরে-ভিতরে নিজেকে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনায় পীড়িত করিবার জন্য ফৈজুর সমস্ত হৃদয় উগ্র-বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কতকগুলা উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার বিপর্য্যয় আলোড়নে মস্তিষ্ক

যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। অধীর ভাবে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্খলিত চরণে সে বাহিরে চলিয়া আসিল।

চিকিৎসককে লইয়া পিতা তখন বারেণ্ডায় ঢুকিতেছিলেন,—ফৈজু নতশিরে অভিবাদন করিল। পিতা সবিস্ময়ে বলিলেন "একি ? কতক্ষণ ?"—পরক্ষণেই গভীর স্নেহে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া, ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন, "এমন শুকিয়ে গেছিস কেন বাপ্ ?"

ফৈজু অস্ফুট স্বরে কি একটা কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিল,—পিতার কাণে তাহা ঢুকিল না। বৃদ্ধ চিকিৎসক মহাশয় তৎক্ষণে অগ্রসর হইয়া, সস্মিত মুখে বলিলেন,—"এই ছেলে? বেশ,—বেশ! কি গো বাবা, বৌমা এখন কেমন আছেন ?"

ফৈজু কি যে উত্তর দিবে, কিছু খুঁজিয়া পাইল না। মাথা হেঁট করিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল। পিতা পুত্রকে চিনিতেন,—কাজেই পুত্রের পরিবর্ত্তে তিনিই উত্তর দিলেন; বলিলেন, "আপনিই দেখবেন আসুন।"

চিকিৎসক মহাশয় প্রবীণ বিজ্ঞ হইলেও, বিজ্ঞতার দম্ভে পেচক-লাঞ্ছিত গাম্ভীর্য্য-আড়ম্বরের বিরাট্ মহিমা তাঁহার মুখে-চোখে, চাল-চলনে আদৌ প্রকাশ পাইত না। মানুষটিকে দেখিলেই বেশ অমায়িক স্নেহশীল প্রকৃতির বলিয়া বুঝা যাইত। ফৈজুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষক্ষেপ করিয়া, চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়া—যেন আপন মনেই, সমবেদনাপূর্ণ স্বরে তিনি বলিলেন, "এই সব ছেলেমানুষ,—অল্প বয়েসে বিয়ে, অল্প বয়সে ছেলে মেয়ের বাপ-মা হওয়া—রোগ-দুঃখের ভাবনা-চিন্তায় বেচারীরা কি ঝঞ্ঝাটই ভোগ করে!"—তার পর ফৈজুর পিতার দিকে চাহিয়া দুঃখ-ব্যথিত তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "তুমি নাতীর প্রাণের জন্য ব্যস্ত হচ্ছ সর্দ্দার! কিন্তু নিজের ছেলের মুখপানে একবার চেয়ে দেখো দেখি!"

ফৈজুর পিতা নিজের নসীবের উপর সমস্ত দুঃখের কারণ চাপাইয়া বিষণ্ণ ভাবে কৈফিয়ৎ দিলেন যে, দেশশুদ্ধ সকল ঘরেই বাল্যবিবাহ চলিতেছে,—ফৈজুর মত বয়সের সকল লোকই দুই, চার বা ততোঽধিক সন্তানের পিতা হইতেছে,—ঘরে ঘরে সে নজীরের প্রাচুর্য্য যথেষ্ট; শুধু তাঁহারই দুর্ভাগ্য-বশে,—তাঁহার, সন্তান-সম্ভাবিতা পুত্রবধূর প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে,—এ শুধু তাঁহারই ভাগ্যের দোষ!

বিষয়টা লইয়া দুই বৃদ্ধে আর বেশী কিছু আলোচনা করিলেন না;—অন্য প্রসঙ্গ পাড়িয়া, কথা কহিতেকহিতে ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। ফৈজু দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া, পাংশু-বিবর্ণ মুখে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাথা হইতে ঘাম ঝরিয়া টস্টস করিয়া পায়ের উপর পড়িতে লাগিল।

প্রভুর দান

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

একদা ভুবন-জনবাসিগণে শুধালেন ভগবান,
কামা সবার কহ মোরে আজ, সিদ্ধি করিব দান।
নৃপতি চাহিল—ধন সম্পদ, রাজ্য শান্তিময়,
শত্রু নাশিতে অপার শক্তি, অজেয় সৈন্যচয়।
রাখাল বালক যাচে ধেনু সব দুগ্ধ-সুধায় ভরা,
রমণী চাহিল রূপ-যৌবন, কৃষক ধানের ছড়া।
সবার বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া উঠে যবে ভগবান,
হেন কালে কবি আসে সভা-মাঝে গাহি হরি-গুণ-গান।
প্রভু কহে—সব দেওয়া হল, এবে কি দিব তোমার কবি,
ওহে ধরণীর কৌস্তুভ মণি—ওহে পুণ্যের ছবি!
ললিত বচনে নিবেদিল কবি—'হে মোর দয়াল প্রভু,
দাও মোরে, যাহা কালের চক্রে ধ্বংস হবে না কভু।'
"তাই হোক্ কবি, অক্ষয় প্রেম লও হে হৃদয়-ভরি,
বিশ্বের মহাবান্ধব হও, দুখ্ তার দূর করি।
পঙ্কের মাঝে পঙ্কজ তুমি, উজ্জ্বল ধ্রুবকান্তি,
তুমি রবে যেথা, বিরাজিবে সেথা অমরার মহা শান্তি।
ধরণীর বুকে নন্দন রচি নন্দিত কর সবে,—
তোমার চিত্ত-শতদল-মাঝে আমার আসন হবে।"

মেকি টাকা

[শ্রীসুশীলকুমার রায়]

"আর ত শরীর বয় না।"

যামিনী একখানি চেয়ার টানিয়া ধপাস্ করিয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িল।

কিরণশশী তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা ও কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া টেবিলের উপর রাখিতেই, যামিনী লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "ইস্! এত মিষ্টি, আবার চা! তাই ত বলি, এত খরচ হয় কেন! আমি সমস্ত দিন আফিসে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটে যা উপার্জ্জন ক'রব, তুমি তা এই রকম বাজে খরচে উড়িয়ে দেবে?"

"আজকে একটু সকাল-সকাল এসেছ, তাই তোমায় জলখাবার দিতে গেলাম। আজকের দিনটা খেয়ে নাও, আর দেবো না।"

যামিনী চায়ের পেয়ালাটা একটু দূরে সরাইয়া দিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, "এই খরচের ভয়ে আমি জলখাবারের পাট একরকম উঠিয়ে দিয়েছি। আফিস থেকে এসে দুখানা যা পারি খেয়ে নিই। এ চায়ের নেশা বোধ হয় যতীনের আর তোমার। কালে কালে কতই হবে। আমাদের সময়ে চা কি জিনিস জানতুমই না।"

কিরণ এইবার একটু রাগত স্বরে বলিল, "তুমি না কেনাল অফিসের বড় বাবু? একবাটী চা খেলেই কি তোমার যত টাকা খরচ হ'য়ে যাবে?"

"এখন আর সে দিন নেই গিন্নী,—আর সে দিন নেই। দেখ্‌লে ত, সেদিন সেই হাজারীমল বেটা ষাটটা মেকি টাকা (base coin) পকেটে ফেলে দিয়ে কার্য্যোদ্ধার ক'রে চলে গেল। বেটাকে এখন হাতে পেলে একবার দেখে নিই।"

সে টাকা ত তোমার আর ঘরে পচেনি,—ডাক্তারের ভিজিটে আর রমেনের দক্ষিণের তা প্রায় সাবাড় ক'রে এনেছ। আমারও মুখে আগুন, তাই তোমার পয়সায় আবার বার-বেরতো ক'রতে যাই।"

"কোত্থেকে করি বল। তোমার ত' বার মাসে তের পার্ব্বণ লেগেই আছে। রমেন ছেলে ভাল,—যা দিই তাতেই সন্তুষ্ট। পেশাদার ভট্‌চাযি হ'লে ফর্দ্দর চোটে অস্থির ক'রতো। আর যতীন ছেলেটা,—ওর আলাদা অস্থির,—শরীরটা যেন অসুখের বাসা। আশু ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারিটা ওর পেটের ভেতর পুরতে হ'চ্ছে। এইবার একটা বিয়ে দিয়ে দেখি, যদি ছেলেটার ফাঁড়া, আপদগুলো কেটে যায়।"

"বলি বক্তৃতা সাঙ্গ হ'ল? এদিকে চা যে ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। আজ গলায় কাপড় দিয়ে ঘাট মানছি, এমন বেয়াদবী আর হবে না।"

অগত্যা যামিনী কিছু মিষ্টান্ন উদরস্থ করিয়া, এক চুমুকে চাটুকু নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

"কেন বাবা অমন করছিস্, মাথার যন্ত্রণা কি বড্ড বেশী হ'চ্ছে?" কিরণ ধীরে ধীরে ছেলের শিয়রে বসিয়া পড়িল।

মায়ের হাতখানি উত্তপ্ত কপালের উপর টানিয়া আনিয়া যতীন বলিল, "আর যে যন্ত্রণা সহ্য ক'রতে পারি না মা! এক-একবার মনে হয়,—এ দুঃসহ জীবনটাকে—"

মাতা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "ছি বাবা, অমন কথা কি মুখে আনতে আছে! আমি এখনি রমেনকে ডেকে পাঠাচ্ছি।"

কিরণ বাহিরে গিয়া ভৃত্যকে ডাক্তারের নিকটে পাঠাইয়া দিল, ও রমেনবাবুকে শীঘ্র ডাকিয়া আনিতে বলিল।

যতীনের মাথার যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। কিরণ ক্রমাগত মাথার জলপটি বদলাইয়া নীরবে বাতাস করিতেছিল।

রমেন ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "কি রে যতীন, আবার অসুখে পড়েছিস্! ভাল হ'লে ত' আর কিছু মনে থাকে না।" তাহার পর সে পকেট হইতে একটা অডিকোলনের শিশি বাহির করিয়া খানিকটা একটা বাটিতে ঢালিয়া দিল। পূর্ব্বোক্ত পটিটি তাহাতে ভিজাইয়া কপালে বসাইয়া দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

কিরণ তাড়াতাড়ি এক থাল মিষ্টি ও এক গ্লাস জল আনিয়া বলিল, "নাও ত' বাবা, একটু মিষ্টি খেয়ে জল খাও। আফিসের কাপড়টা পর্য্যন্ত ছাড়নি,—অমনি ছুটে এসেছ। আচ্ছা চাকরী হ'য়েছে।"

রমেন বলিল, "আপনি কেন ব্যস্ত হ'চ্চেন? আমার এখন জল-খাওয়াটা কি বেশী দরকারী হ'ল?"

"আমি ওঁর সঙ্গে অনেক দেশ ঘুরেছি,—কিন্তু তোমার মত এমন পরোপকারী ছেলে দেখিনি। তুমি আফিসে যাচ্ছ, রোগীর সেবা কচ্ছ, সভা-সমিতিতে যোগ দিচ্ছ, আবার সময় বিশেষে পুরুত ঠাকুর সাজো। এত কাজের ভেতরেও তোমার মুখে সর্ব্বদাই হাসি লেগে আছে।"

রমেন ধীরে-ধীরে মাথার পটিটি বদলাইয়া দিয়া, জল-যোগ করিতে-করিতে বলিল, "এখনও' ত' আশু ডাক্তার এলো না। পাঁচটা বেজে গেছে, যামিনী বাবুরও আসবার সময় হ'ল।"

কিরণ রেকাব ও গেলাসটি লইয়া চলিয়া গেল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, "বাবু ও ডাক্তার দুজনেই এসেছেন।" রমেন তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া আশু ডাক্তারকে লইয়া আসিল।

যতীনের মাথার যন্ত্রণা তখন অনেকটা উপশমিত হইয়াছে। রমেন আশু ডাক্তারের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আজ জোড়ে এলে কি রকম?" ঔষধের বাক্স খুলিতে-খুলিতে আশু বলিল, "আমি গাড়ীতে আসছিলাম,—দেখ্‌লাম উনি হেঁটে আসছেন;—তাই তুলে নিলাম।"

ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দুজনেই উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় যামিনী আসিয়া বলিল, "ওহে রমেন, কাল সকালে একবার এসে পাঁজিটা দেখে দিও ত'—ফাল্গুন মাসে কটা বিয়ের দিন আছে;—আর একটা ফর্দ্দও ক'রে দিও। আশুবাবু, আপনার অনুগ্রহের সীমা নেই। ছেলেটাকে কেমন দেখলেন? মনে ক'রছি, আসছে মাসেই ওর বিয়েটা দিয়ে দিই। বুড়ো বয়েসে আর কদিকেই বা ভাবি। রমেন, আমার কথা যেন মনে থাকে বাবা,—আর সময় নেই,—দিল্লীতে তোমরাই আমার বল-ভরসা।"

আশু ও রমেন দুজনেই আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। যামিনী আশু ডাক্তারের পকেটে একটা কাগজের মোড়ক রাখিয়া দিল।

গাড়ী গন্ধনালার দিকে ছুটিয়া চলিল।—আশু ডাক্তার তাহার পকেট হইতে কাগজের মোড়কটি বাহির করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। রমেন বলিল, "কি দেখ্‌ছেন? ও-সব যামিনীবাবুর পেটেণ্ট টাকা বোধ হয়।"

"তাই ত দেখছি। এতগুলো base coin ও জোটালে কোথেকে হে! আমার কাছে ত,'—এইগুলো নিয়ে, প্রায় চুয়াল্লিশ টাকা জমলো।"

"ওকি বল্‌ছেন, আমার কাছেও প্রায় দশ বার টাকা জমেছে। সে দিন একটা ব্রত-প্রতিষ্ঠায়, ওঁর বাড়ী সমস্তদিন আগুন-তাতে খাট্‌লুম,—দিলে ত' দুটাকা দক্ষিণা, তাও ঐ পেটেণ্ট টাকা। এদিকে কিন্তু ব্রত পূজাগুলি কিন্তু সব ঠিক-ঠিক করা চাই।"

"তা ঠিক ক'রেছে। আপনাদের শাস্ত্রেই ত কাণা গরু বামুনকে দান ক'রতে লিখ্‌ছে না? আমি ত বৈদ্য,—আমায় কেন দিচ্চে বুঝতে পারছি না।"

৩

রমেনের বাড়ীতে প্রত্যহ সকালে একটা ছোটরকম মজলিস বসিয়া থাকে। আজ রবিবার, সকালে আশু ডাক্তার, মধু মাষ্টার, নৃপেন প্রভৃতি সকলেই জুটিয়া চা পান ও গল্প-গুজবে আসরটা বেশ সরগরম করিয়া তুলিয়াছে।

নৃপেন চায়ের পেয়ালাটি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, —ওহে, যামিনী বাবুর ছেলের যে আজ বৌভাত। আপনাদের সকলের নেমন্তন্ন হ'য়েছে ত'?"

বসন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "আঃ! তোমার কি অন্য কোনও কথা ছিল না। সকাল বেলাই ঐ নামটা ক'রলে!"

রমেশ টেবিলের উপর চুরুটের ডিস্‌টা রাখিতে-রাখিতে বলিল—"বড় ঘটা হে, বড় ঘটা। এ পাড়াটা সব নেমন্তন্ন ক'রেছে—প্রায় ষাট্‌-সোত্তর জন লোক খাবে।"

মধু মাষ্টার খবরের কাগজটা মুখের উপর হইতে নামাইয়া, রমেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"বল কি হে! একেবারে বাট্‌-সোত্তর!"

রমেন হাসিতে-হাসিতে বলিল,—"খরচ কি ঘর থেকে হবে,—ওসব বৌ-দেখানির টাকাতেই উসুল হ'য়ে আসবে। যামিনীবাবু আমাদের হিসেবে ঠিক আছেন।"

আশু ডাক্তার এতক্ষণ নীরবে কি ভাবিতেছিল; এইবার গম্ভীর ভাবে বলিল,—"দেখুন, আমি ভদ্রলোককে একটু জব্দ ক'রতে চাই;—আপনারা সকলে যদি একমত হন।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"কি রকম?"

আশু ডাক্তার তখন তাঁহার মতলবটা সকলকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল। মধু মাষ্টার হাসিতে-হাসিতে বলিল,—"আপনার এমন বুদ্ধি! আপনি উকীল না হ'য়ে ডাক্তার হ'লেন কেন!"

নৃপেন উৎসাহের সহিত বলিল, "সেই কথাই ঠিক। রমেনবাবু আপনি পাড়ার সকলকে ব'লে দিন যে, আজ বিকালে ক্লবে সকলে জমায়েত হ'য়ে, সেখান থেকে একত্র নিমন্ত্রণে যাওয়া যাবে। আপনারা কি বলেন?"

সকলে উৎসাহের সহিত বলিল "বেশ কথা।"

যামিনী আজ বড় ব্যস্ত। একখানি আট-হস্ত পরিমাণ কাপড় পরিধানে ও গামছা-কাঁধে গৃহকর্ত্তারূপে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। যতীনের কোনই উৎসাহ ছিল না,—সে বৈঠকখানায় একলাটি চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

রাত্রি নয়টার পর সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, যামিনী অতি সমাদরে সকলকে পরিতোষরূপে আহার করাইল।

আহারাদির পর সকলে বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া গল্প-গুজবে পুনরায় আসর সরগরম করিয়া তুলিল। ক্রমে অধিক রাত্রি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রমেন বলিল,—"ওহে, রাত অনেক হ'ল, ওঠা যাক্‌,—কাল আবার আফিস আছে ত'।"

সকলে একবাক্যে রমেনের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিল।

যামিনী তাহার চাকরকে ডাকিয়া বলিল "ওরে হ'রে, সিঁড়িতে একটা আলো দিয়ে যারে,—এঁরা সব বৌ দেখ্‌তে যাবেন।"

আশু ডাক্তার সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে হাসিতে-হাসিতে বলিল,—"কি বাবা, বৌভাতে এসে বৌ-এর মুখ না দেখে পালাবার চেষ্টা! আমাদের যামিনীবাবুর কাছে সেটি হবার যো নেই।"

নৃপেন বলিল "বিলক্ষণ, তাও কি হয়। চলহে সব, বৌ দেখে আসা যাক।"

* * * *

"কত টাকা হ'ল?" যামিনী ঔৎসুক্যপূর্ণ নেত্রে তাহার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল।

"অনেক টাকা হ'য়েছে। এই নাও, যত্ন ক'রে তুলে রাখ"। কিরণ টাকাগুলি মেঝের উপর ঢালিয়া দিল।

"এ কি! অতগুলো টাকা একত্র মেঝের ওপর প'ড়ল, তবু একটা কন্‌কনে আওয়াজ হ'ল না কেন?" বলিয়া যামিনী ব্যগ্র ভাবে টাকাগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল।

কিরণ হাত-মুখ নাড়িয়া শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল—"তোমার টাকা তোমাকেই ফেরত দিয়ে গেছে। ঠিক হয়েছে,—শঠে শাঠ্যং শাস্ত্রের বচন—বুঝলে!"

পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি

পরগণা ও প্রদেশের কর্ম্মচারী এবং দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের পাওনা

[অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম্-এ, পি-আর-এস্]

পাটীলের ন্যায় দেশমুখের আয়ও নিতান্ত মন্দ ছিল না। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বলেন, যে দেশমুখ আদায়ী রাজস্বের শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক পাইতেন। তাঁহার ইনামের পরিমাণও নেহাৎ কম ছিল না; প্রত্যেক ১০০ বিঘার মধ্যে ৫ বিঘা তিনি ইনাম পাইতেন। এতদ্ব্যতীত পাটীলের মত তাঁহারও তৈলিকের নিকট হইতে তেল, চর্ম্মকারের নিকট হইতে জুতা, মুদীর নিকট হইতে সুপারী, বারুইয়ের দোকান হইতে পান প্রভৃতি পাওনা ছিল। এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের মতে ইনাম জমি বা পৈত্রিক পদ অথবা তৎসংক্রান্ত বৃত্তি বিক্রয় বা দানের অথবা বন্ধক রাখিবার ক্ষমতা দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেদিগের ছিল না। বিক্রয় বা বন্ধকের কথা বলিতে পারি না;—কিন্তু কখন-কখনও দেশমুখ যে তাঁহার বৃত্তি অন্য প্রকারে হস্তান্তরিত করিতে পারিতেন, তাহার একটী প্রমাণ আছে। এই প্রমাণ একখানি 'বকশিসনামা'। এই প্রাচীন দলিলখানি শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে তৎসম্পাদিত মারাঠা ইতিহাসের উপাদানের দশম খণ্ডে মুদ্রিত করিয়াছেন। (রাজবাড়ে মারাঠাঞ্চা ইতিহাসাঞ্চি সাধনেঁ, ১০ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এই দলিলে দেখা যায় দেশমুখ গ্রাম-প্রতি ২৲ মাত্র পাইতেন। এই দলীলখানি হইতে দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের মান পান ও হক্কের একটী সাধারণ তালিকা নিয়ে দেওয়া গেল।

১। গ্রাম-প্রতি দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের পুরাতন পাওনা; তন্মধ্যে দেশমুখ ২৲ ও দেশপাণ্ডে ১৲ পাইবেন।

২। সরকারী শিরোপা প্রথমে দেশমুখ ও তৎপরে দেশপাণ্ডে পাইবেন।

৩। 'বতন' সম্বন্ধীয় যাবতীয় দলীলপত্রে দেশমুখ নাম সহি করিবেন ও তাঁহার স্বাক্ষরের পার্শ্বে দেশপাণ্ডের সহি থাকিবে।

৪। সরকারী কর্ম্মচারীকে প্রথমে দেশমুখ তৎপরে দেশপাণ্ডে ভেট দিবেন।

৫। সরকারের নিকট ও অন্যান্য লোকের নিকট হইতে পান প্রথমে দেশমুখ ও তৎপশ্চাতে দেশপাণ্ডে গ্রহণ করিবেন।

৬। দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে বতনের অন্যান্য যাবতীয় মান পান প্রথমে দেশমুখ ও তৎপরে দেশপাণ্ডে পাইবেন।

৭। দেশমুখ বাসগ্রামে একখানি আবাস-বাটী নির্ম্মাণের জন্য একখণ্ড নিষ্কর জমি পাইবেন।

৮। আবাস-পল্লীর ও স্বীয় এলাকার সমস্ত গ্রাম্য বাজার হইতে শাক-সব্জী পাইবেন।

৯। দেশমুখ 'জিরাইত' ও 'বাগাইত' উভয় শ্রেণীর ইনাম জমি ভোগ করিবেন। (যে সকল জমিতে কেবল শস্য উৎপন্ন হইত তাহাকে 'জিরাইত' ও বাগান করিবার উপযোগী জমিকে 'বাগাইত' জমি বলে।)

১০। উৎসবের সময়ে প্রত্যেক গ্রামের মহারগণের নিকট হইতে জ্বালানি কাঠ দেশমুখের প্রাচীন পাওনা।

১১। সংক্রান্তির সময়ে তিল ও প্রত্যেক শ্রাদ্ধে ঘৃত দেশমুখ প্রত্যেক গ্রাম হইতে পাইবেন।

১২। পরগণার কার্য্যের জন্য দেশমুখ ও তাঁহার প্রতিনিধি দুইটী করিয়া ভেট পাঠাইবেন।

১৩। প্রত্যেক গ্রামের ধাঙ্গরগণের নিকট হইতে বার্ষিক একখানি কম্বল দেশমুখের পাওনা।

১৪। প্রত্যেক গ্রামের চর্ম্মকারগণের নিকট হইতে বার্ষিক একযোড়া জুতা দেশমুখের পাওনা।

১৫। 'সাবান' নামক ট্যাক্স প্রত্যেক গ্রাম হইতে দেশমুখ আদায় করিবেন।

১৬। শাহ দবলের মসজিদের ভৃত্যগণ বার্ষিক ৩৲

হিসাবে 'তবকদারী' থাকে। তন্মধ্যে ২৲ দেশমুখের ও ১৲ দেশপাণ্ডের প্রাপ্য।

১৭। প্রত্যেক গ্রামের দেয় খোরাকির ('ভাকরি বাবদ এবজ') টাকা দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে সমানভাবে ভাগ করিয়া লইবেন।

১৮। কলাবন্ত, গোন্ধল, গেরীপদিগকে (গীত বাদ্য করা ইহাদিগের কৌলিক বৃত্তি) প্রথমে দেশমুখ ও তৎপরে দেশপাণ্ডে পারিতোষিক দিবেন।

১৯। অন্যান্য নানাবিধ কার্য্যের নিমিত্ত প্রাপ্য নানাবিধ পারিশ্রমিকের ⅓ দেশপাণ্ডে ও দুই-তৃতীয়াংশ দেশমুখ পাইবেন।

২০। পরগণার কার্য্যসম্পর্কে সরকারে দেয় মধ্যে দেশমুখ দুই-তৃতীয়াংশ ও দেশপাণ্ডে এক তৃতীয়াংশ বহন করিবেন।

এই তালিকায় দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের প্রধান-প্রধান পাওনাগুলির উল্লেখ আছে; ছোট-ছোট পাওনাগুলি অনাবশ্যক বোধে উল্লেখ করা হয় নাই সুতরাং এই একখানি মাত্র দলিলের সাহায্যে সমস্ত পাওনার একখানি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় নাই। তবে মোটের উপর এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের 'বতন বৃত্তিও' পাটীল ও কুলকর্ণীর বতন বৃত্তির অনুরূপ। পাটীল ও কুলকর্ণী যেমন গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে পারিশ্রমিক পাইতেন, সেইরূপ দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেগণের পারিশ্রমিক দিতেন তাঁহাদের নিজ-নিজ পরগণার অধিবাসিবর্গ;—পেশবা-সরকার হইতে কোনও প্রকারের বেতন তাঁহারা পাইতেন না। সুতরাং পরগণার লোকের স্বার্থের সহিত তাঁহাদের স্বার্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

মহারাষ্ট্রে রমণীগণ প্রয়োজন হইলে কখন-কখনও রণক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইতেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহাদের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। প্রথম রাজারামের বিধবা তারাবাই পেশবাদিগের ক্ষমতার উচ্ছেদ সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। উমাবাই দাভাড়ে ও অহল্যাবাই হোলকার এক-একটী রাজখণ্ডের শাসন-কার্য্য কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা দাদার পত্নী আনন্দীবাই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের জন্য ইতিহাসে চিরস্থায়ী অখ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেশপাণ্ডের কাষ স্ত্রীলোকের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া সেকালের মারাঠা পল্লীবৃদ্ধেরা সমীচীন মনে করিতেন না। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সরকার পুরন্দরের একটী পঞ্চায়েতে স্থির হয় যে, "ভবিষ্যতে দেশপাণ্ডে বতন আর কখনও স্ত্রীলোকের নামে রাখা হইবে না।" *

কামাবিসদার ও মামলতদার।

নিজামশাহী ও আদিলশাহী সুলতানদিগের রাজত্বকালে শাসন সৌকার্য্যার্থ সমগ্র মহারাষ্ট্র অন্যান্য মুসলমান-শাসিত প্রদেশের ন্যায় কতকগুলি পরগণা, সরকার ও সুভায় বিভক্ত হয়। শিবাজী এই বিভাগের একটু পরিবর্তন করেন। তাঁহার সময়কার ক্ষুদ্রতম বিভাগ গ্রাম বা

* ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পুণার জনৈক দেশপাণ্ডের বিধবা গিরমাবাই অভিযোগ করেন যে, তাহাদের পরিবারে চারপাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত কাহারও ঔরস পুত্র না থাকায়, বিধবারা দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া তাহার নামে বতনের কাজ চালাইয়া আসিতেছে। এই পারিবারিক প্রথা অনুসারে তিনিও দত্তক গ্রহণ করেন, এবং তাহার পর তাঁহাদের উভয়ের নামে কাজ চালাইতে অঙ্গীকার করে, কিন্তু কিছুকাল পরে বতনের কাগজ হইতে তাঁহার নাম তুলিয়া দেয়। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার দত্তক পুত্র অল্পবয়সে একটী ... বৎসরের নাবালক পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। ... দত্তকপুত্রের মৃত্যুর পরে বালকের কর্মচারীরা গিরমাবাইর অধিকার অগ্রাহ্য করিতেছে, অতএব পারিবারিক বতনে তাঁহার ও নাবালকের উভয়ের সমান অধিকার সরকার হইতে সাব্যস্ত করা হউক। গিরমাবাইর আবেদন গৃহীত হইল, কিন্তু ইহাতে বতনের কাজে নানাপ্রকার গোলযোগ আরম্ভ হইল। সুতরাং নাবালক অন্তরাজীও আবার পেশবা সরকারের দ্বারস্থ হইলেন; তিনি আবেদন করিলেন যে, বতনের কাজের একটা পাকা বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। গিরিমাবাইর দাবী গৃহীত হইলে, ভবিষ্যতে তাঁহার মৃত্যুর পরে অন্তরাজীর বিমাতাও ঐরূপ দাবী করিতে পারেন; অতএব এই প্রশ্নেরও চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। এই প্রশ্নের মীমাংসার ভার একটী পঞ্চায়েতের উপর অর্পিত হয়। পঞ্চায়েতের বিচারে স্থির হয় যে, বতন সম্পর্কীয় কাগজপত্রে গিরিমাবাইয়ের নাম থাকিবে, কিন্তু বতনের কোন কাযে হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে না। তাঁহার মৃত্যুর পর অন্য কোন রমণী এই প্রকার অধিকারের দাবী করিতে পারিবেন না। "তিচে নাঁব তী জিবংত আহে তো পর্য্যন্ত দপ্তরাত চালবাবে। পুঢ়ে বায়কাঁচী নাবেঁ দপ্তরাত চালবূঁ নয়ে।"

মৌজা; কয়েকটি মৌজার সমবায়ের নাম তরফ; এবং কয়েকটি তরফ লইয়া একটী সুভা গঠিত হইত। মৌজার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে হবীলদার আর সুভার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে সুভেদার বা মুখ্য দেশাধিকারী বলা হইত। পেশবা-যুগে পরগণা, তরফ, মৌজা, সুভা, সরকার প্রভৃতি সকল নামগুলিরই প্রচলন ছিল; এবং দলিল-পত্রে এই সকল শব্দই ব্যবহৃত হইত; কিন্তু তাহাদের অর্থগত প্রভেদ এই সময়ে একপ্রকার লোপ পাইয়াছিল। তবে সাধারণতঃ পেশবাদিগের কাগজ-পত্রে সুভার পরিবর্ত্তে 'প্রান্ত' এবং তরফ ও পরগণার পরিবর্ত্তে 'মহাল' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট-ছোট মহালের প্রধান কর্ম্মচারীর অভিধা ছিল কামাবিশদার ও বড়-বড় মহালের কর্ত্তা ছিলেন মামলতদার। মামলতদারেরা সাধারণতঃ পুণা সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন, এবং হিসাব দাখিল করিতেন পুণা সরকারের নিকটে;—পেশবা সরকার ব্যতীত তাঁহাদের উপরে আর কোন উচ্চতর কর্ম্মচারী থাকিত না। কেবল খান্দেশ, গুজরাট ও কর্ণাটক * এই তিনটী প্রদেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত। এই প্রদেশ তিনটিতে মামলতদারদিগের কার্য্যের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত এক-একজন 'সরসুভেদার' থাকিতেন। তিনজন সর-সুভেদারের ক্ষমতা ও বেতন কিন্তু সমান ছিল না। কর্ণাটকের সরসুভেদার আপনার অধীন মামলতদারদিগকে বহাল ও বরখাস্ত করিতে পারিতেন, রাজস্ব আদায়-অনাদায়ের জন্য পেশবা সরকারের নিকটে তাঁহাকে দায়ী থাকিতে হইত। খান্দেশের সরসুভেদারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ইহা অপেক্ষা অনেক কম ছিল। তিনি সেখানকার মামলতদার ও কামাবিসদারগণের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন মাত্র। তাঁহাদিগের নিয়োগ-বিয়োগেও তাঁহার কোনও হাত ছিল না, সুতরাং রাজস্ব আদায় বা অনাদায়ের দায়িত্বও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইত না। সরসুভেদার কামাবিশদার ও মামলতদারদিগের ক্ষমতা, কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহাদের বেতনের কথার আলোচনা করা যাউক।

পেশবা-যুগের কাগজপত্রে দেখা যায় যে, সকল কামাবিশদার সমান বেতন পাইতেন না; অথবা এখনকার মত সেকালে এই সকল কর্ম্মচারীর কোন নির্দ্দিষ্ট 'গ্রেড' বা বেতনের হারও ছিল না। মহালের আয়তন ও আয়ের তারতম্য অনুসারে, কর্ম্মচারিগণেরও বেতনের তারতম্য হইত। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ত্রিম্বক হরি নামক এক-ব্যক্তি বার্ষিক ১০০০৲ বেতনে সরকার হাণ্ডের কামা-বিশদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার তিন বৎসর পরে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ভুপাল পরগণার কামাবিশদার রামচন্দ্র বল্লাল ৭০০০৲ বেতন পাইতেন। সাধারণতঃ এই সকল কর্ম্মচারী, নিয়োগের সময় যে পরিমাণ রসদ বা আগাম টাকা দিতেন, তদনুপাতে তাঁহাদের বেতন নির্দ্দিষ্ট হইত। ভুপাল পরগণার কামাবিশদার পৌণে দুই লক্ষ টাকার রসদ দিয়াছিলেন; তিনি বেতন পাইতেন পৌনে দুই লক্ষের, ৴৹ (শতকরা ৪) ৭০০০৲। (৭০০০ তুম্মাস বেতন রসদ পাবণে দোন লাখ রূপয়াস দরসদে ৪ রূপয়ে প্রমাণে)। ঠিক এই নিয়ম অনুসারেই এই সময়ে বুন্দেলখণ্ডের মামলতদারের বেতন তৎপ্রদত্ত রসদের শতকরা ৪৲ হিসাবে ১২৮০০৲ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। (তুম্মাস সুশাহিরা রসদে চা দরসতে রূপয়ে ৪ প্রমাণে ১২,৮০০ বারা হাজার আঠশে করার কেলে অসেত)। রাও বাহাদুর দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীসের মতে কামাবিসদার ও মামলতদার তাহাদিগের অধীন মহালের দেয় বার্ষিক রাজস্বের শত-করা ৪৲ হিসাবে বেতন পাইতেন। Peshwas' Diaries, বালাজী বাজীরাও প্রথম খণ্ডে ৪০৭ ও ৪০৯ সংখ্যক দলীলের পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"The remuneration of the Kamavisder of Bhupal was fixed at Rs. 4 pre cent of the revenue received." এবং "The Mamlot of Bundelkhand was entrusted to one person, and Rs. 320,000 were received from him in advance on account of land revenue. His remuneration was fixed at Rs. 12,800 at Rs. 4 per cent of the revenue."

* কর্ণাটক বলিতে প্রাচীন হিন্দুযুগের ন্যায় মারাঠাযুগেও মহীশূর প্রভৃতি সমস্ত দক্ষিণদেশীয় রাজ্য বুঝাইত। সুতরাং সেকালের কর্ণাটক আধুনিক ইংরাজি কর্ণাটক অপেক্ষা অধিক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত।

রাও বাহাদুর পারসনীস বহুকাল মারাঠা ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের মত বিনা বিচারে উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু রাও বাহাদুর তৎসম্পাদিত বালাজী বাজীরাও প্রথম খণ্ডের আর কয়েকখানি দলীল ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার মত যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা উপরে যে দুইখানি দলীল হইতে দুইটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে যে, রসদের শতকরা ৪৲ হিসাবে বেতন নির্দ্ধারিত হইল। রসদ শব্দের অর্থ রাজস্ব নহে। পেশবা সরকারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না বলিয়া, তাঁহারা প্রত্যেক মহালের কর্ম্মচারীর নিকট হইতেই বৎসরান্তে বা নিয়োগের সময় কিছু অগ্রিম টাকা লইতেন। এই অগ্রিম দানের নাম রসদ। একটু হিসাব করিলেই দেখা যাইবে যে, কামাবিশদার ও মামলাতদারগণ ঠিক নিজ নিজ রসদের শতকরা ৪৲ বেতন পাইতেন। ভুপালের কামাবিসদার রামচন্দ্র বল্লাল ১,৭৫,০০০৲ রসদ দিয়াছিলেন; তিনি ৭০০০৲ বেতন পাইতেন। বুন্দেলখণ্ডের মামলতদার লক্ষ্মণ শঙ্কর ৩,২০,০০০৲ রসদ দিয়াছিলেন; সুতরাং তাহার বেতন হইয়াছিল, ১২,৮০০৲। আবার বালাজী বাজীরাওয়ের শাসনকালীন আর একখানি দলীলে দেখিতে পাই যে, ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিম্বক বাবুরাও নামক এক ব্যক্তি ৫ বৎসরের জন্য কসবা পুণতাম্বার কামাবিসদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুণতাম্বার রাজস্ব পাঁচ বৎসরে ৪৫০০০৲ হইতে ৪৯০০০৲ পর্য্যন্ত 'ইস্তাবার' নিয়ম অনুসারে পড়িবার কথা ছিল।

১৭৫৯—৬০—৪৫,০০০৲
১৭৬০—৬১—৪৬,০০০৲
১৭৬১—৬২—৪৭,০০০৲
১৭৬২—৬৩—৪৮,০০০৲
১৭৬৩—৬৪—৪৯,০০০৲

যদি রাও বাহাদুর পারসনীসের মত ঠিক হইত, তাহা হইলে পুণতাম্বার কামাবিসদার রাজস্বের শতকরা ৪৲ হিসাবে অন্ততঃ ১৮০০৲ বেতন পাইতেন। কিন্তু পেশবা সরকার তাঁহাকে বার্ষিক ২০০৲ মাত্র বেতন দিতেন। (Peshwas' Diaries, Balaji Baji Rao, Vol 1, P. 279 দেখুন।) মামলতদার ও কামাবিসদারগণ যে এক বৎসরের রাজস্বের সমান টাকা রসদ স্বরূপ দিতেন না, তাহার প্রমাণও রাও বাহাদুর পারসনীস সম্পাদিত পেশবার ডায়েরীতে মুদ্রিত বহু দলীলে পাওয়া যায়। কসবা পুণতাম্বার কামাবিসদার মাত্র ২০,০০০৲ টাকা রসদ দিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার মহালের বার্ষিক রাজস্ব ৪৫,০০০৲র কম ছিল না।

সকল সময়েই যে কামাবিশদারের রসদের ১/২৫ অংশ বেতন পাইতেন, এমন কথাও বলা যায় না। কসবা পুণতাম্বার কামাবিশদারের কথাই ধরুন। তিনি বার্ষিক খাজানা আদায় করিতেন ৪৫ হইতে ৪৯ হাজার, বার্ষিক রসদ দিতেন ২০,০০০৲, রসদের অনুপাতে তাঁহার বেতন হওয়া উচিত ছিল ৮০০৲ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি বেতন পাইতেন ২০০৲ মাত্র। (সকতাপৈকী রসদ দরসলে রূপয়ে ২০,০০০ বীস হাজার প্রমাণে করার কেলী অসে। দরসলে বীস হাজার রূপয়ে সরকাবাত জমা করূন জাব খেত জানে। শিবন্দীব মহাল মজকুরচী নেমনুক পেশজী প্রমাণে করার —২০০ কামাবিসদার)

সাধারণতঃ কামাবিসদারের আফিস-খরচ, পাল্কী-খরচ ও অন্যান্য খরচ চালাইবার জন্য পেশবা সরকার কিছু থোক টাকা মঞ্জুর করিয়া দিতেন। সরকার চাণ্ডের কামাবিসদার ত্রিম্বক হরির জন্য এই সম্পর্কে পেশবা সরকার যে টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা হইতেই এই কথা বেশ ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। ত্রিম্বক হরির নিয়োগপত্র হইতে তাঁহার আফিস খরচ প্রভৃতির তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

কামাবিসদাস স্বয়ং ১০০০৲

মাসিক ৬০৲ হিসাবে ১১ মাসের বেতন দিয়া বারো মাস খাটাইয়া লইবার করারে পাল্কী

খরচ ৬৬০৲

৫০ জন সৈনিকের বাবদ ৭৫০০৲

মাসিক ২॥০, ২৸০, অথবা ৩৲ বেতনে ২০০ পেয়াদা রাখিতে হইবে। ইহাদিগকে বারো মাসেরই বেতন দিতে হইবে। চৌকীতে চৌকীতে প্রয়োজনমত মাসিক ৩॥০ বেতনে বারো জন কারকুন বা মুহুরী রাখিতে হইবে।

নিম্নলিখিত কারকুনেরা ১০ মাসে নিম্নলিখিত হারে বেতন লইয়া বারোমাস চাকরী করিবে:—

মজুমদার ২৫৲

নারোরাম ফড়নিস্ ২৫৲
শিবাজী-দাদাজী চিটনীস ২৫৲
গিরমাজী আবজী কারকুন ২৫৲
জনার্দ্দন ভাস্কর, কারকুন ২৫৲

বিসাজী যাদব, ভিকাজী তনেদেব, মোরো শামরাজ এবং গিরমাজী নামক চারিজন কারকুন, জনপ্রতি ১৫৲
হিসাবে ৬০৲

বাবুজী ত্রিমল, গোবিন্দশিবদেব শিবাজীরাম ও বেঙ্কাজী অনন্ত নামক চারিজন কারকুন জনপ্রতি ১২৲ টাকা
হিসাবে ৪৮৲

এই তালিকা হইতেই বেশ বুঝা যায় পেশবা সরকার প্রত্যেক মহালের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে কিরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখিতেন। এই তালিকার দুইটি বিষয়ের প্রতি পাঠকগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। (১) বারোমাস চাকরী করিয়া দশ মাস বেতন পাইবার নিয়ম ও (২) পাল্কী-খরচ। এই দশমাসী বেতন ও বারোমাসী চাকরীর নিয়ম কেবল শাসন-বিভাগে নয়, সেনা-বিভাগেও প্রচলিত ছিল। বোধ হয়, এই নিয়ম প্রথমে মোগল-সেনা-বিভাগের অনুকরণে মারাঠা সেনাদলে প্রবর্ত্তিত হয় ও ক্রমে-ক্রমে তথা হইতে মারাঠা শাসন-বিভাগেও বিস্তার লাভ করে। পেশবা-যুগের পাল্কী-খরচের সহিত এখনকার রাহা-খরচ বা travelling allowanceএর তুলনা করা সঙ্গত হইবে না। এখন যেরূপ সরকারী কর্ম্মচারীরা নিজ-নিজ বিভাগে কার্য্যের উৎকর্ষের জন্য 'রায় বাহাদুর,' 'খাঁ বাহাদুর', দেওয়ান বাহাদুর,' 'রায় সাহেব' 'খাঁ সাহেব' প্রভৃতি উপাধি পাইয়া থাকেন, সেইরূপ পেশবা-যুগের কর্ম্মচারিগণ পাল্কী ও 'আপ্তাগিরি' প্রভৃতি ব্যবহার করিবার সম্মান লাভ করিতেন। কিন্তু খালি পাল্কী চড়িবার অধিকার পাইলেই ত হয় না; পাল্কী কেনা চাই, পাল্কী বহিবার জন্য বেহারা চাই, ও এই সকল ব্যয়ের জন্য টাকা চাই। পাছে রাজদত্ত সম্মান দরিদ্র কর্ম্মচারীর পক্ষে পুরস্কার না হইয়া বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়ায়, এই ভয়ে পেশবা-সরকার কোন কর্ম্মচারীকে পাল্কী আপ্তাগিরি ব্যবহারের অধিকারের সঙ্গে-সঙ্গে এই অধিকার সম্ভোগের জন্য কিছু টাকাও 'পাল্কী-খরচ' বা 'আপ্তাগিরি খরচ' বাবদ মঞ্জুর করিতেন। আজকালকার অনেক 'রায় বাহাদুর' ও 'খাঁ বাহাদুর' যে রাজসরকার হইতে পদমর্য্যাদা বাঁচাইয়া চলিবার খরচ পাইলে বাঁচিয়া যাইতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কামাবিসদার ও মামলতদার পেশবার প্রতিনিধি;—সুতরাং পেশবা-সরকারের তাবৎ রাজক্ষমতাই ইঁহারা পরিচালন করিতেন। সুতরাং ইঁহাদের কর্ত্তব্যের সংখ্যা ও দায়িত্বের পরিমাণ খুব বেশী ছিল। একদিকে যেমন রাজস্ব আদায়ের সহিত, কামাবিশদারকে কৃষকের হিত সাধন, কৃষির বিস্তার ও উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিতে হইত, অপর দিকে আবার তাঁহাকে মহালের মধ্যে নব-নব শিল্প-কলার প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দিতে হইত। এতদ্ব্যতীত দেওয়ানী ও ফৌজদারী সকল প্রকারের মামলার তদন্ত করিয়া বিচারের জন্য পঞ্চায়েত নিয়োগ করিতেন কামাবিসদার; ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ও সামাজিক সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন তিনি; মহালের 'শিবন্দী সেনা' ও পুলিশের কর্ত্তাও ছিলেন তিনি; সুতরাং পরোক্ষভাবে শান্তিরক্ষার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু এইখানেই তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ হইল না। পেশবা-যুগের মারাঠাগণ আবার মধ্যযুগের য়ুরোপীয়দিগের মত ভূতপ্রেত ও ডাইনীদিগের কুহক-শক্তিতে আস্থাবান ছিল। কাজেই মহালে ভূতের উৎপাত হইলে, কোন ডাইনীর কুহকে কোন প্রজার ধনসম্পত্তি বা জীবনের অনিষ্ট হইলেও, তাহার প্রতিকারের জন্য আতঙ্কিত জনসাধারণ কামাবিসদারের দ্বারস্থ হইত। এত ক্ষমতা যাহার, ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ বা সুবিধা যে তাহার একেবারেই ঘটিত না, তাহা নহে। সুতরাং মারাঠা-কর্ম্মচারিগণের উৎকোচ-প্রিয়তার বহু বিবরণ বিদেশী লেখকগণের গ্রন্থে পাওয়া যায়। শিবাজীর সমকালীন ইংরেজ পর্য্যটক ডাক্তার ফ্রায়ার (Fryer) ও উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সৈনিক ডাঃ মেজর ব্রুটন্ (Broughton) উভয়েই মারাঠা-কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। ফ্রায়ার বলেন যে, একজন মারাঠা কর্ম্মচারী শিবাজীর দরবারে আগত ইংরেজ-দূত অষ্কিন ডেন্‌কে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তাড়াতাড়ি কাজ করিয়া লইতে হইলে উপহারের তালিকাটি আরও কিছু বাড়ানো দরকার। আর ব্রুটন্ বলেন যে, দৌলতরাও সিন্ধিয়া তাঁহার এক মৃত ভাগিনেয়ের জন্যও খেলাত চাহিয়াছিলেন; নতুবা অপর সকলকে

খেলাত পাইতে দেখিলে তাঁহার ভগিনীর লুপ্তপ্রায় পুত্রশোক আবার প্রবল হইবার সম্ভাবনা। এই উপহার-প্রিয়তার বা অভদ্র ভাষায় উৎকোচের লোভ যে মারাঠাদিগেরই একচেটিয়া ছিল, এমন নহে। সেকালের ইংরেজ বা মুসলমান কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে মারাঠা কর্ম্মচারিগণের অপেক্ষা যে নৈতিক হিসাবে খুব উন্নত ছিলেন, এমন বোধ হয় না। হকিন্স এবং রোর (Hawkins এবং Rowe) ভারত-প্রবাস কাহিনীতে মোগল কর্ম্মচারিগণের যে অর্থ লোলুপতার বিবরণ আছে, তাহা সে-কালের নবাব, আমীর ও ওমরাহদিগের পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নহে। ইহারা না কি পাশ্চাত্য বণিকের বাক্স-পেটারার ভিতরের সন্ধান পাইবার জন্ত অসঙ্গত কৌতূহল প্রকাশ করিতেন। আবার, বিলাতী জজের যে চিত্র সেক্‌স্‌পীয়রের অমর তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে—"the Justice in fair round belly with good cafon lined"—তাহাতে এলিজাবেথের যুগে স্থূলোদর বিলাতী-ধম্মাবতারের আনুকূল্যও যে উৎকোচ দ্বারা ক্রয় করা যাইতে পারিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহার ঐতিহাসিক উদাহরণ স্বনামখ্যাত লর্ড বেকন্। ভাগ্যদোষে তিনি ধরা পড়িয়া কলঙ্কের ভাগী হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা ধরা পড়েন নাই, তাঁহাদের সংখ্যাও বোধ হয় কম নহে। যে সকল ইংরেজ কর্ম্মচারী, কোম্পানী বাহাদুরের চাকরী করিতে এ দেশে আসিতেন, তাঁহারাও এ বিষয়ে 'কালা-আদমীর' চেয়ে বড় বেশী উন্নত ছিলেন না। ক্লাইব ও তাঁহার সহযোগীরা অল্পকাল ভারত-প্রবাসের পরই স্বদেশে ফিরিয়া সকল জিনিসের বাজার-দর যেরূপ চড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহাতেই ইহা বেশ বুঝা যায়। আবার, ওয়েলিংটনের ডেস্‌প্যাচে পড়িয়াছি যে, তাঁহার অধীন একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট-কর্ণেল সরকারী টাকা আত্মসাৎ করিবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। একজন লেপ্টেন্যাণ্ট চোরাই মাল খরিদ করিয়াছিলেন, এবং অপর দুইজন লেপ্টেন্যাণ্ট বাজারে যাইয়া উপদ্রব করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া শাস্তি-ভোগ করিয়াছিলেন। সেকালের লোকের চক্ষে উৎকোচ-গ্রহণ খুব গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত না। উৎকোচ বা উপহার প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারীর ন্যায্য পাওনা বলিয়াই পরিগণিত হইত। সুতরাং ভারতে এবং বিলাতে উভয় দেশেই এক সময়ে উৎকোচ দান ও গ্রহণ পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত ছিল। পেশবা-রাজত্বের শেষভাগে মারাঠা কর্ম্মচারীরা প্রকাশ্যেই 'অন্তস্থ' বা 'দরবার-খরচ, দাবী করিতেন; বিলাতে এ রকম খোলাখুলি ছিল না, এই যা প্রভেদ।

অত্যাচার ও অনাচার সকল দেশে, সকল যুগে, সকল গবর্ণমেণ্টের অধীনেই অল্পাধিক পরিমাণে থাকে; পেশবা-যুগেও ছিল। কিন্তু কামাবিস্‌দার ও মামলতদার যাহাতে তাঁহাদের বিপুল ক্ষমতার অপব্যবহার না করিতে পারেন, সে দিকে পেশবা-সরকারের সতর্কতার অভাব ছিল না। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর কর্ম্মচারীর সাহায্যে পেশবা-সরকার কামাবিস্‌দার ও মামলতদারের ক্ষমতার অপব্যবহার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেদিগের সহিত আমাদের ইতঃপূর্ব্বেই সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইঁহাদের নিকটে গ্রাম্য-রাজস্বের এক-এক প্রস্থ হিসাব থাকিত। মামলতদার ও কামাবিস্‌দারের হিসাবের সহিত এই হিসাব মিলাইয়া লওয়া হইত; সুতরাং হিসাব জাল করা অথবা মিথ্যা হিসাব দেওয়া পরগণার কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের সাধারণ নাম 'দরকদার'। পাটীল, কুলকর্ণী, দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের মত ইঁহারা নিজ-নিজ পৈতৃক পদ উত্তরাধিকার-সূত্রে পুরুষানুক্রমে পাইতেন। ইঁহাদিগকে বহাল বা বরখাস্ত করিবার ক্ষমতাও কামাবিস্‌দারের বা মামলতদারের ছিল না; অথবা ইঁহারা নিজ-নিজ পৈতৃক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে না পারিলে, ইঁহাদিগের দ্বারা অন্য কায করাইয়া লইতেও কামাবিস্ ও মামলতদার পারিতেন না। যদি তাঁহারা এরূপ অসঙ্গত চেষ্টা করিতেন, তবে দরকদারেরা পেশবা-সরকারের নিকট অবেদন করিয়া তাহার প্রতীকার করিয়া লইতে পারিতেন।

৮। দরকদার।

প্রত্যেক কামাবিস্‌দারের ও মামলতদারের আফিসে বারোজন কারকুন্ ব্যতীত ৮ জন 'দরকদার' থাকিতেন। মহাল-সম্পর্কীয় প্রধান-প্রধান কায ইঁহাদের সম্মতি বা সহযোগিতা ভিন্ন সম্পন্ন হইবার উপায় ছিল না। নিম্নে ৮ জন দরকদারের তালিকা দেওয়া গেল:—

১। দেওয়ান।

২। মজুমদার।

৩। ফড্‌নবিস।
৪। দপ্তরদার।
৫। পোতনীস্।
৬। পোতদার।
৭। সভাসদ্।
৮। চিটনীস্।

এই সকল 'দরফদার' মামলতদারের নিকট হইতে বেতন পাইতেন না; সুতরাং ইঁহারা প্রয়োজন বোধ করিলে মামলতদারের কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে পেশবা-সরকারের নিকটে সকল সংবাদ পাঠাইতে ভীত হইবেন না, এই ভরসায়ই বোধ হয় প্রত্যেক বিভাগেই কতকগুলি দরফদার রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইঁহাদের কর্ত্তব্যগুলি আবার এমন দক্ষতার সহিত বিভাগ করা হইয়াছিল যে, আট জন দরফদারের মধ্যেও কাহারও অজ্ঞাতে শাসন বা রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কাজ হইবার উপায় ছিল না। দেওয়ান সকল হুকুমনামা ও চিঠি-পত্র সহি করিতেন। মজুমদার প্রত্যেক দলীল ও হিসাব সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করিয়া ফড্‌নবিসের নিকটে পাঠাইতেন। ফড্‌নবিস প্রত্যেক দলীল ও হুকুমনামায় তারিখ লিখিয়া দিতেন এবং দৈনিক কাযের ও হিসাবের খস্‌ড়া লিখিতেন। টাকার থলিয়ায় তিনিই হিসাবের চিঠি বাঁধিয়া দিতেন। প্রত্যেক গ্রামের রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহার কাগজে তারিখ লিখিয়া দিতেন; এবং পরিশেষে সকল খাতাপত্র তিনিই সদরে লইয়া আসিতেন। দপ্তরদার ফড্‌নবিসের দৈনিক খস্‌ড়া হইতে খতিয়ান-বহি তৈয়ার করিতেন এবং মাসান্তে আয়-ব্যয়ের মোটামুটি একটা হিসাব সরকারে পাঠাইতেন। পোতনীস্ আদায়ী রাজস্বের ও নগদ টাকার হিসাব রাখিতেন এবং দৈনিক হিসাবের খস্‌ড়া ও খতিয়ান লিখিতে সাহায্য করিতেন। পোতদার প্রত্যেক আফিসে দুই-দুই-জন করিয়া থাকিত,—মুদ্রার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করাই ছিল ইহাদের কাজ। সভাসদ্ ছোট-ছোট মামলা-মোকর্দ্দমার রেজিষ্ট্রী রাখিতেন ও মামলতদারের নিকট তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট করিতেন। চিটনীস্ সকল প্রকার চিঠিপত্র লিখিতেন ও চিঠিপত্রের জবাব দিতেন। (Bombay Gazetteer Poona Volumes দেখুন।) এতদ্ব্যতীত প্রথম মাধব রাওয়ের সময়ের একখানি প্রাচীন দলীলে 'জমেনীস্' নামক আর একজন কর্ম্মচারীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দলীলখানিতে জমেনীসের কর্ত্তব্য নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে—

১। সরকারী কর্ম্মচারীরা জিরাইত ও বাগাইত জমি পরিদর্শন করিয়া তাহাদের মন্তব্য ও রিপোর্ট জমেনীসের নিকটে দাখিল করিবেন। জমেনীস প্রয়োজনমত তদন্ত করিয়া তৎসাহায্যে খাজানার হার নির্দ্ধারণ করিয়া কারভারীকে জানাইবেন।

২। রাজস্ব-সম্পর্কীয় যাবতীয় হিসাব জমেনীসের নিকটে দিতে হইবে। আদায়-বাকী নির্ভুল ভাবে লেখা হইল কি না, তাহার প্রতি জমেনীস নজর রাখিবেন।

৩। গ্রাম্য রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা জমেনীসের থাকিবে। আবার আবশ্যক বিবেচনা করিলে কয়েক বৎসরের জন্য তিনি রাজস্ব সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে মাপ করিতে পারিবেন।

৪। বাকী আদায়ের হুকুম জমেনীস দিবেন।

৫। রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করিবার 'কৌল' জমেনীসের নামে বাহির হইবে।

৬। ফড্‌নবীসের দৈনিক খস্‌ড়া হইতে গ্রাম্য রাজস্বের আদায়-বাকীর খতিয়ান জমেনীস প্রস্তুত করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আটজন দরফদারের মধ্যে কেহই অপর কাহারও অজ্ঞাতে রাজস্ব বা শাসন-সম্পর্কীয় কোন কিছু করিতে পারিতেন না। ইহারা কিরূপে পরস্পরের কাযের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাহা ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ধারবারের মামলতদার ব্যাঙ্কট-নারায়ণের লিখিত দুইখানি পত্র হইতেই বেশ বুঝা যাইবে। এই চিঠি দুইখানিতে মজুমদার ও দপ্তরদারের কার্য্য-তালিকা দেওয়া হইয়াছে। মজুমদার, জমেনীস, ফড্‌নবীস ও চিটনবীসের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। আবার, দপ্তর-দারকে কামাবিস্‌দারের নিকট হিসাব দাখিল করিবার আগে ফড্‌নবিসকে হিসাব-সম্পর্কীয় সকল কথা বুঝাইয়া দিতে হইত।

মজুমদারের কার্য্যতালিকা।

১। তিনি প্রতিদিন দৈনিক হিসাব মিলাইয়া লইতেন।

২। ফড্‌নবীস ও চিটনীস লিখিত প্রত্যেক হিসাব ও চিঠি তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন।

৩। নব-নিযুক্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক-সৈন্যের বেতনের অঙ্ক ঠিক করিয়া যোগ দেওয়া হইল কি না, তিনি

দেখিবেন এবং প্রত্যেক গ্রামের অশ্বারোহী ও পদাতিকদিগের হাজিরা লইবেন।

৪। মহালের যে অংশের নিমিত্ত সহকারী মামলতদার নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহার আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব মজুমদার প্রস্তুত করিবেন এবং মামলতদারের সদরে দেয় হিসাবও মজুমদারের মারফতে দিতে হইবে।

৫। মজুমদারের অজ্ঞাতে মামলতদার পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

দপ্তরদারের কার্য্যতালিকা।

১। ফড়নবীস দৈনিক খসড়া লিখিতেন ও তাহা হইতে দপ্তরদার খতিয়ান তৈয়ার করিতেন।

২। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব দপ্তরদার প্রস্তুত করিবেন। বর্ষান্তে কামাবিসদারের হিসাব তিনি কাগজ-পত্রের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা করিবেন।

৩। প্রজাদিগকে প্রদত্ত ঋণ ও তাহা পুনরাদায় সম্বন্ধীয় তদন্ত দপ্তরদার করিবেন।

৪। মহালের সোয়ার বা অশ্বারোহী-সেনা-সম্পর্কীয় হিসাব দপ্তরদার পরীক্ষা করিবেন।

৫। দপ্তরদার সমস্ত হিসাব ফড়নবীসকে বুঝাইয়া দিবেন ও তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া মামলতদারের নিকট হিসাব দাখিল করিবেন।

৬। ফড়নবীস নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে যে সকল হুকুম দিবেন, তাহা দপ্তরদারের মারফতে দিতে হইবে।

৭। ফড়নবীসের অনুপস্থিতিতে তাঁহার কার্য্য দপ্তরদার করিবেন।

মামলতদারেরা যাহাতে রাজস্ব আত্মসাৎ করিতে বা প্রজাদিগের উপর অন্যায় উৎপীড়ন না করিতে পারেন, তাহার জন্য পেশবা-সরকার আরও দুইটি নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মামলতদার ও কামবিসদারের বেতনের হার আলোচনা করিবার সময়ই আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক মামলতদার ও কামাবিসদার তাঁহাদের নিয়োগের সময় পেশবা-সরকারকে কিছু 'রসদ' বা অগ্রিম টাকা দিতেন। এই টাকার জন্য তাঁহারা পেশবা-সরকার হইতে মাসিক শতকরা ১৲ টাকা হইতে ১৷৷৹ টাকা হিসাবে সুদ পাইতেন। পেশবাগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না, সুতরাং রাজস্বের কিয়দংশ অগ্রিম পাওয়াতে যেমন একদিকে অর্থাভাবের অসুবিধা কিয়ৎ-পরিমাণে দূর হইত, সেইরূপ মামলতদার ও কামাবিসদারদিগের কতকটা ভয় থাকিত যে, মহালের প্রজাসাধারণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিলে অথবা রাজস্ব-আদায়-সম্পর্কে কোন প্রকারের অপরাধ ধরা পড়িলে 'রসদের' টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। মামলতদারের অসাধুতা নিবারণের দ্বিতীয় উপায় 'বেহেড়া' বা বার্ষিক আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব। পুণা-দপ্তরের কাগজ-পত্র হইতে বিশেষ পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত এই "বেহেড়া" প্রস্তুত করা হইত, এবং সাধারণতঃ "বেহেড়ার" অতিরিক্ত কোন খরচ লিখিতে মামলতদারেরা সাহসী হইতেন না। এত সতর্কতা সত্বেও কিন্তু মামলতদার ও কামাবিসদারের 'উপরি-রোজগার' বন্ধ হয় নাই। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলেন:—

The sources of their profit was concealment of receipt (especially fees fines and other undefined collections) false charges for remission, false musters, non-payment of pensions and other frauds in expenditure. The grand source of their profit was an extra assessment above the revenue, which was called Sandar Warrid Puttee. * * * * One of the chief of these expenses was called Durbar Khurch or Antast. This was originally applied secretly to bribe Ministers and Auditors. By degrees, their bribes became established fees, and the account was audited like the rest, but as bribes were still required, another collection took place for this purpose, and as auditors or accountants did not search minutely into these delicate transactions the Mamlatdar generally collected much more for himself, than for his patron." অর্থাৎ জরিমানা, নজর প্রভৃতি আদায়ের অনুল্লেখ, মিথ্যা রেহাইর ও মিথ্যা হাজিরার মিথ্যা খরচের ও পেন্সনের হিসাবই মামলতদারদিগের উপরি-রোজগারের প্রধান উপায়। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান লাভ হইত, "সদর

ওয়ারিদ পট্টী" হইতে। এতদ্ব্যতীত 'দরবার খরচ' বা 'অন্তস্থ' অথবা সরলভাষায় হিসাব-পরীক্ষককে দিবার জন্য উৎকোচ হইতেও তাঁহাদের বেশ আয় হইত। উৎকোচের জন্য যে পরিমাণ টাকা আদায় হইত, তাহার সমস্ত অথবা অধিকাংশও হিসাব-পরীক্ষকের বাক্‌সে উঠিত না; সুতরাং তাহা হইতেও মামলতদারের বেশ মোটা রকম লাভ হইত।

মামলতদার এইরূপ বিবিধ উপায়ে নিজের আয়-বৃদ্ধি করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রজাদের বড় বেশী লোকসান হইত না, লোকসান হইত সরকারের। মামলতদার জানিতেন যে, প্রজারা নিঃস্ব হইয়া পড়িলে তাঁহার আয়ের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে সুতরাং সুবর্ণ অণ্ড সংগ্রহের সময় সুবর্ণপ্রসূ হংসীর প্রাণরক্ষার জন্য সাধ্যমত যত্নবান্ হইতেন। প্রজাদিগের উপর নূতন নূতন ভার চাপান হইত না সত্য, কিন্তু পেশবার রাজকোষে যত অর্থ সংগৃহীত হওয়া উচিত ছিল, এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের মতে, তত অর্থ পুণার দরজা কখনও পার হইত না।

সাধারণতঃ মামলতদার ও কামাবিস্‌দারেরা অল্প কয়েক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতেন। শিবাজীর আমলে ইঁহাদিগকে এক মহাল হইতে অন্য মহালে, এখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদের ন্যায় বদ্‌লী করা হইত। পেশবা-যুগে মামলতদারেরা বিশেষ গুরুতর কোন অপরাধ না করিলে একই মহালে ৩০।৪০ বৎসরকাল নিরুপদ্রবে কাটাইয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পরে তাঁহাদের পুত্রগণ পেশবার অনুগ্রহে সেই কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতেন। সুতরাং প্রত্যেক মহালের সহিত তথাকার মামলতদারের একটা স্থায়ী সম্পর্ক জন্মিত এবং দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফলে তথাকার অধিবাসীদিগের জন্য তাঁহাদের একটু আন্তরিক মমতাও হইত। কোন অর্থলোভী মামলতদার প্রজার উপর অযথা অত্যাচার করিলে পেশবা-সরকার তাঁহাকে বরখাস্ত করিতে একটু ইতস্ততঃ বা বিলম্ব করিতেন না। এই নিয়মের ব্যত্যয় হইয়াছে কেবল পেশবা-কুল-কলঙ্ক দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের সময়। তিনি অর্থলোভে কতকগুলি ধর্ম্মজ্ঞানহীন লোকের নিকট মহাল ইজারা দিয়াছিলেন। এই ইজারা-নীতির ফল পেশবা ও তাঁহার প্রজাবর্গ উভয় পক্ষের কাছেই বিষময় হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মামলাতদার বা কামাবিসদারগণ হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই সকল রাজকর্ম্মচারী ছিলেন গ্রাম্যসঙ্ঘ ও হুজুর-দপ্তরের মধ্যে সংযোগ-সেতু স্বরূপ। পল্লীসঙ্ঘ ও মহালের কর্ম্মচারীদিগের কথা বলা হইয়াছে। এইবারে হুজুর-দপ্তরের আকৃতি-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা যাইবে।

৯। হুজুর-দপ্তর।

পুণার হুজুর-দপ্তর মারাঠা-সাম্রাজ্যের "ইম্পিরীয়াল সেক্রেটারিয়েট।" এইখানে বিভিন্ন বিভাগে প্রায় দুইশত কারকুন কায করিত। মারাঠা-সাম্রাজ্যের শাসন-সম্পর্কীয় যে কোন তথ্য এই দপ্তর হইতে পাওয়া যাইত। পরগণার দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেদিগের প্রদত্ত রাজস্বের হিসাব, মহালের কামাবিস্‌দার ও মামলতদারদিগের প্রদত্ত হিসাব, পাটীল ও কুলকর্ণী প্রদত্ত গ্রাম্য-রাজস্বের হিসাব, বন-বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাব, শুল্ক-বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাব, সরঞ্জাম ও ইনাম-জমির হিসাব, সৈনিক-বিভাগের হাজিরা প্রভৃতি যাবতীয় সরকারী কাগজ এই হুজুর-দপ্তরে রক্ষিত হইত। সুপ্রসিদ্ধ নানা ফড়্‌নবীস হুজুর-দপ্তরের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইংরেজ-অধিকারের পর পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত ৮৮ বৎসরের সমস্ত কাগজ এই দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগে সুশৃঙ্খলভাবে পাওয়া গিয়াছিল। ইহা সে-কালের মারাঠা-কারকুনগণের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

হুজুর-দপ্তরের কর্ত্তা ছিলেন, হুজুর ফড়্‌নবীস। মহালের আফিসেও এক-এক-জন ফড়্‌নবীস থাকিত, এইজন্য পুণার ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটের বড় কর্ত্তাকে হুজুর ফড়্‌নবিস্ বলা হইত। এই বিরাট আফিস পরিচালনার জন্য যে বহু অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। সুবিধার জন্য হুজুর-দপ্তর বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার মধ্যে চাম্‌রে দপ্তর ও একবেরীজ দপ্তরই প্রধান। একবেরীজ দপ্তরে সকল প্রকার হিসাব-নিকাশের কায হইত বলিয়া এই আফিসটি সর্ব্বদাই পুণায় থাকিত। আর চাম্‌রে-দপ্তরের কায ফড়্‌নবীসের নিজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত।

চাম্‌রে দপ্তরে আবার ফড়, বোহড়া, সরঞ্জাম প্রভৃতি কতকগুলি বিভাগ ছিল। ফড়, ফড়্‌নবীসের নিজস্ব বিভাগ।

সমস্ত হুকুম, সনন্দ প্রভৃতি এই বিভাগ হইতে দেওয়া হইত। এই বিভাগে অন্যান্য বিভাগ হইতে সকল তথ্য সংগৃহীত হইত এবং ফড়নবীস স্বয়ং সকল হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। বেহেড়ো বিভাগে বেহেড়ো বা বার্ষিক আয়-ব্যয় বজেট প্রস্তুত হইত। পুরাতন আয়-ব্যয়ের হিসাব, গ্রাম্য রাজস্ব ও মহালের রাজস্বের স্বতন্ত্র হিসাবের সাহায্যে বেহেড়ো প্রস্তুত করা হইত। বেহেড়ো তৈয়ার করিতে মারাঠা-কারকুনেরা এমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন যে, কামাবিস্‌দার ও মামলতদার প্রায়ই রাজস্ব-আদায়-কালে এই বেহেড়োর অন্যথা করিতে পারিতেন না। সরঞ্জাম-বিভাগে সকল সরঞ্জাম ও কুসাল্লা জমির হিসাব রাখা হইত।

একবেরীজ দপ্তরে সমস্ত বিভাগের সকল হিসাব একত্র করিয়া, আদ্যক্ষর-অনুসারে সাজাইয়া রাখা হইত। সুতরাং প্রত্যেক বৎসরের আয়-ব্যয় ও উদ্‌বৃত্ত টাকার পরিমাণ অল্প সময়ের মধ্যে বাহির করিয়া লইতে মোটেই কষ্ট হইত না। একবেরীজ-দপ্তরের সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে হুজুর-দপ্তরের কর্ম্মচারীরা গ্রামের ও মহালের হিসাবের ভুল-প্রতারণা যে সহজে ধরিয়া ফেলিতেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

মিঃ ম্যাক্‌লিয়ড (Macleod) দপ্তরের কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাস-যোগ্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং এই প্রশ্নের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। মারাঠা-সাম্রাজ্যের পতনের পরেও, বতানের স্বত্ব লইয়া কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলেই বতনদারগণ তাঁহাদের মালেকী-স্বত্বের দলীলের খোঁজ হুজুর-দপ্তরে করিতেন। ইনাম-কমিশনের তদন্তকালে বহু সম্ভ্রান্ত জায়গীরদার মূল দলীল কমিশনের নিকট উপস্থিত করিতে অপারগ হইয়া পুণার হুজুর-দপ্তরে অনুসন্ধান করিতে কমিশনের কর্ম্মচারীগণকে অনুরোধ করিয়াছেন। পারসনীস-পরিবারের তদানীন্তন কর্ত্তা, মিঃ হেন্‌রী ব্রাউন্‌কে লিখিয়াছিলেন,—"ইহার (অর্থাৎ তাঁহাদের মালিক-স্বত্বের) নিদর্শন পেশবা-সরকারের মারাঠা-দপ্তরে আছে। (ত্যাচে দাখলে পেশবে সরকার চে মারাঠা দপ্তরী আহেত) (পারসনীস ও মাবজী সম্পাদিত কৈফিয়ৎ আদি দেখুন।) বিসাজী কৃষ্ণ বিনীওয়ালার বংশধর ও উপরিউক্ত ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট লিখিয়াছিলেন—"পুরাতন কাগজের নকল আমাদের কাছে আছে, তাহাই আপনার দেখিবার জন্য পাঠাইলাম, মূল কাগজ দপ্তরে আছে।" (পুনে কাগদাবারীল নকল আম্যা পাশী আহে। তী পাহন্যা কারিতা পাঠবিলী আহে অসসল দপ্তরী আহে—(পারসনীস ও মাবজী-সম্পাদিত কৈফিয়তাদি দেখুন) হুজুর-দপ্তরের কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও সততায় বিশ্বাস না থাকিলে সে-কালের জায়গীরদার ও বতনদারগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দপ্তরে পাওয়া যাইবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন কি?

পেশবা সরকারের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় হুজুর-দপ্তরেও দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের রাজত্বকালে তত্ত্বাবধানের অভাবে নানা রূপ বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়। এই দুর্ব্বুদ্ধি পেশবার সময়েই মারাঠা সাম্রাজ্যের সহিত পুণার হুজুর দপ্তরেরও বিলোপ হয়। ম্যাকলিয়ড লিখিয়াছেন—

"The Dafter was not only much neglected but its establishment was almost done away with, and people were even permitted to carry away the records or do with them what they pleased. "হুজুর দপ্তরে যে সকল পুরাতন দলীল পাওয়া গিয়াছিল, তাহার কতক বিলাতে চলিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট বোম্বাই সরকারের তত্ত্বাবধানে পুনা নগরীতেই রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু দপ্তর-গৃহের চিহ্নমাত্রও এখন সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না।

পশ্চিম-তরঙ্গ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

১। মাকড়সার জাল।

কেউ যদি এসে গল্প করে যে, অমুক দেশে দেখে এলুম, জেলেরা মাকড়সার জালে মাছ ধর্‌ছে,—তাহলে কথাটা এ দেশের লোক কেউই বিশ্বাস করবে না;—অথচ, এই পৃথিবীতে এমন দেশ সত্যই রয়েছে, যেখানে জেলেরা মাকড়সার জালেই চিরকাল মাছ ধরে আস্‌ছে! সে দেশটি হচ্ছে 'নিউ গিনী', আর তার উত্তর-পশ্চিম দিকে 'কারোলাইন' দ্বীপপুঞ্জ। এখানকার জঙ্গলে এক জাতের বড়-বড় মাকড়সা গাছের ডালে বৃহৎ আকারের জাল বুনে বসে থাকে। এক-একটী জালের ব্যাস মাপে প্রায় ছ' ফিট। নিউ গিনীর আদিম অধিবাসীরা এই মাকড়সার জালের পরিচয় পেয়ে ও-গুলোকে মাছ-ধরার কাজে লাগিয়েছে। এই অদ্ভুত মাকড়সার জালগুলি বেশ মজবুত; এতে আধ সের পর্য্যন্ত ওজনের মাছ ধরা যায়। জলের তোড়েও জালগুলি সহজে ছেঁড়ে না।

জঙ্গলের যে অংশটায় এই মাকড়সার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী, সেইখানে তারা কতকগুলো লম্বা বেতের ডগা নুইয়ে গোল করে বেঁধে, খাড়া করে রেখে আসে। তার পর এক সপ্তাহ যেতে-না-যেতে মাকড়সার অনুগ্রহে তাতে চমৎকার জাল তৈরী হয়ে যায়। তখন তারা সেগুলো জঙ্গল থেকে বা'র করে নিয়ে এসে মাছধরা সুরু করে দেয়।

(Literary Digest.)

২। বাল্‌শা কাঠ

পৃথিবীতে যত রকম কাঠ আছে, তার ভেতর এই 'বাল্‌শা'-কাঠই সব চেয়ে হাল্‌কা; এত হাল্‌কা যে, একটী ৮।৯ বছরের ছোট ছেলে এই কাঠের একখানা প্রকাণ্ড কড়িকাঠ স্বচ্ছন্দে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে পারে। 'এয়ারোপ্লেন্' বা উড়োজাহাজ তৈরি করার জন্যেই এই কাঠের চলন খুব বেশী;—তা ছাড়া, ইহা অন্য অনেক প্রয়োজনীয় কাজেও লাগে। সম্প্রতি সাঁতার-খেলুড়েদের জন্যে এই কাঠের এক রকম 'ভাসা-চেয়ার' তৈরি হয়েছে। এই চেয়ারে বসে বেশ আরামে ঢেউয়ের মুখে ভেসে বেড়ান যায়। ঘোড়ার খুরের মত কাটা একখানি তক্তা, তারই তলায়, বস্‌বার জন্যে চামড়া দিয়ে একটা দোলার মত করা আছে, আর কিছু নয়। ছেলেদের সমুদ্রে খেলা করবার জন্যেও বড়-বড় মাছের মত দেখতে এক রকম 'বোট' তৈরি হয়েছে। খুব হাল্‌কা ব'লে ছেলেরা বেশ অনায়াসে সেটাকে নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে পারে।

(Scientific American.)

৩। নূতন মানচিত্র

আকাশে বসে উড়ো-জাহাজ থেকে নীচের জমির যে 'ফটো' নেওয়া হয়, তা থেকে অতি পরিষ্কার নির্ভুল মানচিত্র তৈরি হচ্ছে। যুদ্ধের সময় এই উপায়ে তৈরি মানচিত্রগুলিই সব চেয়ে বেশী কাজে লেগেছিল। দশ হাজার ফিট উঁচু থেকে—'ক্যামেরার' মুখে প্রত্যেক বারে এক-একখানি ছবিতে দুই-বর্গ-মাইল পরিমিত স্থানের চিত্র পাওয়া যায়। এর চেয়ে নীচু থেকে ছবি নিলে প্রত্যেক-বার আরও অল্প-পরিমিত স্থানের চিত্র ওঠে। যে দেশের যে অংশের একখানি নির্ভুল মানচিত্র দরকার হয়, উড়ো-জাহাজের 'ক্যামেরা' সেই দেশের উপর দিয়ে উড়তে-উড়তে ক্রমাগত তার 'ফটো' তুলে নেয়,—ক্রমে সব জায়গাটুকুর ছবি নেওয়া শেষ হলে নেমে আসে। তখন জনকতক লোক মিলে সেই ছবিগুলি আর একখানা বড় কাগজের উপর ঠিক পর-পর সাজিয়ে এঁটে ফেলে; তারপর একজন সুদক্ষ নক্‌সাকার তাই থেকে একখানি চমৎকার নির্ভুল মানচিত্র তৈরি করে দেয়।

(Literary Digest.)

৪। সেতু-বন্ধন

সুবিস্তৃত 'রাইন'-নদের উপর এক ঘণ্টার মধ্যে একটী সেতু-নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া আমেরিকার সমর-বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারগণ সমস্ত বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল। জার্ম্মাণীর 'হনিঙ্গেন' প্রদেশের নিকটে রাইন্-নদের বিশালতা প্রায় ১৪৪০ ফিট। এখানে স্রোতের গতি ঘণ্টায় চার মাইল করিয়া; এবং নদের গভীরতা প্রায় ২৫ ফিটেরও বেশী। নদের তলদেশ পর্ব্বতসঙ্কুল বলিয়া ইহার উপরে সেতু বন্ধন করা অতি দুরূহ কার্য্য। আমেরিকার সামরিক ইঞ্জিনীয়ারগণ জার্ম্মাণীর নিকট হইতেই মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া ইহার উপর ৫৮ মিনিটের মধ্যেই একটী ভাসমান সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বাহ্ণে ইস্তাহার জারি করিয়া, ২৫শে মে রবিবার সকালে দুই ঘণ্টার জন্য রাইন্-নদের উপর সমস্ত নৌকা-চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ৯-১৫ মিনিটের সময় সেতুবন্ধন আরম্ভ করা হয়, এবং ১০-১৩ মিনিটের মধ্যে শেষ হইয়া যায়। এই সেতুটী আগাগোড়া পাশাপাশি 'পন্টুনের' উপর তৈয়ারি হইয়াছে। 'পন্টুনের' প্রত্যেক 'বোট'-খানিতে ১৷৷০ মণ ওজনের এক-একটী নঙ্গর বাঁধা আছে এবং আরও অধিক নিরপদ হইবার জন্য সেতুর মধ্যভাগে ৬।০ মণ ওজনের অতিরিক্ত ২টী নঙ্গর দেওয়া হইয়াছে। নঙ্গরগুলি সেতু হইতে প্রায় ১৫০ ফিট তফাতে বাঁধা হইয়াছে। নদের তলদেশ পর্ব্বতসঙ্কুল বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, হয় ত নঙ্গরগুলি ভাসিয়া যাইবে; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ একটী নঙ্গর ব্যতীত আর কোনটীই ভাসিয়া যায় নাই। সেতুটি বেশ মজবুত হইয়াছে।

(Literary Digest.)

৫। উল্কাপিণ্ড

উল্কাপাত ও উল্কাবৃষ্টি প্রাচীন যুগে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যে পরিগণিত ছিল। এক্ষণে উহা ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে। অধুনা, কোথাও উল্কাপাত হইয়াছে, সংবাদ আসিলে খবরের কাগজে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এতাবৎ কাল প্রকৃতির এই নৈসর্গিক ব্যাপারটিকে উপেক্ষা ও অবহেলা করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি এ বিষয়ে দু'একজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। গত ২৬শে নভেম্বর রাত্রিকালে 'মিচিগান' হ্রদে যে বৃহৎ উল্কাপাত হইয়াছে, উহা লইয়া আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলিতেছে। এই উল্কাপাত হইবার সময় একটা ভীষণ শব্দে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত হইয়াছিল। মিচিগান, ইণ্ডিয়ানা ও ইলিনয় প্রদেশের সমস্ত বাড়ী-ঘর ঘন-ঘন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ভূমিকম্প হইতেছে মনে করিয়া প্রাণভয়ে লোকজনেরা যে যার গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। একটা প্রচণ্ড আলোক-দীপ্তি প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল। অনেকে মনে করিয়াছিল, বোধ হয় কোন বৃহৎ কলকারখানায় হঠাৎ আগুণ লাগিয়া ইঞ্জিন বা বয়লার ইত্যাদি কিছু একটা সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেল! ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী একটী বাতিঘরের (Light house) জনৈক দীপরক্ষক এই উল্কাপতন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সে বলিয়াছে, "আমি দেখিলাম, যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিগোলক ভীষণ শব্দ করিতে-করিতে প্রচণ্ড বেগে হ্রদের ভিতর আসিয়া পড়িল।" এই যে অগ্নিগোলক বা উল্কাপিণ্ড, এই বস্তুটি কি, তাহা জানিবার জন্য হয় ত অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে। উহা লৌহ ও প্রস্তর-মিশ্রিত এক প্রকার ধাতব পদার্থবৎ বস্তু। এই ধাতুপিণ্ড গ্রহান্তর হইতে পৃথিবীর আকাশমণ্ডলে সঞ্চারিত হইয়া বায়ুর সংঘর্ষে ভীষণ উত্তপ্ত হইয়া উঠে, এবং অগ্নিময় দীপ্তি বিকীর্ণ করিতে থাকে। উহা ভীষণ বেগে পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়ে বলিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। পতনকালে ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডল সহসা উত্তপ্ত হইয়া উঠে বলিয়া বজ্রাঘাতের ন্যায় উল্কাপাতেও ভীষণ শব্দ উত্থিত হয়।

য়ুরোপের অনেক বড়-বড় সহরের যাদুঘরে শীতল উল্কাপিণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরের যাদুঘরে সংরক্ষিত উল্কাপিণ্ডটিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। উহা ১৮৯৭ সালে গ্রীণল্যাণ্ড হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। উহা ওজনে প্রায় ৩৬৷৷০ টন (১০২২ মণ); আকারে প্রায় ১১ ফিট লম্বা ৫ ফিট চওড়া ও ৬ ফিট ৯ ইঞ্চি উঁচু! অভিজ্ঞ ধাতুবিদেরা বলেন, এই প্রকাণ্ড উল্কাপিণ্ড যখন প্রথম এই পৃথিবীর

বুকে আসিয়া পড়িয়াছিল, তখন ইহা ওজনে ও আকারে আরও বৃহত্তর ছিল; কারণ, গ্রীণল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসীরা সকলেই অগণিত শতাব্দী ধরিয়া তীরফলক নির্ম্মাণার্থ ইহারই অংশ ভাঙিয়া ভাঙিয়া লইয়াছে।

(Scientific American.)

৬। ছেলেদের খেল্‌না

লড়াই'য়ের আগে পৃথিবীশুদ্ধ ছেলেদের খেল্‌না প্রায় অধিকাংশই জার্ম্মাণী থেকে তৈরি হ'য়ে আস্‌তো; কিন্তু যুদ্ধ বাধিবার পর জার্ম্মাণীর সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য এক রকম বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায়, বাজারে আর জার্ম্মাণীর তৈরি সে হরেকরকমের চমৎকার খেলনা কিছু দেখ্‌তে পাওয়া যেতো না, কেবল জাপানী খেল্‌না কতকগুলো আস্‌তো। তা'পেয়ে ছেলেরা কোন দেশেই তেমন সুখী হ'তো না। এই জন্যে ১৯১৭ সাল থেকে আমেরিকা আস্তে-আস্তে তার নিজের দেশের ছেলেদের জন্যে নিজেরা খেল্‌না তৈরি করতে সুরু করে দিয়েছিল। এবার ১৯১৯ সালের 'বড়দিনের' উৎসবে আমেরিকার কোন ছেলের হাতেই আর বিদেশী খেল্‌না কিনে এনে দিতে হয় নি। রং-বেরঙের কাচের ছোট-বড় রঙ্গীন 'বল', যা এতদিন জার্ম্মাণীর একচেটে সম্পত্তি ছিল, অপরিসীম অধ্যবসায়ের গুণে, প্রাণান্তকর চেষ্টায় ও যত্নে আমেরিকা এবার তাও তৈরি করে ফেলেছে! বড়দিনের পার্ব্বণে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের খুসি কর্ব্বার জন্যে ক্রোরপতি থেকে দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত সবাই যথাসাধ্য খরচ করে কিছু না কিছু খেল্‌না কিন্‌তো; সুতরাং অনেকগুলো টাকা প্রতি বছর দেশ থেকে বেরিয়ে জার্ম্মাণীর পকেটে চ'লে যেতো। এখন থেকে আমেরিকাকে আর সে ক্ষতিটুকু সহ্য করতে হবে না! আর আমরা খেল্‌না তো দূরের কথা—নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলোর জন্যেও বিদেশের মুখ চেয়ে বসে আছি! (Scientific American)

৭। গৃহস্থের গৃহ

আজকাল আমাদেরই দেশের গৃহস্থ ভদ্রলোকদের পক্ষে যেমন ছোট বাড়ীর অভাবে সহরে বাস করা অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে, য়ুরোপের মধ্যবিত্ত লোকেরা অনেক দিন থেকেই এ অভাব ভোগ করে আস্‌ছে। তবে তাদের সামাজিক প্রথা অনুসারে মেয়েদের জন্যে কোন রকম আব্‌রু দরকার হয় না বলে এক বাড়ীর ভেতরেই অনেকগুলি পরিবার এক সঙ্গে বাস করতে পারে; কিন্তু আমাদের সেটি হবার যো নেই। নিতান্ত অভাবে না পড়লে তিন-চারটী পরিবার কখন একসঙ্গে এক বাড়ীতে থাক্‌তে রাজী হয় না। বড় জোর দু'ঘর একসঙ্গে থাক্‌তে চায়, তাও আবার আপনা-আপনির মধ্যে হ'লেই ভাল হয়। য়ুরোপে এসব হাঙ্গামা নেই বটে; কিন্তু বাড়ীর ভাড়া বড্ড বেশি বোলে, যাদের উপার্জ্জন অল্প, তারা একখানি ঘরের বেশী ভাড়া নিতে পারে না। কাজে-কাজেই সেই একখানি ঘরের ভেতরই কাঠের বেড়া দিয়ে তারা একদিকে একটু বস্‌বার জায়গা, একদিকে শোবার, একদিকে রাঁধবার, আর একদিকে খাবার মত বন্দোবস্ত করে নেয়। একখানি ঘরকে আবার এমন কোরে ভাগ করে নিতে হয় বোলে, স্থান বড় সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়ে; সুতরাং স্থানাভাবে তাদের অত্যন্ত কষ্ট পেতে হয়। এই স্থানাভাবের কষ্ট ও অসুবিধা দূর করবার জন্যে য়ুরোপ নানা উপায় উদ্ভাবন কর্‌ছে। সঙ্কীর্ণ স্থানের উপযোগী ছোট-ছোট সব আস্‌বাব তৈরি হয়েছে। অনেক জিনিষ এমন কৌশলে তৈরি হয়েছে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন কোরে দু'তিন রকম প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়; যেমন শোবার খাটখানিকে একটু অদল-বদল কোরে বিলিয়ার্ড খেল্‌বার টেবিলে পরিণত করা বা বইয়ের আলমারীটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বস্‌বার কোচ্‌ কোরে ফেলা ইত্যাদি। কিন্তু এতেও বিশেষ সুবিধা হ'য় না বোলে সম্প্রতি একজন আমেরিকান একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন কোরেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত এই নূতন উপায়ে একখানি ঘরকেই গৃহস্থের ইচ্ছা ও আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন কোরে বসবার, শোবার, খাবার, রাঁধবার, পড়বার, বা স্নান করবার ঘরে রূপান্তরিত কোরে নেওয়া চল্‌বে। ব্যাপারটী শুন্‌তে খুব অদ্ভুত বটে, কিন্তু উপায়টি অতি সহজ। তিনি একটী আবর্ত্তনীয় কক্ষ (Revolving apartment) নির্ম্মাণ করেছেন। এই আবর্ত্তনীয় কক্ষটি আবার চার-পাঁচটী ছোট-ছোট কক্ষে বিভক্ত। একটাতে একখানি মোড়া খাট (folding bed) আছে, সেখানি ইচ্ছামত টেনে পাতা যায়, আবার মুড়ে তুলে রাখা যায়। একটীতে আয়না ও দেরাজওয়ালা একটা আলমারী আছে। একটিতে রাঁধবার ও খাবার সরঞ্জাম

মাকড়সার তৈরি মাছধরা জাল

মাকড়সার জালে মাছধরা

জলে ভাসা চেয়ার'

মৎস্য-তরী
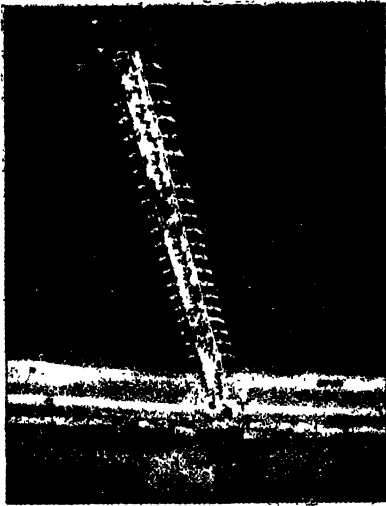
সমাপ্তপ্রায় সেতু

(৬০০ শত ফুট উচ্চ হইতে 'বায়ুপোত' গৃহীত চিত্র)
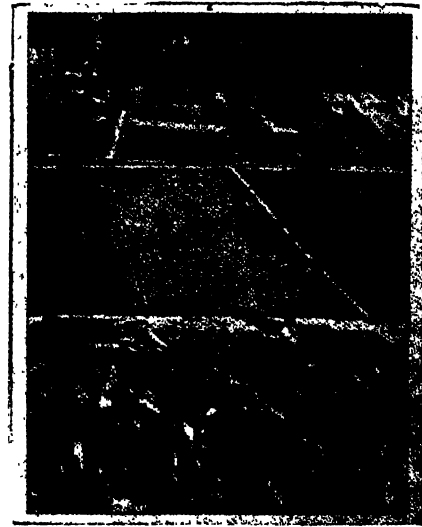
এক ঘণ্টায় সম্পূর্ণ সেতু

(৩৬০০ শত ফুট উচ্চ হইতে বায়ুপোতে গৃহীত চিত্র)

নূতন মানচিত্র
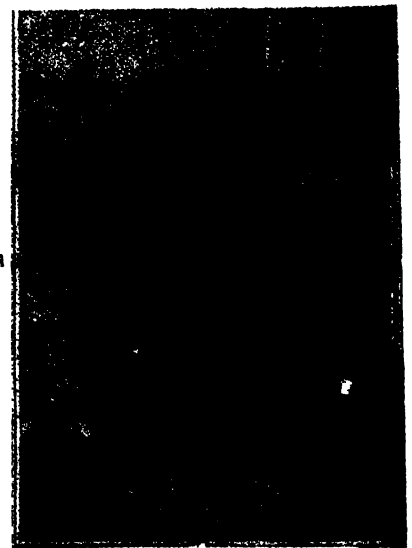
পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম উল্কাপিণ্ড

দেশের ছেলেদের জন্য আমেরিকায় খেল্‌না নির্ম্মাণ হইতেছে
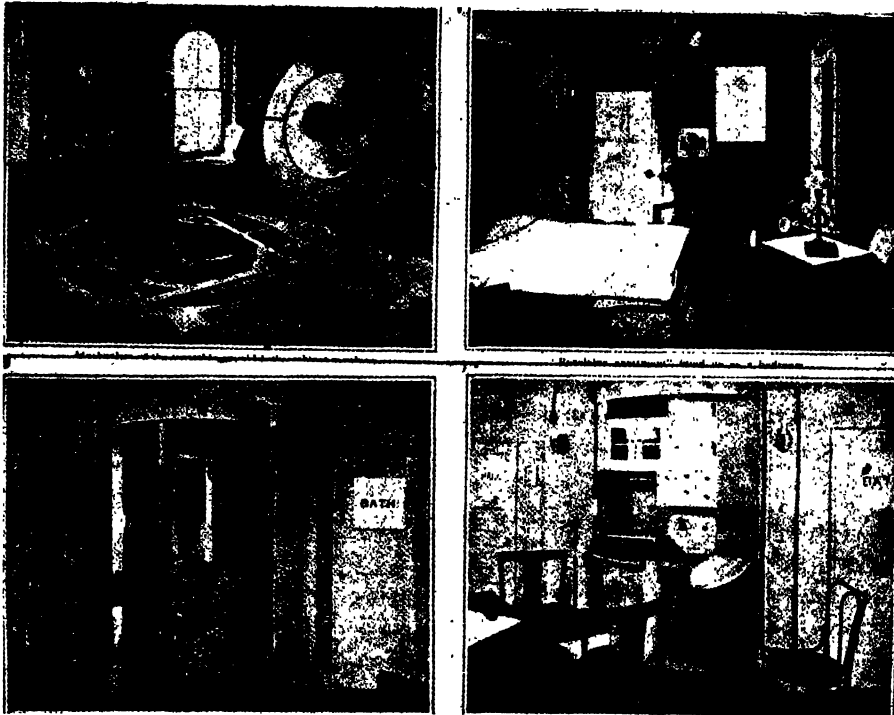
ক—গৃহকোণে "আবর্ত্তনীয় কক্ষ" স্থাপনের জন্য গোলার ছিদ্র ও তদনুসঙ্গিক 'ফ্রেম'। খ— মোড়া খাট টানিয়া গৃহটীকে শয়নকক্ষে পরিণত করা হইয়াছে। গ—খাটখানিকে মুড়িয়া রাখিয়া কক্ষটীকে প্রসাধনাগারে পরিণত করা। ঘ— কক্ষটীকে ভোজনগৃহ ও রন্ধনশালায় পরিণত করা।

—কক্ষটীকে পাঠাগারে পরিণত করা।

পুর্ণসঞ্জীবন। (অর্দ্ধঘণ্টা পরে)

সমস্ত বন্দোবস্ত করা; একটীতে লিখবার টেবিল, 'বুক-কেস্' ইত্যাদি সাজানো আছে। ঘরের এক কোণে কাঠের মেঝে, এই আবর্ত্তনীয় কক্ষের মাপে গোল করে কেটে ফেলে, সেখানে এই নূতন আস্‌বাবটির জন্যে একটী 'ফ্রেম' বসাতে হয়। সেই 'ফ্রেমে' আঁটা প্যাঁচের উপর এই আবর্ত্তনীয় কক্ষটি সজ্জিত থাকে। সাম্‌নে একটি কাঠের 'পার্টিশান' দেওয়া। পার্টিশানের একটী দিক এই আবর্ত্তনীয় কক্ষের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মাপে কাটা আছে। অন্যদিকে স্নানের ঘরের বন্দোবস্ত। পার্টিশানের যে অংশটুকু খোলা থাকে, সেইখানে, আবর্ত্তনীয় কক্ষের যখন যে প্রকোষ্ঠটি ঘুরিয়ে রাখা হয়, তখন সমস্ত ঘর-খানিই সেই প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে।

(Scientific American.)

বিমলিনা কমলিনী।

৮। ঝরা ফুলের মরা-বাঁচা।

মানুষ মাত্রেই ফুলের ভক্ত। ফুল ভালবাসে না এমন লোক বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। বাগান অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে অনেকেই ফুল হাতে কোরে বাড়ী ফেরেন। ফুলগুলি যদি খুব ভাল হয়—তাহ'লে তাঁরা বাড়ীতে এসে, একটা ফুলদানীতে অথবা ফুলদানীর অভাবে কাঁচের গেলাসে, শিশি বোতলে, কিম্বা নিদেন-পক্ষে ঘটিবাটিতেও একটু জল দিয়ে সেগুলি সাজিয়ে রাখেন,—যাতে তাঁর সেই প্রিয় পুষ্পগুচ্ছ অন্ততঃ আরও একটা দিন তাজা থাকে! কিন্তু অনেক ফুলবালা আবার এমন কোমলাঙ্গী আছেন যে, ডাল-ভেঙে তুলে আন্‌তে না আন্‌তেই পথের মাঝেই একেবারে এলিয়ে পড়েন; বাড়ী পর্য্যন্ত আর টাট্‌কা এসে পৌছোন না। ফুলের প্রেমিকরা তাতে প্রাণে বড় ব্যথা পান। বেল্‌ওয়ারী কাঁচের সৌখীন ফুলদানীতে সুবাসিত শীতল জলে সযত্নে স্থাপন করলেও সে সব ফুলের দুর্জ্জয় অভিমান কিছুতে দূর হয় না,—তারা তবুও তেম্‌নি মলিন মুখে মূর্চ্ছিতার মত একপাশে নুয়ে পড়ে থাকে। তাদের যদি কেউ মানভঞ্জন কোরতে চান, বিরস কুসুমকুলের সেই নীরব পল্লবাধরে আবার যদি কেউ সরস প্রাণের প্রফুল্ল সজীবতা ফিরিয়ে আনবার অভিলাষী হন, তাহ'লে তাঁকে শীতল জলের পুষ্পাধারটী সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ কোর্‌তে হবে, আর তার বদলে গরম জলের পাত্র ব্যবহার কোর্‌তে হবে! ফুটন্ত জলের সঙ্গে অল্প খানিকটা সুরাসার (alcohol) মিশ্রিত করে তার ভেতর ফুলের গুচ্ছ বসিয়ে রাখ্‌লে আধ ঘণ্টার মধ্যেই শুষ্ক ফুল আবার মুঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে!

(Scientific American)

যুদ্ধ-বন্দীর আত্মকাহিনী

[শ্রীআশুতোষ রায়]

(পূর্ব্বাভাষ—তৃতীয় পর্ব্ব)

বেদুইন

একদিন খবর পাইলাম, বসোরার নীচে সাটেল্ আরব নদীর মধ্যে একটি মাইন (mine জল-নিহিত বোমা) পাওয়া গিয়াছে। সেটাকে নষ্ট করা হইবে। মাইন্ জিনিসটা কি এবং কিরূপে উহার ধ্বংসসাধন হইবে, তাহা দেখিবার জন্য আমরা সোৎসাহে নদী-তীরে সমবেত হইলাম। যেখানে মাইন (mine) ছিল, তাহার চারিপাশ হইতে জাহাজগুলিকে দূরে সরাইয়া দেওয়া হইল এবং সতর্কতা সহকারে বন্দুক ছোড়া হইতে লাগিল। মাইনটী আমরা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ভয়ানক একটা শব্দ হইয়া কর্দ্দমাক্ত জলরাশি প্রায় পঁচিশ ফিট ঊর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত হইল। এইরূপে মাইনটী নষ্ট করা হইল। এইরূপ মাইন ভূমধ্য সাগরের অনেক স্থানেই জার্ম্মাণেরা রাখিয়া দিয়াছিল। এই সব মাইনের সহিত জাহাজের সংঘর্ষ হইলেই, জাহাজগুলা কিরূপ দশা প্রাপ্ত হইত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতাম। এরূপ ঘটনায় জাহাজের একটী প্রাণীও রক্ষা পাইত না। আলি মুসা হইতে (সাটেল আরব যে স্থানে পারস্য উপসাগরে মিলিত হইয়াছে)

টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিসের সঙ্গমস্থল (কুর্ণার নিকট)

যুদ্ধস্থল (সাটেল আরবে ১৫ই ও ১৭ই নভেম্বর)
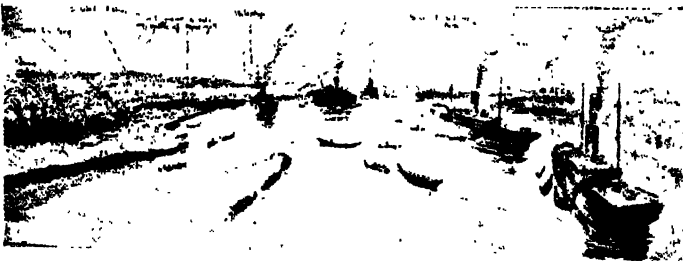
বসোরা প্রায় সাতষট্টি মাইল। এই স্থানের মধ্যে কোন মাইন ছিল না, তাই রক্ষা।

ষষ্ঠ ডিভিসনের সঙ্গে কাজ করিবার জন্য আমরা আদিষ্ট হইয়াছিলাম। আসারে (Ashar) আমাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, এই ষষ্ঠ ডিভিসন্ মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সর্ব্ব-বিষয়ে অগ্রণী হইবে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে

স্বীয় নাম অঙ্কিত করিবে। কিরূপে তাহা সংসাধিত হইয়াছিল, পাঠক তাহা ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন। 'আসারে' প্রায় দেড় মাসকাল অবস্থানের পর আমাদের যাত্রার ঢোল বাজিয়া উঠিল। ৭ই জুন্ 'কুর্ণা' অভিমুখে আমাদের অগ্রসর হইবার দিন স্থির হইল। তখন নদীর কূলে কূলে দশখানা ছোট ষ্টীমার, কুড়িখানা ফ্লাট (flat বা বড় নৌকা) লইয়া শ্রীমন্তের ডিঙ্গি সাজাইয়া সিংহল যাত্রার ন্যায় যাত্রা করিল। জেনারেল ফ্রাই (General Fry) হইলেন আমাদের কর্ত্তা। আমি যে ষ্টীমারে ছিলাম, তাহাতে একটা পুরা গোরা পণ্টন (Norfolk Regiment) স্থান লাভ করিল। আমাদের অগ্র পশ্চাতে দুইখানা ক্রুইজার (cruiser) রক্ষীবেশে গমন করিতে লাগিল। যুদ্ধ-জাহাজগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। উপরের রং বরফের মত সাদা। কিন্তু ইহার ভিতরে যে সকল ভীষণ ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র (কামান ইত্যাদি) সজ্জিত আছে, তাহা ভাবিলেও আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তাই মানুষের উপর দেখিয়া ভিতরের কালিমা সব সময়ে বুঝিতে পারা যায় না। আরও ২।৩ খানি কামানবাহী ছোট-ছোট ষ্টীমার সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। এইরূপ আড়ম্বরে

আসার প্রণালী

কুর্ণার কাষ্টম হাউসের ধ্বংসাবশেষ
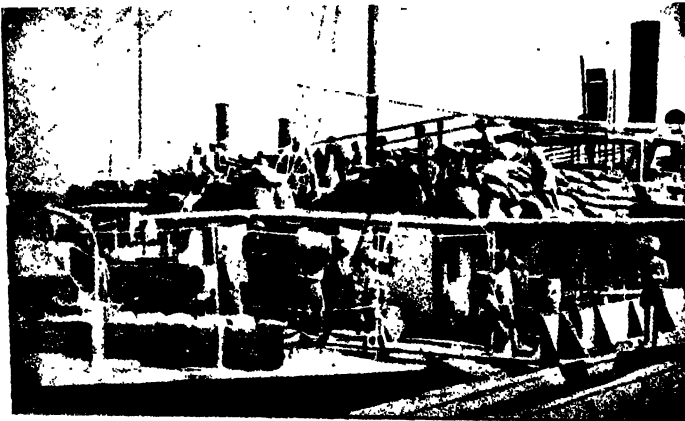
ষ্টীমার প্রস্তুত—কুর্ণায়

আমরা গমন করিতে লাগিলাম। কিছুদূর যাইবার পর, একখানা উড়ো-জাহাজ নদীর উভয় পার্শ্বে শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য আমাদের অগ্রগামী হইল। উড়ো জাহাজখানা অধিক ঊর্দ্ধ দিয়া যায় নাই। নদী-তীরবর্ত্তী আরব-পল্লীসমূহের বালক এবং স্ত্রীলোকেরা ষ্টীমারগুলি দেখিবার জন্য উৎফুল্ল হইয়া নদীতীরে আসিতেছিল; কিন্তু যেমন দেখিল যে প্রকাণ্ডকায় কি একটা দৈত্য তাহাদের মাথার উপরে উড়িয়া আসিতেছে, অমনি প্রাণভয়ে চীৎকার

করিয়া গ্রামের দিকে দৌড়িতে লাগিল। সে এক অভিনব দৃশ্য। দেখিয়া মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের 'জিন্' দানবের ধারণা তাহাদের মনে এখনও আছে; এবং তাহারা যে মানুষকে উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে, উড়ো-জাহাজ দেখিয়া তাহাও তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আমাদের ষ্টীমার-বাহিনী অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল। ভয়, পাছে কোথা হইতে শত্রু আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ করে। এইরূপে তৃতীয় দিবসে আমরা 'কুর্ণা'য় পৌছিলাম। তখন বেলা পাঁচটা,—দিবা অবসান প্রায়। তুর্কীরা বোধ হয় আমাদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। যেমন ষ্টীমার তীরের নিকটবর্ত্তী হইল, অমনি গুড়ুম্ করিয়া একটা তোপধ্বনি হইল। সে আওয়াজ লাট-বেলাট বা রাজা-মহারাজার অভ্যর্থনার জন্য ফাঁকা তোপধ্বনি নয়। তাহাতে মূর্ত্তিমান যম মহাশয়ের অধিষ্ঠান ছিল। তাই কবির

কুর্ণায় তুরস্ক অফিসারগণ

আলেপ্পোয় দরবেশদিগের নৃত্য

কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়, "কাঁপাইয়া খেজুর-বন, কাঁপাইয়া টিগ্রিস জল (Tigric water) উঠিল সে ধ্বনি।" এইরূপ একঘণ্টা ধরিয়া অভ্যর্থনার জের চলিল, টিগ্রিস্-নদী-তীরে পর্য্যবেক্ষণ-গৃহ (observation post) নির্ম্মিত হইয়াছিল। একজন কর্ম্মচারী উক্ত গৃহে উঠিয়া, দূরবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া, বিশেষ কিছুই নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। আমাদের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনার উত্তরে কিছুই বলা হইল না, অর্থাৎ প্রত্যুত্তরে একটা তোপও দাগা হইল না। তুর্কীর গোলা আসিয়া তীরস্থ রসদাদির গুদামের নিকট পড়িল বটে, কিন্তু একটাও ফাটিল না। দুইজন শাস্ত্রী প্রহরী অল্পাধিক আহত হইল মাত্র। ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল,—তুর্কীর অভ্যর্থনাও সে দিনের মত শেষ হইল। আমাদের নৌ-বহর টিগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিসের

কুর্ণায় তুরস্ক বন্দী

কুর্ণায় বন্দুক গ্রহণ

সঙ্গম-স্থলে গিয়া নঙ্গর করিল; এবং আমরাও আহারাদি সমাধা করিয়া, প্রাতঃকালে কি হয় দেখিবার আশায়, বিশ্রামলাভে মনোযোগী হইলাম।

এই অবকাশে পাঠকগণকে কুর্ণার বিষয় কিছু বলিয়া রাখি। কুর্ণা বা গুর্ণা (Kurna) টিগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিস্ নদীর সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। এই স্থান বসোরা হইতে ৪৯ মাইল। দক্ষিণদিকে টিগ্রিস এবং বামভাগে ইউফ্রেটিস প্রবাহিত। দুটিই সাট্‌ল আরবে মিলিত হইয়াছে; অথবা এই নদীদ্বয়ের মিলিত নাম সাট্‌ল-আরব। লক্ষ্মী-সরস্বতী যেন নারায়ণ পাদপদ্মে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছেন,—একজন প্রকৃতিমুখরা, অপরা চঞ্চলা। নদীদ্বয়ও সমধর্ম্মা বলিয়া

কুর্ণার যুদ্ধের মানচিত্র
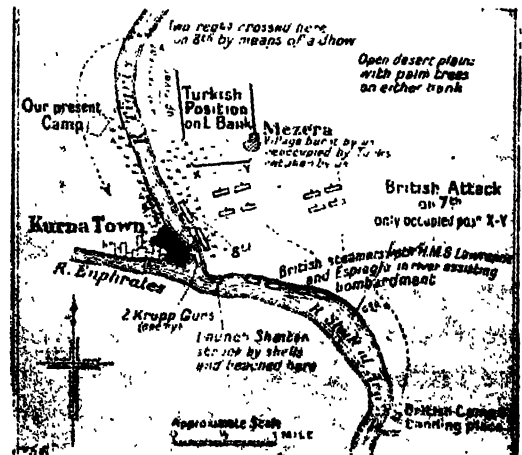
বোধ হয়। আরবেরা (Tigris) টাইগ্রিসকে তিগ্রিজ্ এবং (Euphrates) ইউফ্রেটিস্‌কে এফ্‌রাদ বলে। এইটাই বাইবেলোক্ত বিখ্যাত নদী। সুতরাং এহেন নদী-দ্বয়ের সঙ্গমস্থল যে বরুণা ও অসির সঙ্গমস্থলে অধিষ্ঠিত বারাণসী অথবা ত্রিবেণীসঙ্গমের প্রয়াগের স্থায় বিখ্যাত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই কুর্ণাতেই নাকি স্বর্গোত্থান (Garden of Paradise) ছিল; এবং বাইবেলোক্ত মানবজাতির আদি পিতামাতা আদম এবং ইভ বা হবা (Adam and Eve) এই ইদন্ উত্থানে (Garden of Eden) বাস করিতেন। এইখানেই শয়তানের পরামর্শে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া তাঁহাদের স্বর্গচ্যুতি ঘটে, এবং তাঁহারা ইদন উত্থান হইতে বহিষ্কৃত হন। পাপের সংস্পর্শ না কি এই প্রথম। সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফলও না কি আপেল (apple) বা সেভ ফল ভিন্ন আর কিছুই নয়। একটা পুরাতন বৃক্ষ দেখাইয়া দোভাষীরা (Interpreter) বলিল, 'ইহাই সেই জ্ঞানবৃক্ষ'। বৃক্ষটি দেখিয়া আমাদের কিন্তু তত প্রাচীন বলিয়া মনে হইল না; এবং এমন কোন বিশিষ্ট উত্থানও দেখিলাম না, যাহাকে প্রকৃত উত্থান নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এইখানেই যে স্বর্গোত্থান প্রতিষ্ঠিত ছিল, তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেবলমাত্র একটা মিল এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাইবেল-লিখিত ইডন্ উত্থান নামক স্থান টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিসের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত; এবং এই স্থানটিও উক্ত বর্ণনানুরূপ। ইহা হইতেই কেবল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ইহাই সেই বাইবেল-বর্ণিত স্বর্গোত্থান-সমন্বিত স্থান। যাহা হউক, এহেন স্থানে মশার যে কি উপদ্রব তাহা বলিবার কথা নয়। মাঁনুষের আদি পিতা-মাতার বাসোপযোগী উপযুক্ত স্থান বটে!

এখন আসল কথার অনুসরণ করা যাক। কবিদের নিদ্রাভঙ্গ হয় পাখীর সুমধুর প্রভাতী-সঙ্গীতে,—রাজারাজড়ার বা বন্দীর স্তুতিগানে,—আর আমাদের ঘুম ভাঙ্গিল বজ্র-নিনাদী গভীর তোপ-গর্জ্জনে। ইহা তুর্কীর "মারহবা" বা প্রভাতী অভিবাদন! আমরা ত্রস্তভাবে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম। এইবার মুহুর্মুহু তোপধ্বনি হইতে লাগিল। ৮।১০টা আওয়াজের পর আমাদের পক্ষ হইতে প্রত্যভিবাদন করা হইল। আমাদের অগ্র-পশ্চাতে যে দুই যুদ্ধ-জাহাজ প্রহরীরূপে আসিয়াছিল, তাহারই পিছনের খানা হইতে এই (সম্ভাষণ) প্রত্যুত্তর। এ পর্য্যন্ত তুর্কীর যত গুলি গোলা আসিল, কোনটি ফাটিল বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু আমাদের গোলা গিয়া তুর্কী লাইনে পড়িয়া মহা হৈ-চৈ বাধাইয়া দিল। এইবার আমাদের উভয় রক্ষী-ক্রুইজারই পর-পর কামান দাগিতে লাগিল। তুর্কীদের ঘনঘন তোপধ্বনি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। আমরা দূরবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে যাহা দেখিলাম, তাহা অতি বিস্ময়কর! আমাদের গোলা গিয়া যখন শত্রু-শিবিরে ফাটিতেছে, তখন অনেকে হাত-পা ছড়াইয়া ভূমির উপর আপনার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ করিতেছে। কুর্ণা হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে, দ্বীপের মত একটা স্থানে তুর্কীরা আড্ডা গাড়িয়াছিল। সে স্থানটী কিছু উঁচু,—একটা টিলার মত। উক্ত স্থানের আড়ালে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তুর্কীরা অবস্থান করিতেছিল। সকল জায়গায় কিছু আবরণ ছিল না, সুতরাং গোলার কাজ বেশ ভালরূপ হইতেছিল। আবার নদীতীরে একটা প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান হইতে আমাদের প্রায় তিনশত সিপাহী এক-সঙ্গে বন্দুক ছুড়িতেছিল। এইরূপে ভোর পাঁচটা হইতে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ হইতে গোলাবর্ষণ হইবার পর তুর্কীরা শ্বেত পতাকা উড়াইয়া দিল। তখন আমাদের সিপাহীরা দলে-দলে মাহেলায় (mahella) করিয়া উক্ত দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইল এবং কিছুক্ষণ পরে দলে-দলে তুর্কী বন্দীদিগকে লইয়া আসিল। সর্ব্বসমেত সাতশত তুর্কী ও আরব ঐ দিনের যুদ্ধে বৃটিশ-রাজের হস্তে বন্দী হইল এবং কতক পলাইয়া গেল।

তথায় যুদ্ধশেষে দুই ঘণ্টা অবস্থানের পর পলায়নপর শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্ত আমাদের উপর আদেশ আসিল। বসোরার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্তা বা ওয়ালি সুভি-বে (Wail Subhi-Bey) কুর্ণায় তুর্কী-জেনারল্ হইয়া সৈন্ত পরিচালনা করিতেছিলেন। একখানা ক্রুইজার বন্দীদিগকে পাহারা দিয়া বসোরার দিকে রওয়ানা হইল—অপরখানি আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। ছোট-ছোট ২।৩ খানি গান্-বোট্ (Gun Boat) আমাদের সঙ্গে রহিল। কিয়দ্দূর যাইবার পর দেখিলাম, একখানা তুর্কীর ক্রুইজার গোলার আগুনে দাউ-দাউ জ্বলিতেছে। তাহার প্রধান কর্ম্মচারী (অধ্যক্ষ) এবং আর কতকগুলি নাবিক আমাদের ক্রুইজার কর্তৃক

ধৃত এবং বন্দী হইয়াছে। আমাদের ক্রুইজারের একটা কামরায় সামান্য রকম অনিষ্ট হইয়াছে। আমরা ধীরে-ধীরে আমারার (Amara) দিকে অগ্রসর হইলাম। পলায়মান তুর্কীরা যে আমাদের আগে-আগেই যাইতেছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ হরিৎ-তৃণাচ্ছাদিত কতকগুলি পর্ণকুটীর নদী-তীরবর্ত্তী কোন-কোন স্থানে দেখিতে পাইলাম। তথায় ২।৪টি কুকুর প্রহরীস্বরূপ ছিল মাত্র। আমাদের আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে তাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। গুপ্তচর সংবাদ আনিল যে, পলায়নপর কতকগুলি তুর্কী-সৈন্য নাছিরিয়ার দিকে এবং আর কতকগুলি আমারার দিকে গিয়াছে। এই সব দেখিয়া-শুনিয়া একখানি গান্‌বোট আমাদের অগ্রবর্ত্তী হইল। জলপথ নিরাপদ কি না তাহা দেখা, এবং শত্রুর গতি-নির্দ্ধারণ করা এই গমনের উদ্দেশ্য। এইরূপে আমরা ক্রমাগত চলিয়াছি। নদীর উভয় তীরে দর্শনীয় কোন বস্তু নাই। তৃতীয় দিন বেলা প্রায় ৯টার সময় কি একটা কালো জিনিস নদীতে ভাসিতে দেখিয়া আমাদের ষ্টীমারের কম্যান্ডার তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলেন, অমনি সশব্দে পঙ্কিল জলরাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখন বুঝা গেল, সে একটা মাইন্ (জল-নিক্ষিপ্ত বোমা); পলাইবার পূর্ব্বে তুর্কীরা নদীমধ্যে উহা রাখিয়া গিয়াছে। খুব একটা ফাঁড়া কাটিয়া গেল; নতুবা সেই দিনই একসঙ্গে কিঞ্চিদধিক এক সহস্র লোক টিগ্রিস্ নদীগর্ভে চিরতরে সমাধিলাভ করিতাম! কর্ম্মভোগ অনেক আছে, তাই সে যাত্রা রক্ষা পাইলাম। এই ঘটনার পর হইতে ষ্টীমার আরও ধীরে-ধীরে এবং খুব সতর্কতার সহিত চলিতে লাগিল। এই দিকে নদীর পরিসরও এক-এক স্থানে অতি অল্প। তবে বেশ গভীর বলিয়া ষ্টীমার গমনের কোন অসুবিধা ছিল না।

চতুর্থ দিনে বেদুইন বা বদ্দু (Bedouin) আরবদিগের কতকগুলি কাল কম্বলের তাঁবু দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই জাতি লুঠেরা এবং অসভ্য। তাহারা এক সঙ্গে অনেকগুলি ষ্টীমার জীবনে কখন দেখে নাই। মেয়ে-পুরুষে আনন্দ-কোলাহল করিয়া নদীতীরে ছুটিয়া আসিল। বালক-বালিকারা ষ্টীমারের সঙ্গে-সঙ্গে নদীতীর দিয়া ছুটিতে লাগিল এবং মুখ ও পেট দেখাইয়া ইসারায় খাদ্য যাঞ্চা করিল। গোরা-সৈন্যদল কৌতূহলপরবশ হইয়া মাংসের টিন, সিগারেটের বাক্‌স, পাঁউরুটী ফেলিয়া দিতে লাগিল। বালক-বালিকাগণ উক্ত জিনিসগুলি পাইয়া মহা আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিল, পুরুষেরা তাহাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল। সে নাচ যেমন-তেমন নয়—উদ্দাম নৃত্য। এইরূপ নাচ আরব দরবেশদিগের মধ্যে একবার দেখিয়াছিলাম এবং চীন-লামাদিগের মধ্যেও দেখিয়াছি; এই সবগুলিই একই ধরণের নৃত্য বলিয়া মনে হয়।

পঞ্চম দিন প্রাতঃকালে দূরে বৃক্ষরাজি মধ্যে একটা সবুজ রংয়ের গুম্বজ দেখিতে পাইলাম। বালসূর্য্যরশ্মি উহার উপর প্রতিফলিত হইয়া আরও মনোরম দেখাইতেছিল। ক্রমে ষ্টীমার নিকটবর্ত্তী হইয়া উক্ত গুম্বজের নিকট নঙ্গর করিলে, আমরা উহা ভালরূপে দেখিবার সুযোগ পাইলাম। গুম্বজটি ঠিক নদীতীরে নির্ম্মিত। শুনিলাম, এটা আরমানীদের পয়গম্বর এজ্‌রার সমাধিস্থান (Ezra's Tomb); সুতরাং আরমানিদের প্রধান তীর্থস্থানের মধ্যে একতম। বৎসরের মধ্যে নানাস্থানবাসী বহু আরমানি স্ত্রী-পুরুষের এখানে সমাগম হইয়া থাকে। সমাধিটি সবুজ বর্ণের চীনামাটির টাইল দ্বারা প্রস্তুত। যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। সেদিনকার মত এইখানেই আমাদের বিশ্রাম করিবার হুকুম হইল।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন রাত্রিশেষে শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত ধবল গঙ্গা-সৈকতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। প্রতিপদের পূর্ণচন্দ্র দূর দিগন্ত রজতাভ করিয়া তুলিয়াছিল, শীতল লঘু নৈশ সমীরণ বীচিবিক্ষুব্ধ ভাগিরথী-বক্ষ ঈষৎ স্পর্শ করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছিল। মধ্যে-মধ্যে নিশাচর পক্ষী কর্কশ রবে সে স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের মাধুর্য্য নষ্ট করিতেছিল। নূতন নগরী মুর্শিদাবাদের পদ-প্রান্তে শীতকালে ভাগিরথী শীর্ণকায়া, স্বল্পতোয়া। আর্দ্র-সৈকতে বসিয়া সে ব্যক্তি গুন্‌গুন্‌ করিয়া গাহিতেছিল এবং ক্ষিপ্রহস্তে সিক্ত বালুকা লইয়া অপূর্ব্ব মন্দির ও প্রাসাদ-শিখর নির্ম্মাণ করিতেছিল।

বহুদূরে আর একজন পুরুষ আদ্র সৈকতাবলম্বনে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছিল। দীর্ঘকার পুরুষ তাহা লক্ষ্য করে নাই। আগন্তুক নিকটবর্ত্তী হইলেও তাহার পদশব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। দূর হইতে জ্যোৎস্না-ধারায় স্নাত সুগঠিত অবয়ব দেখিয়া আগন্তুক চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। সহসা সুদূর দিগন্ত কম্পিত করিয়া সঙ্গীত উত্থিত হইল; স্তব্ধ জগত পুলকিত হইয়া উঠিল; নিশ্চল পাষাণ যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। দীর্ঘাকার পুরুষ তাহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—

"মহেশং সুরেশং সুরারাতি নাশং
বিভুং বিশ্বনাথং মহাদেবমেকং
স্মরারিং স্মরামি।"

বিপুল পুলকে দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল, জ্যোৎস্না-ধবলিত বীচিবিক্ষুব্ধ গঙ্গাবক্ষে তাহার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইল। গায়কের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল; রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "ভাই!" কম্পিতকলেবর দৃঢ়ালিঙ্গনে বদ্ধ হইল। নিশ্চল জগৎ যেন আবার স্তব্ধ হইল।

অর্দ্ধদণ্ড পরে আগন্তুক কহিল, "চলিয়া আসিলি ত বলিয়া আসিলি না কেন?" দীর্ঘাকার পুরুষ কহিল, "বলিয়া ত আসিয়াছি।"

"কই বলিয়া আসিয়াছিলি ভাই? স্পষ্ট করিয়া যদি বলতিস?"

"বলিলে কি এত সহজে ছাড়ান পাইতাম ভাই?"

"আমি কি তোকে ধরিয়া রাখিতে পারিতাম?"

"ধরিয়া না রাখ, তুমি, বৌদিদি ও দুর্গা কাঁদিয়া ও চীৎকার করিয়া গ্রামের অর্দ্ধেক লোক একত্র করিতে। তখন আমার ও ভূপেনের পক্ষে সহজে চলিয়া আসা বড় কষ্টকর হইত।"

"তাহা সত্য। কোথায় যাইবি?"

"তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। দেখ সুদর্শন! নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান। কাল যখন পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আসি, তখন ভাবিয়াছিলাম যে দিকে দুই চোখ যায়, সেইদিকেই যাইব। পথে ভগবান অবলম্বন জুটাইয়া দিলেন। কাল সন্ধ্যাবেলায় ভূপেন এক মুসলমানের জন্য খাবার চাহিতে গিয়াছিল, মনে আছে?"

"আছে।"

"সে ব্যক্তি বাদশাহের পৌত্র। মনে করিয়াছিলাম তাহাকে লালবাগের পথ দেখাইয়া দিয়া আমরা অন্যত্র চলিয়া যাইব; কিন্তু গঙ্গার পূর্ব্বপারে আসিয়া তাহার চেহারা বদলাইয়া গেল। একজন সওয়ার তাহাকে সেলাম করিল, আর সে তাহাকে হুকুম করিল যেন আমাদিগকে মহলে পৌছাইয়া দেয়। সওয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল শাহজাদ সাহিব-ই‘-জমান্’।"

"বাবা! অর্থ কি ভাই?"

"অর্থাৎ রাজপুত্র বর্ত্তমানে পূজনীয়। সম্রাটবংশীয় ব্যক্তিমাত্রেই শেষের উপাধিতে পরিচিত। এখন বাঙ্গলা-দেশে বাদশাহের প্রপৌত্র ফর্‌রুখসিয়ার ব্যতীত আর কোন রাজপুত্র আছে বলিয়া বোধ হয় না।"

"রাজভোগ খাইলে কেমন?"

"মন্দ নয়, গৃহত্যাগ করিয়া অবধি জলবিন্দুও মুখে দিই নাই।"

"সে আবার কি কথা, তুমি কি কয়েদী নাকি?"

"কয়েদী হইতে যাইব কেন? দেখিতে পাইতেছ, রাত্রি তৃতীয় যামের শেষে মুক্ত ভাগীরথীবক্ষে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে শীতল নৈশ সমীরণ সেবা করিতেছি?"

"রাজপ্রাসাদে অতিথি হইলে, আহারের কথাটা কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না?"

"নহ, আমাদের খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক আছে কি না, এ কথা এখনও বোধ হয় কাহারও জিজ্ঞাসা করিবার সময় হয় নাই।"

"ভাল? আছ কেমন?"

"মন্দ নহে। গাহিয়া বাজাইয়া রাত্রিটা কাটিয়া গেল।"

"বল কি?"

"সত্য কথা, মহলের চারিদিকে অসংখ্য তাম্বুতে রাজপুত ও মোগল সেনা আছে। প্রথমে আসিয়া এক জমাদারের তাম্বুর বাহিরে বসিলাম। ক্রমে দ্বিতীয় প্রহরের নহবৎ বাজিয়া গেল; কোন খবরই নাই। কি করি, আপন মনে গুণগুণ করিয়া গান ধরিয়াছিলাম। তাহা শুনিয়া জমাদার তাম্বুর ভিতরে লইয়া গেল, শতরঞ্চি পাতিয়া দিল, গঞ্জিকা সাজিয়া ধূমপান করিতে আহ্বান করিল, খাই না শুনিয়া দুঃখিত হইল; অবশেষে আর একজনের নিকট হইতে বাঁয়া-তবলা চাহিয়া আনিল। আসর জমিয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমেই বল আর দুর্ভাগ্যক্রমেই বল, ঠিক সেই সময়ে শাহজাদার মজলিসে একজন তবলচীর অভাব পড়িল, তাবলচী বোধ হয় আফিমের মাত্রাটা চড়াইয়া দিয়াছিল, সুতরাং যথাসময়ে শাহজাদার মজলিসে পেশ হইতে পারে নাই। একজন মু-সাহিব জমাদারের তাম্বুর পাশ দিয়া যাইবার সময় ভূপেনের সিদ্ধহস্তের সঙ্গত শুনিয়া গিয়াছিল। শাহজাদার মজলিসে যখন তবলচীর অভাব হইল, তখন সে নূতন তবলচীর সংবাদ দিয়া বাহবা পাইল। যথাসময়ে জমাদারের তাম্বু ও মলিন ছিন্ন সতরঞ্চি হইতে শাহজাদার খাস মজলিসে ঈরাণী গালিচায় বদলী হইলাম। মজলিস এইমাত্র শেষ হইয়াছে; শাহজাদা রাজকার্য্যের পরামর্শ করিতে গোসাখানায় গিয়াছেন। আমি সেই অবসরে সমস্ত রাত্রি জাগরণের পরে মাথাটায় হাওয়া লাগাইতেছি। তুমি আসিলে ভালই হইল সুদর্শন! আবার কবে দেখা হইবে, তাহা ত বলিতে পারি না?"

"তবে আর দেশে ফিরবি না ভাই?"

"ফিরিব না কেন, অবশ্য ফিরিব। যখন অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজের গুজরাণ নিজে করিতে পারিব, তখন আবার দেশে ফিরিব, আবার তোমাদের দেখিয়া সুখী হইব। দেখ ভাই, বড় সুখে দিন কাটিয়াছে, এত সুখ জীবনে আর পাইব কি না সন্দেহ। যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, একবার আসিয়া তোমাদের দেখিয়া যাইব।"

"দেখ্ অসীম! আমি ত পাগল মানুষ, গান-বাজনা লইয়াই থাকি; আমি যে তোকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব, তাহাও বোধ হয় না। তুই কবে দেশে ফিরিবি, তাহা বলিতে পারি না, আমার বোধ হয় শীঘ্রই তোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

দূরে পদশব্দ শ্রুত হইল, উভয়ে চমকিত হইয়া সেইদিকে চাহিলেন। একজন হরকরা দ্রুতপদে আসিয়া কহিল, "জহাঁপনা আপনাকে তলব করিয়াছেন।" তাহা শুনিয়া অসীম কহিলেন, "ফিরিয়া যাও ভাই, একদিন দেখা হইবেই। দেখ সুদর্শন, কাল রাত্রিতে দুর্গা একটা অন্যায় কার্য্য করিয়াছে; তাহার ফল যে কতদূর গড়াইবে বলিতে পারি না। কাল রাত্রিতে যখন তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসি, তখন সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে আমরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়াছি। সে অন্ধকারে খিড়কীর দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া ষষ্ঠীতলার মাঠে আমার সহিত দেখা করিয়াছিল। সে কেন আসিয়াছিল জান?"

"না, কিন্তু তাহাতে হইয়াছে কি?"

"সে তাহার স্বামীর চিরসঞ্চিত অর্থ ভূপেনকে দিতে আসিয়াছিল। হইয়াছে কি তাহা পরে বুঝিতে পারিবে। কারণ সে যখন ফিরিয়া যায়, তখন নবীন নাপিত তাহাকে ও আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল।"

"কোন্ নবীন?"

"ঘোষেদের বাড়ীর প্রাতঃস্মরণীয়া বড়গৃহিণীর জার।"

"সেজন্য চিন্তা করিও না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নে চিন্তাক্লিষ্ট বদনে বৃদ্ধ হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার ধীর পাদক্ষেপে সুবা বাঙ্গলার প্রধান কাননগই হরনারায়ণ রায়ের প্রাসাদসম অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। হরনারায়ণ তখন আহারান্তে বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, সুদীর্ঘ কারুকার্য্যখচিত আলবোলার সটকায় মুখ লাগাইয়া হরনারায়ণ তন্দ্রামগ্ন হইয়াছিলেন; শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া একজন ভৃত্য তাঁহার পদসেবা করিতেছিল। বিদ্যালঙ্কারের পদশব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ভট্‌চাজ যে, অসময়ে কি মনে করিয়া?" হরিনারায়ণ বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, "বড় বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি ভাই, এখন তুমি উদ্ধার না করিলে আর মান থাকে না।"

"তোমার আবার বিপদ কি হে? পরের চাকুরী কর না, কোন ঝঞ্ঝাট নাই, উদরান্নের জন্য পরিশ্রম করিতে হয় না, আমি ত দেখি যে শাহ আলম আর তোমাতে কোন প্রভেদ নাই।"

"রহস্যের সময় নয় হর, বিষম বিপদে পড়িয়াছি; এখন তুমি রক্ষা না করিলে আমার আর উপায় নাই।"

হরিনারায়ণ শয্যার এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। হরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কি গুরুতর কথা হে।"

"অক্ষয় গাঙ্গুলি আর হরিকেশব চট্টোপাধ্যায় ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে সমাজচ্যুত করিয়াছে।"

তোমাকে সমাজচ্যুত? বল কি? তুমি হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার একটা দেশবিখ্যাত পণ্ডিত; তোমার ভয়ে বাঙ্গলাদেশের সকল কুলীন একঘাটে জল খায়; আর ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র অক্ষয় গাঙ্গুলি আর হরিকেশব চট্টোপাধ্যায় তোমাকে সমাজচ্যুত করিল? তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছ না কি?"

"স্বপ্ন নহে ভাই, বিষম সত্য। হরিকেশব লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে যে, আজি হইতে আমার রজক নাপিত বন্ধ। দুর্গাকে যদি দূর করিয়া দিই এবং যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ সমাজ আমাকে পুনরায় গ্রহণ করিবে।"

"দুর্গার অপরাধ?"

"সে ব্যাভিচারিণী।"

"এ কথা কে বলে?"

"তোমার স্ত্রী।"

"আমার স্ত্রী?"

"হাঁ তোমার স্ত্রী!"

"প্রমাণ?"

"নবীন নরসুন্দর।"

"তুমি কি পাগল হইয়াছ? এখন দাবায় কিস্তি বলিতে পার?"

"শুন হর! কল্য রাত্রিতে অসীম ও ভূপেন্দ্র যখন গৃহত্যাগ করিয়া যায়, তখন দুর্গা ভূপেনের জন্য অত্যন্ত কাতরা হইয়া অন্ধকারে একাকিনী ষষ্ঠিতলায় গিয়া তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া আসিয়াছিল। সেই সময়ে নবীন নাপিত তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিল। দুর্গা যদি আর কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইত, তাহাহইলে কোন কথা হয় ত উঠিত না; কিন্তু সে শৈশব হইতে ভূপেনকে লালন-পালন করিয়াছে এবং তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করে; সে দেশত্যাগ করিয়া যাইতেছে শুনিয়া দুর্গা দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল। আমি এখানে ছিলাম বটে, কিন্তু সুদর্শন ত গৃহে ছিল; দুর্গা সচ্ছন্দে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিত। নবীন তখনই আসিয়া গৃহিণীকে জানায় যে, সে একপ্রহর রাত্রিতে অন্ধকারে মাঠে অসীম ও দুর্গাকে দেখিয়া আসিয়াছে। অদ্য প্রভাতে তোমার পত্নীর আদেশমত নবীন এ কথা গ্রামময় প্রচার করিয়াছে এবং তাহারই আদেশমত গ্রামের সমস্ত কুলীন অক্ষয় গাঙ্গুলির গৃহে সমবেত হইয়া আমাকে সমাজচ্যুত করিয়াছে। দেখ ভাই, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তোমার আশ্রিত; যদি কোন কারণে অসীম তোমার বা গৃহিণীর অপ্রিয় হইয়া থাকে, সে জন্য আমি শাস্তি পাই কেন?"

"কি বল ভট্‌চাজ, গৃহিণী কায়স্থের মেয়ে, আর তোমরা ব্রাহ্মণ, নরদেবতা; কায়স্থ-কন্যার কথায় ব্রাহ্মণ সমাজচ্যুত হয়, একথা বলিলে লোকে যে হাসিবে? তুমি শান্ত হও, দাবা পাড়িতে বলিব?"

"কলির ব্রাহ্মণ সব করে ভাই। দাবা ত খেলিবই, কিন্তু মন স্থির করিতে পারিতেছি কৈ? হরিকেশবের

সধবা কন্যা যখন রূপবান্ গুণবান্ স্বামী পরিত্যাগ করিয়া যবনের সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তখন তোমার সাহায্যে আমি তাহার জাতিরক্ষা করিয়াছিলাম। কৃতজ্ঞ হরিকেশব আজ তাহার প্রতিদান দিয়াছে। অক্ষয় ঘোর মূর্খ, ব্রাহ্মণ-সমাজে সে সর্ব্বদা কৌলীন্যের দোহাই দিয়া মাল্যচন্দনের পাত্র হয়, আমিও প্রতিবার তাহার প্রতিবাদ করি। প্রতিদিন এই বিদ্যাহীন, আচারবিহীন কুলীনের সন্তানগুলি কুক্কুরের ন্যায় আমার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ফিরিয়াছে। আজি তোমার পত্নীর আশ্বাস পাইয়া তাহারা আমাকে এই অপমান করিতে সাহসী হইয়াছে। হর! তোমার ভরসায় এই গ্রামে বাস করি, আমার উচ্চ মস্তক কখনও নত হয় নাই। বন্ধু! আজি প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য কর; তোমার কটাক্ষপাতে কুলীন-সমাজ শাসিত হইবে। আমার কন্যা অসতী নহে।"

"তাই ত ভট্টচাজ্, বড় বিপদে ফেলিলে।"

"তোমার আবার বিপদ কি?"

"লোকের মুখ কি করিয়া বন্ধ করিব?"

"সেখানে ত ভূপেন ছিল।"

"কথাটা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত হইল, আরে পাগল সে যে অন্ধ।"

"তবে তুমিও কি বিশ্বাস কর?"

"বিশ্বাসের কথা নয় ভট্টচাজ্, এ প্রমাণের কথা, সাক্ষী-সাবুদের কথা।"

"তুমি অক্ষয় ও হরিকেশবকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেই সকল কথা মিটিয়া যাইবে।"

"দেখ ভট্টচাজ্, আমি কায়স্থ, ব্রাহ্মণ-সমাজের কথায় হস্তক্ষেপ করা কি আমার উচিত হইবে?"

"সে কি কথা হর? হরিকেশবের কন্যার বেলায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলে কি বলিয়া?"

"তখন তোমরা আমার কথা রাখিয়াছিলে; আর এখন যদি না রাখ? সেটা কিন্তু হরনারায়ণ রায়ের পক্ষে বড়ই অপমানের কথা।"

"হর, তুমি আমার বাল্যবন্ধু; তুমি দুর্গাকে বাল্যাবধি জান। সে অসতী নহে। ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া স্নেহের বশে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। সুযোগ পাইয়া আমার শত্রুরা আমাকে নির্য্যাতন করিতেছে। এ সময়ে তুমি রক্ষা না করিলে আমাকে লাঞ্ছিত হইয়া দেশত্যাগ করিতে হইবে।"

"বড়ই দুঃখের কথা ভাই।"

"তবে তোমার ইচ্ছা কি?"

"আমার ইচ্ছা কি, তাহা কি তোমার অবিদিত?"

"বন্ধু! বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, তুমি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। আমাকে রক্ষা কর, বৃদ্ধ বয়সে নির্ব্বাসনে পাঠাইও না।"

"আমার কি সাধ যে, তুমি গ্রাম ত্যাগ কর; কিন্তু কি করিব ভাই, আমি কায়স্থ, ব্রাহ্মণ সমাজের কোন কথায় আমার হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।"

"তবে আমার কি উপায় হইবে?"

"দুই-চারি দিন বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া দেখ, অবশ্যই ইহাদের মনে দয়া হইবে।"

"সে কার্য্য হরিনারায়ণের দ্বারা হইবে না।"

"আমি ত অন্য উপায় দেখি না।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিয়ৎক্ষণ ভূমিতে দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া রহিলেন; পরে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া তীরবেগে প্রস্থান করিলেন। হরনারায়ণ ঈষৎ হাসিলেন।

(ক্রমশঃ)

রামচন্দ্র

[শ্রীযামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত]

যাঁর পুণ্যোজ্জ্বল চিত্র আঁকিবার তরে,
অমল তমসানীর, ছন্দের লহরে,
ব্যাকুল কামনা দিল ঋষির হৃদয়ে,
অমল তরলাতটে পূত গন্ধ ল'য়ে,
বহমান পবনের আকুল পরশে
ফুটিল কবিতা কলি ঋষির মানসে ;
হোমের অনল দীপ্ত গৃহে অযোধ্যার
উঠে যবে বেদ-মন্ত্রে সঙ্গীত-ঝঙ্কার,
পবিত্রিয়া মন-প্রাণ রামায়ণ-গানে,
তখনি বিস্ময়ে চাহি যজ্ঞ-ধূমপানে
ভাবি মনে বেদ-মন্ত্র, সোপানে-সোপানে
ধাইছে স্বর্গের পানে, পূর্ণ পুণ্য-ছবি
আনিবারে ; হোম-গন্ধে দেয় যেন কবি,
পূর্ণ করি ছন্দে-ছন্দে রামনাম গান,
জাগে হৃদে তেজ, ক্ষমা, পূর্ণতার ধ্যান।
তারকা রাক্ষসী-নাশে ধনুর টঙ্কার,
শিশু রামে বীরত্বের প্রথম ওঙ্কার —
বিশ্ব অকল্যাণ নাশে উঠিল ধ্বনিয়া।
মিথিলার রাজ-সভা, বিস্ময়ে চাহিয়া
দেখে হর-ধনু-ভঙ্গ ; বিশ্ব-বীরপনা
রামের চরণে লুটি লভিল লাঞ্ছনা।
রাজর্ষি রক্ষিত যত্নে, শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,
নিলা বীর, বীরত্বের যোগ্য পুরস্কার !
ছন্দের পূরবী গাহে, যৌবন-সন্ধ্যায়
নিবে [illegible]তপ, পুণ্য জ্যোছনায়,
শুভ্র করি[illegible]তার কৃষ্ণ কেশরাশি,
বৃদ্ধ রাজা [illegible]রথ, আরামের হাসি
ভাসিল আননে [illegible]। ডাকি স্নেহভরে
বিশাল সাম্রাজ্য-ভার, রামচন্দ্র করে,
সঁপিতে চাহিল রাজা, পরম আনন্দে
পিতার আদেশ জানি শির নমি বন্দে।

ঘুরিল নিয়তি-চক্র, মুহূর্ত্ত ভিতরে
নির্দ্দোষীর দণ্ডবিধি, নির্ব্বাসন তরে
করিল ঘোষণা, অযোধ্যার রাজনীতি ;
উঠিল করুণ-সুরে, সে কলঙ্ক-গীতি।
অচল, অটল রাম তখনো আনন্দে,
পিতার আদেশ-বাণী শির নমি বন্দে ;
উদয়াস্ত গগনের সীমান্ত রেখায়,
জ্বলে রবি সুখে, দুঃখে সম কান্তি ছায়।
পত্নী-প্রেমে আত্মহারা প্রসন্ন মানসে
পড়িল ভ্রান্তির ছায়া, আবেগ পরশে,
স্বর্ণ-মৃগ অসম্ভব ! তবু তা'র তরে,
ধাইছে পশ্চাতে রাম দিতে পত্নীকরে।
বিরাট রাক্ষসী-শক্তি, প্রেমের প্রতিমা
হ'রিলা রামেরে ছলি, লঙ্কার গরিমা,
বাড়ায়ে তুলিলা দম্ভে, যাঁর কণ্ঠে হার
পড়াতে হইত মনে ভয়ের সঞ্চার
দারুণ বিচ্ছেদ গণি। মহাপারাবার,
সে মিলন ভাঙ্গি গড়ে, দীর্ঘ ব্যবধান,
সে বিচ্ছেদে ফুটে উঠে বিশ্ব-অকল্যাণ।
আকুল হইলা রাম, প্রেমের পরশে,
পাষাণ কুসুম সম উঠিল হরষে
ভাসিয়া সাগর-জলে। সেতু-পথ দিয়া
নিয়ে এল প্রেমরাশি, প্রিয়ারে বহিয়া।
যে শক্তি বিংশতি বাহু করিয়া বিস্তার
ভ'রে দিল দশদিকে দৈন্য হাহাকার,
সে শক্তি বিনাশি রাম ধরার কল্যাণ
আনিলা শান্তির হাসি, গাহে "জয়গান"
বিশ্বে নর, স্বর্গে দেব। তুলাদণ্ড ধরি
বুঝে সতী-প্রাণ বীর্য, উঠিল শিহরি
অনল,—বিস্ময়ে মৌন সতীর প্রভায়
বিজয়-গৌরব বহি প্রাতি দ্রুত-ধায়

দেবযান পুষ্পরথ, মুছি অশ্রুধার
হাসিলা অযোধ্যা পুনঃ। দুর্ম্মুখ আবার,
ঘোষিল দারুণ বার্ত্তা। প্রজার পালনে
কঠিন কুলিশ রাম, আদেশি লক্ষ্মণে
সীতা-নির্ব্বাসনবার্ত্তা করিলা প্রচার;
সে দিন কি অশ্রুধারা পড়ে নাই তাঁর?
সে দিন কি আদেশের প্রত্যেক অক্ষর
উচ্চারিতে বাষ্পরুদ্ধ হয় নাই স্বর?
অশ্বমেধে ছুটে অশ্ব, বিজয়-ঘোষণা
রুদ্ধ হ'ল শিশু-করে, সতীর লাঞ্ছনা
নিল প্রতিশোধ বুঝি; বীরের সম্মান,
দিলা শিশু পুত্রে রাম; রামায়ণ গান
অযোধ্যা-প্রাসাদ ভরি, উঠিল ধ্বনিয়া
অশ্রুসিক্ত নেত্রে রাম উঠে শিহরিয়া।
তপঃকৃশ-পুণ্যজ্যোতি ঋষি বাল্মীকির
দাঁড়াইলা সীতাদেবী শান্ত স্থির ধীর
উজলিয়া রাজসভা, পুণ্যের পরশে
হাসিল অযোধ্যাপুরী। উঠিল হরষে
"জয় সীতাদেবী জয়" কোটি কণ্ঠ ভরি।
তবুও রামের দৃষ্টি, সন্দেহ বিতরি
চাহিছে সীতার পানে। না পারিলা আর
সহিতে ধরণী মাতা, দুঃখ তনয়ার;
নিলা তুলি নিজ কোলে, রামের জীবন
কবির করুণ সুরে হল সমাপন।

কত মাস কত বর্ষ তমসার তীরে,
কেটে গেছে মহাকবি! কত গেছে ফিরে
প্রভাত সন্ধ্যার ছবি। সে কোন্ সন্ধ্যায়,
প্রভাত-আলোকে কোন্, প্রথমে ধরায়
ছন্দ এল দেবীরূপে তোমার সুমুখে?
তাঁর পূজা-মন্ত্র ভাষা দিতে তব বুকে
উঠিল স্পন্দন গুরু। ব্যাকুল যেমন,
ছুটিল স্বর্গের দ্বারে। টলিল আসন
বিধাতার, পূজা-মন্ত্র দেবর্ষি বহিয়া
তমসার পুণ্যতটে আসিলা নামিয়া,
দেবর্ষির বীণা-গানে উঠিতেছে ভরি
মধুময় রামনাম; উঠিছে শিহরি,
তমসার তট, জল, গাছ নাম-গান
যাঁর পদস্পর্শে ধরা হ'ল তীর্থস্থান।
সম্পদে পড়েনি টলি, দুঃখে যেই স্থির
শক্তি যাঁর, ক্ষমা দলি নহে উচ্চশির,
শুনাও সে প্রেম-গীতি ছন্দের ঝঙ্কারে,
প্রেমের ভিখারী যেই চণ্ডালের দ্বারে।
অতিক্রমি বিন্ধ্যাচল দক্ষিণ ভারতে
ছুটি যাঁর প্রেমরাশি, বিদ্বেষের পথে
গড়িল মিলন-ঘর; অনার্য্যের করে
সঁপে দিলা নিজ কর; লঙ্কার সমরে
জগতের নিষ্ঠুরতা, পাপ, অকল্যাণ,
যে মিলন-পুণ্যস্পর্শে হ'ল তিরোধান।
কহ সেই বার্ত্তা, যেই, আনিল প্রথম
মানব শৈশবযুগ স্বচ্ছ নিরুপম;
শুনাও জগতে, যাঁর চরণ পরশে
পাষাণ রমণীমূর্ত্তি জাগিল হরষে;
লহ নাম, যেই নাম মরণে স্মরণে
অমৃতের ধারা ঢালি নিখিল ভুবনে।
দেবতা শিখায়ে দিল দেবতা আঁকিতে
মানব-প্রকৃতি মাঝে বিশ্ব বিমোহিতে।
দেবতা মানবীমূর্ত্তি নিতে ধরা পরে
নেমে আসে স্বর্গ হ'তে ধন্য করি নরে।
যবে রামচন্দ্র নিলা ধরা-অধিকার,
বুঝে নর, কত উচ্চে নরত্ব তাঁহার।

মধু-মহোৎসব

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

"যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ-তীরে"

বিগত ১২ই মাঘ শ্রীপঞ্চমী গিয়াছে। এই দিনে বঙ্গের গৃহে-গৃহে, পল্লীতে-পল্লীতে, মণ্ডপে-মণ্ডপে ব্রহ্মলোকবাসিনী বীণাপাণির পূজা হইয়া থাকে। এই বৎসরে শ্রীপঞ্চমীর সেই মহা শুভদিনে বঙ্গের একটী নিভৃত পল্লীতে বাণী-বরপুত্র মধুসূদনের স্মৃতি-পূজা হইয়া গিয়াছে। মায়ের পূজার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার ছেলের স্মৃতি-পূজার চির-মধুর স্মৃতি সহস্র কুমুদ-কহ্লারের স্বর্গীয় সৌরভে, দিগন্ত উদ্ভাসিত সৌন্দর্য্যে, সহস্র-দলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা মধুসূদনের জন্মতিথি উৎসবে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে আমন্ত্রিত হইয়া সাগরদাঁড়ী গিয়াছিলাম। যশোহরের সদর সব-ডিভিসনাল-অফিসার শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস মহাশয়, এবং তত্রত্য প্রসিদ্ধ উকীল রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর প্রমুখ মনীষিগণ এই মহোৎসবের বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ ১৩১১ সাল হইতে আরম্ভ হইয়া ১৩১৩ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসর সাগরদাঁড়ীর কপোতাক্ষ-তীরে অবস্থিত 'মাইকেলোদ্যান' নামক আম্র-কাননে কবির স্মরণার্থ 'মধুমেলা' বসিয়াছিল। তার পরে বর্ত্তমান বৎসরে তাঁহার সেই জন্মোৎসবের উদ্বোধন নূতন প্রণালীতে হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে সেই কথা বলিব।

সন্ধ্যার সময়ে ঝিকরগাছা ষ্টেশনে উপনীত হইয়া দেখি, যতীন্দ্রবাবু-প্রমুখ মহাশয়েরা আমাদের জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন। ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবামাত্র তাঁহারা অতি সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। কপোতাক্ষ-নীরে 'কুণ্ডলী' নামক ষ্টীমার অপেক্ষা করিতেছিল। আমাদিগকে তাঁহারা সেই ষ্টীমারে লইয়া গেলেন। রাত্রিতে যশোহর হইতে গাড়ী আসিলে, বহু ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে-দেখিতে ষ্টীমার লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই সঙ্গে ঐক্যতান-বাদ্য সম্প্রদায়ও আসিলেন। তাঁহারা ষ্টীমারের উপরিতলে রহিলেন। রজনীর তৃতীয়-যামে শুক্লা চতুর্থীর স্তিমিত নক্ষত্রালোকে ষ্টীমার ছাড়িল। অমনি শতকণ্ঠে 'বন্দে-মাতরম্' মন্ত্র আকাশ বিদীর্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল। মধুর ঐক্যতান-বাদ্যের সহিত জলোচ্ছ্বাসে নদীবক্ষ বিলোড়িত করিয়া 'কুণ্ডলী' অগ্রসর হইতেছে ;—চারিদিক নীরব—নিস্তব্ধ। কেবল জলের আলোড়ন-শব্দ বংশীধ্বনি সহ নৈশ-সমীরে মিশ্রিত হইয়া প্রকৃতির গভীর সুপ্তি ভাঙ্গিয়া দিতেছিল। আমরা ক্যাবিনের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা জাগিয়া উঠিবামাত্র কর্ণকুহরে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি সমবেত বাদিত্রধ্বনি সহ প্রবিষ্ট হইল। মধ্যরাত্র হইতেই গীতবাদ্য চলিতেছিল। আমরা ষ্টীমারের উপরিতলে গিয়া বসিলাম। দেখিলাম, কবি স্মৃতিময়-কপোতাক্ষ ঘূরিয়া-ঘূরিয়া, আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। 'কুণ্ডলী'ও নদীবক্ষে মরালীর ন্যায় মৃদু মন্থর গতিতে নাচিতে-নাচিতে ছুটিতেছে! নদীতটের কি অপূর্ব্ব শোভা! কখন বা ঘন-শ্যামল, বৃক্ষলতা বহুল বনরাজি নেত্রপথে উদ্ভাসিত হইতেছে,—কখন বা দূর-প্রসারিত প্রান্তর দূর-দিগ্বলয়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে ;—তাল, নারিকেল, [illegible] বিরাম নাই—তাহারা যেন কপোতাক্ষের উভয় তটে জাগ্রত প্রহরীর ন্যায় আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছে। ক্রমে তরুণ তপনের অরুণ কিরণ পূর্ব্বাকাশ হইতে ছড়াইয়া পড়িল ; নদীরূপ নীল সাড়ীর উপর কে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে সোণার ফুল ফুটাইয়া দিল! রূপ রস-গন্ধময়ী আলোকময়ী ধরিত্রী যেন কবি-স্বর্গ বলিয়া বোধ হইল! পৃথিবীতে যেন ফুলের গন্ধ, পাখীর গান, তরুর মর্ম্মর, লতার হাসি জলের ঢেউ, স্নিগ্ধ বাতাস ভিন্ন আর কিছুই নাই ;—আর আছে কেবল আমাদের তরণী বক্ষে বংশীধ্বনি, সঙ্গীতের তান, বন্দে মাতরম্, জয় মধুসূদনজী কি জয়! Hip! Hip! Hurrah প্রভৃতি হর্ষ কোলাহল! প্রকৃতি যেন হর্ষে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছে সৌন্দর্য্যে যেন আত্মহারা, ভাবে-ভোর হইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। সবই যেন মধুতে মধুর—মধুতে মধুময়! এইরূপ সঙ্গীতোচ্ছ্বাস ও কলধ্বনি-সহ বেলা প্রায় দশটার সময় 'কুণ্ডলী' সাগরদাঁড়ীর নিকটস্থ হইবামাত্র শতকণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্', 'জয় মধুসূদনজী কি জয়' গগন-বক্ষ বিদীর্ণ করিতে লাগিল! ষ্টীমার হইতে দিগন্ত-কম্পিত করিয়া তূর্য্য-নিনাদ হইল—অমনি সাগরদাঁড়ীর তট হইতে ঘন-ঘন শঙ্খ-ধ্বনি তাহার প্রত্যুত্তর দিল! আমরা ষ্টীমার হইতে দেখিলাম, সারি-সারি পতাকা হস্তে গ্রামের যুবক ও বালকগণ কবিতীর্থ-যাত্রী-বর্গকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! তন্মধ্যে একজন ঘন-ঘন শঙ্খ-ধ্বনি করিতেছেন। নদীকূলে পত্রপল্লবে সুসজ্জিত একটী তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে; তোরণের শীর্ষদেশে রক্তবস্ত্রের উপরিভাগে বড়-বড় শ্বেত অক্ষরে "মধুহীন কোর না গো তব মনঃ কোক-নদে" লিখিত রহিয়াছে। 'কুণ্ডলী' কপোতাক্ষ-তীর স্পর্শ করিবামাত্র, সকলে উচ্চকণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করিতে-করিতে অবতরণ করিলেন। ক্রমে আমরা ধীরে-ধীরে মধুসূদনের প্রকাণ্ড বাসভবনের সম্মুখে উপনীত হইয়া দেখিলাম যে, গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত মহাকবির স্মৃতি-স্তম্ভ পুষ্পমাল্যে বিমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেকে নতজানু হইয়া, ললাট দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া, কবিতীর্থের মহাপূত রজঃ বক্ষে মাখিয়া—সেই মহাকবির—সেই মহামনীষার—সেই মহাপুরুষের চরণতলে ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

আমাদের বিশ্রামের জন্ত সম্মুখস্থ বাটীর একটি সুদীর্ঘ কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সকলে সেই কক্ষে কিছুকাল বিশ্রামানন্তর স্নানার্থ নদী-তীরে গমন করিলেন। নির্ম্মল-সলিলা কপোতাক্ষ মৃদু হিল্লোলে প্রবাহিত স্বচ্ছ মুকুরের স্তায় নীল-সলিলা,—নদীর তলদেশ পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতে লাগিল। বটতরুরাজির নিবিড় ছায়া সূর্য্য-কিরণোজ্জ্বল নদীবক্ষে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। মধুসূদন যথার্থই বলিয়াছিলেন, "দুগ্ধ স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে!" আমরা স্নিগ্ধ নির্ম্মল জলে আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া বহুক্ষণ অবগাহন স্নানে অসীম তৃপ্তি অনুভব করিলাম। আমাদের দেহতাপ স্বর্গীয় স্নিগ্ধতায় জুড়াইয়া গেল।" কোন্ সুদূরে অতীত দিনের স্মৃতি আমাদের চিত্ত বিলোড়িত করিল। বালক মধুসূদন এই নদীতে স্নান করিতেন, সন্তরণ করিতেন। স্নানান্তে সকলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, মধুসূদনের স্মৃতিস্তম্ভ তুলসী-মঞ্চের স্তায় পুজিত হইতেছে। মধ্যাহ্নে বাটীর মধ্যস্থিত বিরাট চণ্ডীমণ্ডপে ভোজের আয়োজন হইল। যে দেবীমণ্ডপে বালক মধুসূদন মহাপূজার মহা উৎসবের দিনে আগমনী-গীতি শ্রবণ করিয়াছিলেন, যে মহামণ্ডপে তাঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলে একত্র মিলিয়া সেই প্রাচীন মণ্ডপে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিলেন।

তৎপরে মধুসূদন যে গৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই স্থানটী সকলে দেখিলেন। ঐ স্থানে একটি মর্ম্মর-রচিত প্রস্তর-ফলক সন্নিবিষ্ট হইবে। তাহাতে কবির জন্মকথা উৎকীর্ণ থাকিবে। মধুসূদনের প্রকাণ্ড বাসভবনের পশ্চাদ্ভাগ ধূলিসাৎ হইয়াছে—তৎস্থলে পুনরায় গৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছে। কপোতাক্ষ-তীরে 'মাইকেল উদ্যান' নামক আম্রকাননে 'মধুসূদন স্কুল'গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। গৃহপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। ছাদের কার্য্য বাকী আছে; শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন মধুসূদনের স্মৃতি-কল্পে সাগর-দাঁড়ীগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয়, একটি দাতব্য-ঔষধালয় এবং একটি নদীতীরবর্ত্তী পথ প্রস্তুতের প্রস্তাব হইয়াছে। স্থানীয় লোকের যেরূপ উৎসাহ দেখিলাম, ও যশোহরের প্রসিদ্ধ উকীল ও হাকিমের, যেরূপ অনুরাগ দেখিলাম, তাহাতে অচিরে সঙ্কল্প-সিদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয়। মধুসূদন শৈশবে নদীতীরবর্ত্তী যে বটবৃক্ষতলে 'রামায়ণ মহাভারত' পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, সেই পুণ্য স্নিগ্ধ-ছায়াময় তরুতল পরিবেষ্টিত করিয়া একটি বৃত্তাকার বেদিকা নির্ম্মিত হইলে বড়ই শোভন হয়। বাটীর নিকটেই যে বাদাম বৃক্ষতল—মধুসূদনের শৈশবের ক্রীড়াস্থল, সেখানেও কোন স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপিত হইলে আমাদের সকল আশাই পূর্ণ হয়।

বাটীর সম্মুখস্থ বিশাল প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপ-তলে সভাস্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বেলা দুইটার পর দেখিতে দেখিতে সেই বিরাট প্রাঙ্গণ নানাশ্রেণীর দ্বিসহস্রাধিক জনমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কি বিপুল জনসঙ্ঘ! সকলেই ধীর স্থির মৌন নিস্পন্দ। সাগরদাঁড়ীর অনতিদূরস্থ নানা পল্লী হইতে নানাশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানেরা মধুসূদনের জন্মতিথির উৎসব দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেখপাড়া হইতে কৃতবিদ্য বহু সংখ্যক মুসলমান এই উৎসবে যোগদান করেন। কবির জন্মদিনে—হিন্দু-মুসলমানের এই প্রীতিপ্রদ সম্মিলনে আমাদের হৃদয় পুলক-পূর্ণ ও দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিচারে আমাদের স্বদেশীয় মহাকবির পূজা করিতে সমর্থ হইয়াছি—ইহা যে আমাদের জাতীয় উন্নতির লক্ষণ, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

বেলা প্রায় তিনটার সময় জন্মোৎসব-সভা বসিল। সর্ব্বপ্রথমে আবাহন সঙ্গীত গীত হইলে সভার সম্পাদক যতীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে এবং রায় যদুনাথের সমর্থনে সভাপতি আসন গ্রহণ করিলে, সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে টাকী-শ্রীপুরের জমীদার রায় কনক-কান্তি চৌধুরী মহাশয়, অনিবার্য্য-কারণে অনুপস্থিত কলিকাতার বিশিষ্ট-সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পত্রাবলী পাঠ করিলেন। তৎপরে রায় যদুনাথ স্বরচিত 'মধুমঙ্গল' পাঠ করিলেন। তৎপরে অনেকে তাঁহাদের স্ব-রচিত—মধুসূদনের উদ্দেশে লিখিত—কবিতাবলী পাঠ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যশোহর নিবাসী হবিবর রহমনের ও মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী সুনীতিবালার কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছিল। সাগরদাঁড়ীর অনতিদূরে অবস্থিত সেখপাড়া নামক স্থান হইতে আগত মুসলমানেরা কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা ও চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলী হইতে অনেক স্থল পর্য্যায়-ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের দ্বারা পঠিত হইয়াছিল। অনেকে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন; সেই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশ স্থলে যাহাতে মধুসূদনের জন্মভূমিতে সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠান-মূলক তাঁহার স্থায়ী-স্মৃতি রক্ষা হয়, এরূপ অনেক কথা ব্যক্ত হইয়াছিল। সে সব অনুষ্ঠানের উল্লেখ এই প্রবন্ধে পূর্ব্বেই হইয়াছে। সভার সম্পাদক যতীন্দ্র বাবু যখন তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন—তখন মধুসূদনের দুঃখ-স্মৃতিময়ী স্মৃতি-কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল এবং প্রবন্ধের অর্দ্ধপথে তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সমস্ত জনসঙ্ঘ তাঁহার সহিত অশ্রুপাত করিয়াছিলেন! আমরাও অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই। তিনি বক্তৃতার শেষভাগে যশোহরে মহাকবি মধুসূদনের মহাকীর্ত্তি "মাইকেল মধুসূদন কলেজ" স্থাপনের প্রস্তাবের কথা—এবং তাহার উপযোগিতার কথা সকলকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া, এই মহা-হিতকর অনুষ্ঠানে সর্ব্বসাধারণকে যোগদান করিতে বদ্ধপরিকর হইতে বলিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের পর রায় যদুনাথ 'মাইকেল মধুসূদন কলেজ'-সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা বলিলেন এবং সেই কলেজে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-বিভাগের সহিত বাঙ্গালা, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে। রায় বাহাদুরের পর সভাপতি মধুসূদনের নানাগুণের কথা বলিয়া এবং প্রস্তাবিত মাইকেল মধুসূদন কলেজের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। তৎপরে সভাপতিকে ধন্তবাদ প্রদত্ত হইলে 'বিদায়-সঙ্গীত' গীত হইয়া সন্ধ্যার পরে

উচ্চ জয়-ধ্বনি-সহ সভা-ভঙ্গ হইল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইলে মধুসূদনের পত্র-পুষ্প-মাল্যে সুসজ্জিত দীপান্বিতা স্মৃতি-স্তম্ভে ধূপ-ধুনা-প্রজ্বলিত করিয়া শঙ্খ-ঘণ্টা-রোলে আরতি হইল। অনেকে নতজানু হইয়া আবার মহাকবির উদ্দেশে প্রণিপাত করিলেন! রাত্রে মুকুন্দ দাসের যাত্রায় সামাজিক অভিনয় হইয়াছিল।

কবির আরতি পূর্ব্ব-কালের গৌড়-গৃহ-পল্লীর চির-সুখ-শান্তির বারতা বহিয়া আনিল! ধন্য মধুসূদন! তোমারি ভাষায় তোমাকে সম্বোধন করিয়া বলি—

> কবিতা পঙ্কজ-রবি, শ্রীমধুসূদন
> ধন্য তুমি বঙ্গভূমে! যশঃ সুধাদানে
> অমর করিলা তোমা' অমরকারিণী
> বাগ্‌দেবী!—

দিন আসিয়াছে—সময় আসিয়াছে—তোমার নিত্য-স্মৃতি-পূজা বাঙ্গালার গৃহে-গৃহে প্রতিষ্ঠিত হউক! বৎসরান্তে চিরদিন তোমার স্মৃতির মহাপূজা হইবে এবং প্রতিদিন বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ বনিতা তোমার স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তির পূত-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইবে!

সালোমে*

(সমালোচনা)

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার]

বাঙ্গালা সাহিত্যে এই বিশেষত্বহীন উপন্যাসপ্লাবনের দিনে মাঝে মাঝে দুই একটা অভিনব রচনা আমাদের সাহিত্য-বিকার কাটাইয়া দিয়া বিপর্য্যস্ত রুচির স্থৈর্য্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়া থাকে। সমালোচ্য গ্রন্থখানি এইরূপ একটা নূতন আবির্ভাব। ইহা Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wildeএর সালোমে (Salomé) নাটিকার বৈশ্লেষণিক অনুশীলন (analytical study)। Wildeএর প্রতিভাপূর্ণ নাট্যকাব্যখানি বর্ত্তমান আকারে বিদেশীয় ভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার হস্তে দিবার জন্য প্রণেতা যে সাধারণের ধন্যবাদার্হ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যে প্রকাশ্যভাবে সে ধন্যবাদ গ্রহণে ইচ্ছুক নহেন, তাহা গ্রন্থপ্রচ্ছদে তাঁহার স্বগৃহীত দ্রাবিড় ছদ্মনামে কতকটা অনুভূত হয়। গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার গৃহীত ছদ্মনামটিতে যেরূপ বর্ণবিন্যাস করিয়াছেন, সেরূপ যে কোনও কর্ণাটী করিবে না, তাহা নিশ্চয়। তামুল বা তামিল ভাষায় ভেঙ্কট শব্দ নাই, বেঙ্কট আছে। বোধ হয় গ্রন্থকার বেঙ্কটের ইংরাজী বানানের লিপ্যন্তর করিতে গিয়া V'র স্থানে "ভ" লিখিয়াছেন। তাহার পর আবার "মুদেলিয়র"; ইহাও হয় ত ইংরাজী ভ্রমপূর্ণ বর্ণবিন্যাসের লিপ্যন্তর মাত্র। কথাটা "মুদলিয়র", মুদেলিয়র নহে। একজন বাঙ্গালাভাষাভিজ্ঞ কৃতবিদ্য মান্দ্রাজবাসী আপনার নাম বাঙ্গালায় লিখিতে এরূপভাবে বর্ণবিন্যাস করিবেন না। গ্রন্থকার বাঙ্গালী,—তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় আছে,—তাঁহার অনেক প্রবন্ধাদি আমরা বাঙ্গালা মাসিকে পড়িয়া থাকি,—সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি অক্লান্ত-কর্ম্মী। একদিন অসাবধানতা বশতঃ তিনি সালোমের কথা আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তিনি যখন আত্মগোপন করিতে উৎসুক, তখন আমরাও তাঁহার মেঘনাদবৃত্তির রহস্যভেদের আবশ্যক দেখি না, তবে আমরা এইমাত্র আশা করি যে, কলিকাতার পুলিস্ কোর্টের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে মাতৃভাষা সেবার জন্য তিনি এইরূপ মাঝে-মাঝে অবকাশ করিয়া লইবেন। Wildeএর সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আভাস বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দেওয়া সম্ভবতঃ বর্ত্তমান গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য; কিন্তু বিলাতের ধর্ম্মাধিকরণে সেদিন এই নাটিকা সম্বন্ধে যে সকল কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের ছায়া আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকারের মন্তব্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সাহিত্যক্ষেত্রে যে তাহাদের কোনও মূল্য নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই কারণে, Wildeএর এই নাটিকাখানির রচনার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে প্রদান করিলাম। কিন্তু, তৎপূর্ব্বে আরও দুই একটা কথা বলা বোধ হয় আবশ্যক। প্রথম, হেরোদের পত্নীর নাম হেরোদিয়া নহে, তিনি হেরোদিআস্ নামে পরিচিত। ইহা ফরাসী নাম নহে সুতরাং ফরাসী উচ্চারণ-নিয়ম এ সম্বন্ধে খাটিবে না; অতএব ইহার লিপ্যন্তর হেরোদিয়া না করিয়া হেরোদিআস্ করিলে ভ্রমহীন হইত, এরূপ আমাদের মনে হয়। দ্বিতীয়, তিজ্রোলাঁ শব্দ লাটিন তিজেলিনস্ শব্দের ফরাসী আকার। বঙ্গানুবাদে মূল লাটিন শব্দ ব্যবহার করিলে বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত ও মূলানুযায়ী হইত। সালোমের ইংরাজী অনুবাদে উক্ত লাটিন শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অভিনয়-বিচারক সালোমে নাটকাভিনয়ের অনুমতি প্রদান করেন নাই। কিন্তু উহা গ্রন্থকর্ত্তা কর্ত্তৃক ফরাসী

---

* শ্রীভেঙ্কটরত্নম্ মুদেলিয়র প্রণীত। প্রকাশক:—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

ভাষায় পুনর্লিখিত হইয়া ১৮৯৬ সালে পারি নগরীতে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই নাট্যকাব্য রচনায় পারদর্শিতা সম্বন্ধে Wildeএর যশঃ সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য-সংস্কার কল্পে যাঁহারা অদম্য উৎসাহে Ruskinএর সহযোগিতা করিয়াছিলেন, সালোমে-প্রণেতা তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তাঁহার জীবনের নৈতিক শিথিলতার সম্বন্ধে জনসাধারণে প্রচারিত নিন্দাবাদ কিছুদিনের জন্য সাহিত্য-জগতে তাঁহার অমল ধবল যশোরাশিকে কিঞ্চিৎ আবিল করিয়া ফেলিয়াছিল বটে, কিন্তু সালোমে তাঁহার আচ্ছন্ন গরিমাকে বর্ষণ-বিধৌত শরতের নীলিমার ন্যায় মুক্ত, প্রোজ্জ্বল ও ভাস্বর করিয়াছিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নাটিকাখানি Lord Alfred Douglas কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। নাটিকাখানি প্রণয়নের সহিত Wildeএর দুঃসময়টা যেন একটু ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছিল। গ্রন্থকার যখন ইহার ফরাসী অনুবাদ করেন, তখন বড় আশা করিয়াছিলেন যে যশস্বিনী Sarah Bernhardt কর্ত্তৃক সালোমে অভিনীত হইবে; কিন্তু সে আশা তাঁহার সফল হয় নাই। গ্রন্থকার বিলাতের Times পত্রে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করিলেও, এখনও অনেকে মনে করেন যে Sarahর জন্যই নাটিকাখানি বিরচিত হইয়াছিল। Wildeএর অভিশপ্ত জীবন যখন জনসমাজের প্রান্তে ভণ্ডামি ও কৃত্রিম সৌষ্ঠবের নিষ্পেষণে নিপীড়িত হইতেছিল, তখন ফরাসী সাহিত্য-জগতে সালোমের সমাদর ও পারি নগরীতে সাহিত্যসেবিগণের সম্মুখে ইহার প্রথম অভিনয় দিনান্তের অরুণিমার ন্যায় তাঁহার জীবনের দিগন্তকে রঞ্জিত করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে দুই বৎসর ধরিয়া অভিনেত্রী Sarahকে অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন, কত অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। যখন Wildeকে Marquis of Queensburyর মকদ্দমায় রাজদ্বারে দণ্ড গ্রহণের জন্য দাঁড়াইতে হইয়াছিল, তখন তিনি অভাবে পড়িয়া নাটিকাখানি সামান্য মূল্যে Sarahর নিকট বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বিদুষী অভিনেত্রী তাঁহার প্রতি বড় সদ্ব্যবহার করেন নাই,—এমন কি পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। বহুদিন পরে, অনেক তাগিদের পর, Wilde তাঁহার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ফেরত পাইয়াছিলেন।

নাট্যের আখ্যায়িকাংশ সাধু Mark বিরচিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থে এই কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। Farrarএর খৃষ্টীয় জীবনীতে ইহা অতি বিশদরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, এবং Nicephorusএর গ্রন্থেও সালোমেকাহিনী বিবৃত আছে।

আলোচ্য মূল গ্রন্থে অভিনয়মঞ্চ-সংক্রান্ত উপদেশসমূহ কার্য্যে পরিণত করা বড় কঠিন। সময়—রাত্রি—শুভ্র, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ইহুদা-দেশের রাত্রি—আর সেই চন্দ্রালোকের বিমল উৎসবের মধ্যে দাঁড়াইয়া একজন সুন্দর সিরীয় যুবক—হেরোদের রক্ষীদলের নেতা—মোহিনী সালোমের রূপে মুগ্ধ। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে আর সকল উপদেশ সহজে সাধারণ মঞ্চে কার্য্যে পরিণত করা বড় সহজসাধ্য নহে। হেরোদের সভা তাঁহার প্রাসাদশীর্ষে আহূত হইয়াছিল। সম্মুখে প্রশস্ত অধিরোহিণী-পংক্তি; উপরে অলিন্দপ্রান্তে সৈন্যগণ এবং একপার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড জলাধার। সাধারণতঃ রঙ্গমঞ্চে কোনও প্রকারে—কতকটা কার্য্যে ও কতকটা কল্পনায়—যেমন-তেমন করিয়া কাজ সারিয়া দেওয়া হয় বলিয়া নাট্যকলা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

যাঁহারা ফরাসী সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা নাটকখানি একটু অবধানতার সহিত পাঠ করিলে ইহাতে Maeterlinck ও Flaubertএর প্রভাব অনুভব করিবেন। ভাষার সৌষ্ঠব, অর্থাৎ ফরাসী ভাষায় যাহাকে decor des phrases বলে, তাহার যথেষ্ট উদাহরণ ইহাতে বর্ত্তমান। চন্দ্রসম্বন্ধে এত পুনরুক্তি সম্বন্ধে অনেকে নাট্যকৌশল বা রসসঙ্কেত বলিয়া আপত্তি করেন। Max Nordau ইহাকে উন্মত্ততার লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু Wildeএর ন্যায় শিল্পীর সুনিপুণ হস্তে যে ইহা নাট্যকাব্যের সৌন্দর্য্য অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। ইওকানানের কথা অর্থাৎ নাটকের নেপথ্য কথাগুলি একটী সম্পূর্ণ নূতন সুরে গাঁথা;—বাইবেলের ভাষায় মেসিয়ার আগমনসংবাদপ্রচারকল্পে একটা রহস্যময় ঘনকুয়াসায় নাটকের সমগ্র অভিনয়াংশটি ঢাকিয়া দিয়াছে। সৈন্যগণকর্ত্তৃক এই ভবিষ্যদ্বক্তা সম্বন্ধে বিচার ও তাহার বর্ণনার অবতারণা করিয়া নাট্যকার অনেকটা তাহাদিগকে ফরাসী নাটকের raisonneur এর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। সিরীয় যুবকের রূপজ-মোহ, ভৃত্যের ভীতি ও তাঁহার উপদেশ, ইওকানানের মুখচুম্বনে সালোমের আগ্রহ এবং পরে তাহার শিরশ্ছেদনের জন্য নায়িকার প্রবল অনুযোগ এবং হেরোদের বিষাদপূর্ণ গাম্ভীর্য্য সম্বন্ধে সৈন্যগণের মন্তব্য,—সকলই একটা সাফল্যের সহিত গ্রথিত,—সকলই সহজভাবে নাটকের সমগ্র অভিনয়কে একটা সফলতার দিকে নীত করিতেছে। Wildeএর কথাগুলি ওজন করা কথা—যাহাকে ফরাসী ভাষায় বলে le mot juste—অনেকস্থলে নাট্যকারের কয়েকটি কথায়—একটি চিত্র-উদ্ভাসিত হইয়া উঠে,—ইহা বড় কম ক্ষমতা-সাপেক্ষ নহে। সালোমে নাটিকায় একটি কথারও অপব্যয় দেখা যায় না—একটি কথাও অবান্তরভাবে প্রযুক্ত হয় নাই।

Wildeএর প্রাচ্যবর্ণবিন্যাসপ্রীতির প্রমাণ এই নাটিকাখানিতে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই প্রীতিপ্রণোদিত হইয়া Wilde তাঁহার বিনোদ নাট্যকুঞ্জ ললিতঝঙ্কারে মুখরিত করিয়াছেন। এই ঝঙ্কার ও পদবিন্যাস-সৌন্দর্য্যের প্রোজ্জ্বল পটে নাট্যের বিভীষিকাময় আখ্যায়িকার মসীলেপ সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নাটিকাখানি অনেকে দুর্নীতিব্যঞ্জক বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে অযথা আক্রমণ, তাহা নাটিকাখানি যিনি একটু মনোযোগের

উপাস্যা তার আবাহন
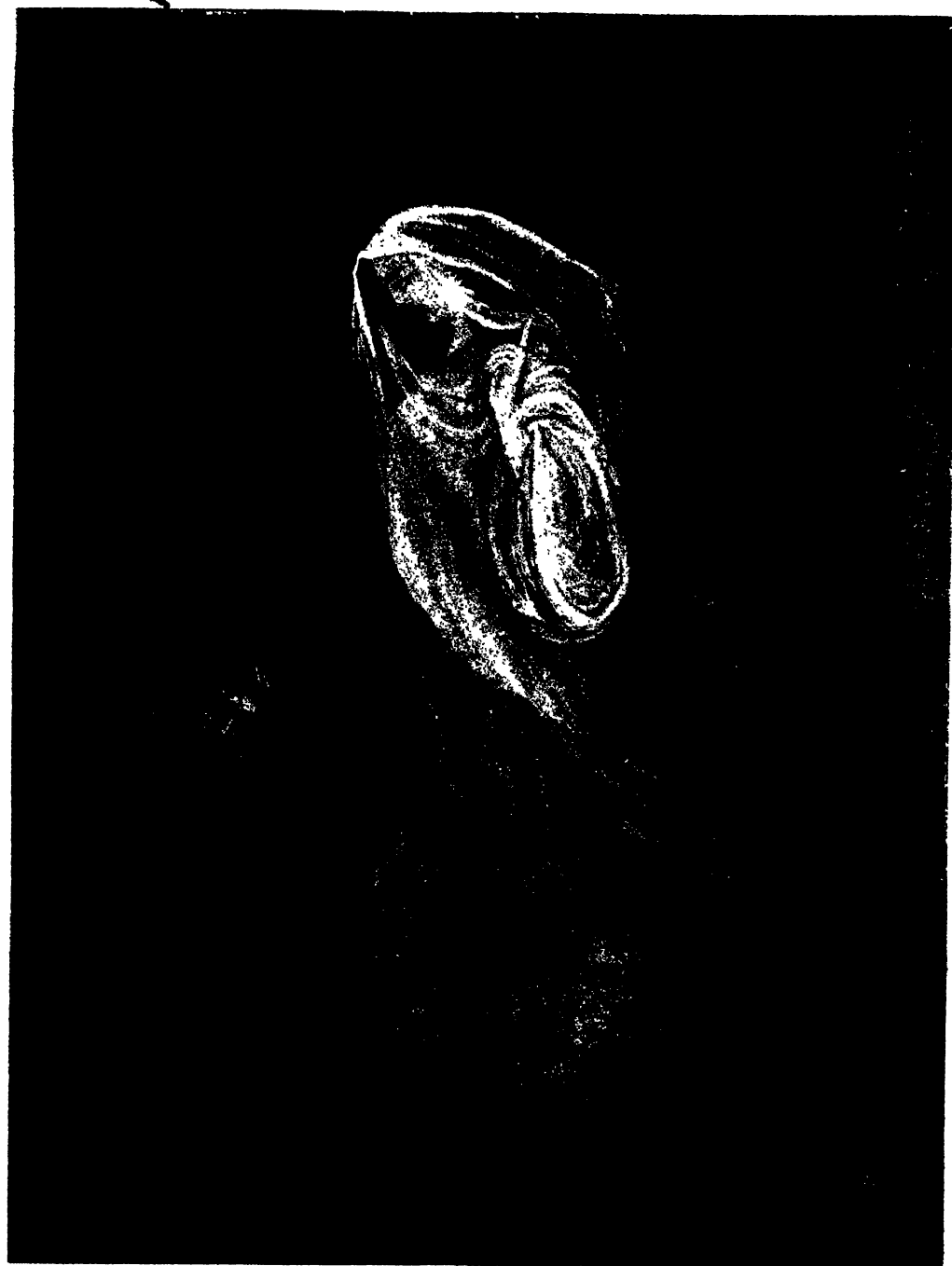
BY COURTESY OF "PRATAP PRESS", CAWNPORE.

Blocks by BHARATVARSHA HALFTONE WORKS

সহিত পড়িয়াছেন, তাঁহাকে বুঝাইতে বড় কষ্ট পাইতে হয় না। আজকাল অনেক নিরপেক্ষ সমালোচকও এই ভ্রান্ত বিশ্বাস নিরাকরণের চেষ্টা করিতেছেন। Wildeএর বিরুদ্ধবাদিগণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভিন্নতা অনেক সময়ে ভুলিয়া গিয়া থাকেন। প্রাচ্যের নৈতিক আদর্শ ও সামাজিক রীতি যে প্রতীচ্যের সভ্যতা ও শ্লীলতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহা সমালোচকগণকে অনেক সময়ে মনে রাখিয়া সাহিত্যের ধর্ম্মাধিকরণে প্রবেশ করিতে দেখা যায় না। নাটিকাখানি সুস্পষ্টভাবে একটা মোহজ ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠাপিত। নাট্যকার যদি পারিপার্শ্বিকগুলি নাটিকার সাফল্যের বা dénouementএর উপযোগী করিয়া সাজাইয়া থাকেন, এবং চিত্রকর চিত্রপটে যাহা চিত্রিত করিতে পারিতেন, তাহা যদি নাট্যকার কথায় বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা যে নাট্যকলার বিকার নহে, বরং চরম উৎকর্ষ, এ'কথা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। সালোমের সহিত সেক্সপিয়রের প্রাচ্যনাটক Anthony and Cleopatra'র অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে সালোমে আরও একটু আধুনিক যুগের। সে সময়ে রোমীয় সামন্তরাজ্যসমূহের সামাজিক ও ব্যক্তিগত নীতি হীনতর ও উচ্ছৃঙ্খলতর হইয়া পড়িয়াছিল। এই দুইটি নাটকের চরিত্রগুলিতে দুর্নীতির (immorality) ছায়া নাই, নীতিহীনতার (non-morality) আছে। ইংলণ্ডে এই নাটিকাখানির সম্বন্ধে কুসংস্কার Aubrey Beardsley অঙ্কিত চিত্রগুলিতে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। নাটিকাখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন Aubrey Beardsley ইহাতে কয়েকটি চিত্র সংযোজন করিয়াছিলেন। চিত্রগুলির পরোক্ষ উদ্দেশ্য যাহাই হউক, সেগুলি যেমন সুন্দর ও কৃতিত্বের পরিচায়ক, তেমনি যে অপাস্থ্যকর ও কুসঙ্কেতপূর্ণ সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। এই সকল চিত্র অঙ্কনের একটা গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে। Beardsley তাঁহার চিত্রকলার দ্বারা সাধারণ সপ্তরে ভণ্ডদের সন্ত্রস্ত করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন।

নাটিকাখানি পড়িলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ইহা কোনও ফরাসী গ্রন্থকারের লেখনী-প্রসূত নহে। গ্রন্থের ভাষা অতি বিশুদ্ধ ও সমলঙ্কৃত, কিন্তু যেন তাহাতে প্রাণ নাই—তাহা যেন সজীব ফরাসী ভাষা নহে—বড়ই ব্যাকরণসঙ্গত ও অত্যন্ত কষ্টকল্পিত। লেখক তাঁহার ভাষাকে লইয়া "হস্তস্থিত লীলা কমলের"—ন্যায় ক্রীড়া করিতে পারেন নাই; তাঁহার ভাষা নির্দ্দোষ ভাস্কর্য্যের মত—শুভ্র, শান্ত ও অনিন্দ্যসুন্দর, কিন্তু নির্জ্জীব পাষাণ। কেহ কেহ বলেন যে, নাটিকাখানি লেখা হইবার পর Marcel Schwab দেখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে ইহাতে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন করেন নাই তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

নাটকখানি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষে লিখিত হইয়াছিল, এবং ১৮৯৩ সালে Madame Bernhardt ইহা Palace Theatreএ অভিনয়ের জন্ম গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের অভিনয়বিচারক উক্ত বৎসর যে ইহার অভিনয়ের অনুমতি প্রদান করেন নাই, তাহা নাটকের তথাকথিত দুর্নীতির জন্ম নহে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থোক্ত কোনও বিষয় ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়া সম্বন্ধে রাজকীয় আইনে (ecclesiastical laws) নিষেধ আছে এবং অভিনয়বিচারকের সালোমে অভিনয়ে অনুমতি প্রদান না করার কারণ একমাত্র ইহাই।

১৮৯৬ সালে পারিনগরীতে Théâtre Libre রঙ্গমঞ্চে Mons. Luigne Poë কর্তৃক সালোমে নাটিকা অভিনীত হইয়াছিল এবং সালোমের অংশ যশস্বিনী Lima Muntz অভিনয় করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালের মে মাসে লণ্ডনস্থ Archer Street এ Bijou Theatre নামক রঙ্গমঞ্চে New Stage Club কর্তৃক সালোমে নাটিকা অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয় সম্বন্ধে ১১ই মে, ১৯০৫ তারিখের Daily Chronicleএর মন্তব্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"Quite a brilliant and crowded audience had responded to what seemed to have come out of mere curiosity to see a play the censor had forbidden; some through knowing what a beautiful, passionate, and in its real attitude, wholly inoffensive play Salomé is.

"As those who had read the play were aware this was in no way the fault of the author of Salomé. Its offence in the Censor's eyes—and considering the average audience, he was doubtless wise—was that it represents Salomé making love to John the Baptist, failing to win him to her desires, and asking for his death from Herod, as revenge. This, of course, is not Biblical, but is a fairly wide-spread tradition.

"In the play, as it is written, this love scene is just a very beautiful piece of sheer passionate speech, full of luxurious oriental imagery, much of which is taken straight from the 'Song of Solomon.' It is done very cleverly, very gracefully. It is not religious but it is in itself not blasphemous nor obscene, whatever it may be in the ears of those who hear it. It might possibly, perhaps, be acted grossly; acted naturally and beautifully, it would show itself at least art."

সালোমের নাট্যকলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রাচীন গ্রীক নাট্যশাস্ত্রের নির্দ্দেশ লইয়া বিচার করিতে হয়। ইহা যে প্রাচীন গ্রীক নাটকের আদর্শে রচিত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। গ্রীক নাট্যকাব্যের বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে তিনটি একত্বের সমাবেশ থাকে। প্রথম সময়ের একত্ব, আলোচ্য নাট্যোক্ত বিষয়টি একরাত্রির ঘটনা।

দ্বিতীয় স্থানের একত্ব—নাটিকার ঘটনাটি একস্থানে অর্থাৎ হেরোদের রাজসভায় সংঘটিত হইয়াছিল, কেবল উপসাংহারিক বা

catastrophe গ্রীক নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে মঞ্চের বাহিরে সংসাধিত হইয়াছিল; গ্রীক নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গমঞ্চে কোনও প্রকার ভয়াবহ বা নিষ্ঠুর কার্য্যের অভিনয়ের নিষেধ আছে। সালোমের উপসংহারিক, ইওকানানের শিরশ্ছেদন মঞ্চের বাহিরে জলাধারের মধ্যে সংসাধিত হইয়াছিল। তাহার পর, কার্য্যের একত্ব—সালোমে নাটকে সকল ঘটনাগুলিই নাট্যোক্ত বিষয়টিকে সাফল্যের দিকে অগ্রসারিত করিতেছে।

সালোমে নাটকে গ্রীক নাট্যকলার নির্দ্দেশানুসরণের প্রমাণ আরও একটি বিষয়ে পাওয়া যায়। সেটি আখ্যায়িকাংশের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও বাহ্যিক বাধ্যতা। ইওকানান বন্দী হইয়াও মুক্ত—তিনি চিরস্বাধীন, অদুম্য ও তেজস্বী। ইহুদার পার্ব্বত্যপথে মেসিয়ার পদশব্দ কেবল তাঁহারই কর্ণে আসিয়া পঁহুছিয়াছিল—জগতের ত্রাণকর্ত্তার আবির্ভাবের সূচনা একমাত্র তিনি বুঝিয়াছিলেন—ধর্ম্মের দুন্দুভিধ্বনি কেবল তাঁহাকেই প্রবুদ্ধ করিয়াছিল—আজ তাই প্রসুপ্ত জগৎকে জাগরিত করিতে তাঁহার সকল আয়াস, সকল চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন।—কে তাঁহার সে স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে? প্রশান্ত আকাশতলেই হউক বা ক্ষুদ্র জলাধারের মধ্যেই হউক, সর্ব্বস্থানে ও সকল সময়ে তিনি মুক্ত। তাহার পর বাহ্যিক বাধ্যতা—সেটা গ্রীক সাহিত্যে Moira বা নিয়তি—তাহার রথচক্র ত' জগতের উপর দিয়া অবিরামে ঘুরিয়া চলিয়াছে—সেই অদৃষ্ট রথচক্রের নিষ্পেষণে ভাল-মন্দ, শুভাশুভ, পাপ-পুণ্য সব চূর্ণ হইয়া একাকার হইয়া যায়- সে চক্র কাহারও অপেক্ষা রাখে না—কাহারও মুখ চাহে না। ইউকানানের সাধুতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা, জ্ঞানগরিমা ও তেজস্বিতা কিছুই এই নিয়তিচক্রের গতিরোধ করিতে পারিল না।

গ্রীক নাট্যসাহিত্যে chorusএর কার্য্য ইওকানানের বাণী দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে। অনাচারকে গালি দিয়া, পুণ্যের যশ ঘোষণা করিয়া, ইউকানানের বাণী নাট্যের আখ্যায়িকাকে চরম সাফল্যের দিকে নীত করিতেছে।

এখন আরও একটু বিচার্য্য আছে, সেটা আমাদের আলোচ্য নাটিকাখানির অংশ-বিভাগ ও তাহাদিগের পরবিন্যাস গ্রীক নাট্যশাস্ত্রানুমোদিত কি না। গ্রীক নাটকে যেমন Prologos, Parodos, Epeisodion, Stasimon এবং Exodos পরে পরে বিন্যস্ত থাকে, আমাদের আলোচ্য নাটিকাখানিতে এই অংশগুলির বিভাগও যাবনিক নির্দ্দেশানুমোদিতভাবে বিন্যাস বেশ পরিস্ফুটরূপে লক্ষিত হয়।

আমাদের সমালোচ্য অনুশীলন-গ্রন্থে সালোমে নাটিকাখানি যৌন-সঙ্কেত-বহুল বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। এটা যে কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা বিচার করিতে গেলে প্রবন্ধান্তরের অবতারণা করিতে হয়। আমাদের একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, মানব ও মানবেতর জীবের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ কিছুই নাই। মানবপ্রমুখ সকল জীবেরই প্রকৃতিগত চেষ্টা আত্মরক্ষা। এই আত্মরক্ষাবৃত্তির মূলে আমরা আমাদের সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সকল প্রেম ও ভালবাসা সকল প্রীতি ও তৃপ্তি সিঞ্চন করিতেছি। ইহাকে ঘেরিয়া আমাদের সকল জ্ঞান-গরিমা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইহাকে লইয়াই আমাদের যত নীতি, যত ধর্ম্মনিয়ম ও সমাজ-শাসন। এই আত্মরক্ষা বৃত্তি ধর্ম্মের ইন্দ্রজালে আপনার নগ্নতাকে ঢাকিবার প্রয়াস করে এবং সেই প্রয়াসের ফলই যৌন-সঙ্কেত। ইহাতে সুনীতি-কুনীতি নাই। আবহমানকাল হইতে মানব যাহা করিতেছে এবং তাহার অস্তিত্বের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহা করিবে, যৌন-সঙ্কেত তাহারই একটা অব্যক্ত ইঙ্গিত মাত্র। যৌন-সঙ্কেত এই গ্রন্থে তত স্পষ্টভাবে আছে কি না, সে বিষয়ে অনেক মতদ্বৈধ আছে;—আর যদিও এরূপ কোনও সঙ্কেত থাকে তাহাতে নাসিকা কুঞ্চিত করিবার কিছুই নাই।

মূল গ্রন্থখানি বড় উপাদেয়—ইয়ুরোপীয় নাট্যকলার চরম উৎকর্ষের ফল। বঙ্গভাষায় ইহার আখ্যায়িকাংশ বর্ত্তমান আকারে প্রকাশিত হওয়াতে আমাদের মাতৃভাষার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে.—আমরা তজ্জন্য গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞ ও তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটের অবস্থা

[শ্রীশিবকুমার চৌধুরী]

পূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে সুরাট-সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি; এ প্রবন্ধেও তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি। বেনিয়া ও মোগল ব্যতীত সুরাটে পার্শীর সংখ্যাও বড় কম ছিল না। তাহারা ভারতের আদিম অধিবাসী না হইলেও, বহুদিন যাবৎ ভারতে বসবাস করিতেছে। তাহাদের আদিম অধিবাস-স্থল পারস্যদেশ। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মুসলমানগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাহাদিগকে ভারতবর্ষে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল, ইহা বোধ হয় ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। কথিত আছে যে, তাহারা খালিফ ওমরের সময়ে এদেশে আগমন করে। গাভী যেরূপ হিন্দুগণের নিকটে মোরগ সেইরূপ পার্শীদিগের নিকটে শ্রদ্ধার পাত্র। পার্শীরা সূর্য্য উপাসক। পরে তাহারা অগ্নি-উপাসকে পরিণত হইয়াছে। অগ্নি তাহাদিগের নিকট অত্যন্ত পবিত্র বস্তু। তাহাদিগের বিবেচনায় স্বেচ্ছায় অগ্নিকে নির্ব্বাণ করার ন্যায় গর্হিত কার্য্য জগতে আর নাই। কাজেই, কোন গৃহে অগ্নি লাগিলে, তাহা নির্ব্বাপিত করা দূরে থাকুক, বরং তৈলাদি দ্বারা তাহা অধিকতর প্রজ্জলিত করাই তাহাদের রীতি ছিল। একবার একটী মোমবাতি জ্বালাইলে তাহারা তাহা নির্ব্বাপিত করিতে বিশেষ কুণ্ঠিত। তাহাদের মত এই যে, অগ্নি জ্বলিবে, নির্ব্বাপিত হয় ত তাহা স্বভাবে করিবে, নির্ব্বাপিত করা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত। অগ্নিকে তাহারা এত ভক্তি করিত কেন, তাহার কারণ আছে। কথিত আছে যে, তাহাদের আইনদাতা জারতুস্ত স্বর্গ হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া স্বীয় অনুচরগণকে উহা পূজা করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আরও কথিত আছে যে, আব্রাহাম শয়তান কর্ত্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলেও, অগ্নি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে ভস্মীভূত করেন নাই। এই দয়ালু অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করা তাহারা নেহাত অযৌক্তিক ও অন্যায় মনে করিত। তাহা ছাড়া, অগ্নি সূর্য্যের চিহ্ন; কাজেই অগ্নি-উপাসনার প্রবর্ত্তন।

এক ঈশ্বর সর্ব্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। সেই জন্য তাহারা প্রতি মাসের প্রথম দিনে ভগবৎ-উপাসনা করিত। অবশ্য এই দিনগুলি ছাড়া যে অন্য দিনে উপাসনা করিত না, এমন নহে। সম্মিলিত উপাসনার দিনে তাহারা সকলে কিছু-কিছু খাদ্য লইয়া সুরাটের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া উপাসনানন্তর একত্র আহারাদি করিত। তাহারা স্বীয় ধর্ম্মে অত্যন্ত আস্থাবান্ ছিল, এবং সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিত। পৃথিবীর সকল জাতির ন্যায় তাহারাও কোন-কোন বিষয়ে কুসংস্কারাপন্ন ছিল। তদানীন্তন পার্শীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিল এবং স্বীয় সন্তানগণকে স্ব-স্ব ব্যবসায় শিক্ষা দিত। তাঁতের কার্য্যে তাহারাই দক্ষ কারিগর ছিল। সুরাটে রেশমের দ্রব্যাদি তাহারাই প্রস্তুত করিত।

পার্শীদিগের সর্ব্বপ্রধান পুরোহিতগণ দস্তুর নামে পরিচিত ছিলেন। আর সাধারণ পুরোহিতগণকে দরুজ বা হারবুদ বলা হইত। পার্শীগণ মৃতের সৎকার বা তাহাকে কবরে নিহিত করে না। পশুপক্ষীর খাদ্যস্বরূপ উন্মুক্ত প্রান্তরে তাহাদের মৃতদেহ রক্ষিত হয়। মৃত্যুর কয়েকদিন পরে হালালচরগণ তাহাদের শ্মশান-সন্নিকটবর্ত্তী উন্মুক্ত প্রান্তরে মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইত। অনন্তর মৃত ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধবগণ চিরন্তন প্রথানুযায়ী নিকটবর্ত্তী গ্রাম বা স্থান হইতে কোন কুকুরকে রুটির টুকরা দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া মৃতদেহের নিকট লইয়া যাইতে চেষ্টা করিত। যদি কোন ক্ষুধার্ত্ত কুকুর দৈবযোগে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃতের মুখে স্থাপিত রুটির টুকরা আহার করিত, তাহা পার্শীগণ মনে করিত যে মৃত ব্যক্তি পরলোকে বেশ সুখী হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কুকুর মৃতের নিকট আগমন না করিলে, মৃত ব্যক্তির অবস্থা পরকালে বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। কুকুরের কার্য্য শেষ হইলে দুইজন দরু দণ্ডায়মান হইয়া যুক্ত-করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত। সেই অবসরে একখণ্ড সাদা কাগজ মৃতের কর্ণে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। প্রার্থনা শেষে হালালচরগণ মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইত।

শ্মশানটি একটী বিস্তৃত প্রান্তর,—সহর হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার চতুর্দ্দিকে একটী গোলাকৃতি প্রাচীর। প্রাচীরটি উচ্চে ১২ ফিট এবং প্রস্থে ১০০ ফিট। প্রাচীরের মধ্যস্থিত জমি প্রায় ৪ ফিট উচ্চ এবং একদিকে ঢালু। এই ঢালু দিক দিয়া গলিত শবের তরল পদার্থ এক স্থানে সঞ্চিত হয়। এই শ্মশানে শব পরিত্যাগ করিয়া বন্ধু বান্ধবগণ স্নানান্তে গৃহে গমন করিত। দুই দিন পরে নিকট-সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ শবের কোন্ চক্ষু গৃধ্রগণ কর্ত্তৃক উৎপাটিত হইয়াছে, দেখিবার জন্য শ্মশানে পুনরাগমন করিত। দক্ষিণ-চক্ষু প্রথমে উৎপাটিত হইলে তাহা মঙ্গলসূচক বলিয়া বিবেচিত হইত; কিন্তু বাম চক্ষু প্রথমে উৎপাটিত হইলে, পার্শীগণ তাহা অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিত। পার্শীদিগের শ্মশান বড়ই বিভীষিকাময়। জগতের অন্য কোন শ্মশানে এরূপ বীভৎস দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন স্থানে পুতি-গন্ধময় গলিত শব, কোন স্থানে বা হস্তপদাদি-ভক্ষিত বিকৃত শব, কোথাও বা গৃধ্রাদি ও বায়সকুল আহারের জন্য কলরব করিতে-করিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে উপবিষ্ট। দৃশ্যটি যে সম্পূর্ণ রূপে বিভীষিকাময়,

তাহতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত মৃত-যোদ্ধাগণের শবরাশি-পরিপূর্ণ রক্তাক্ত সমরক্ষেত্র, যুদ্ধের কিয়দ্দিবস পরে যে আকার ধারণ করে, শুধু তাহারই সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে।

তদানীন্তন পার্শীগণ কর্ত্তিত চুল রক্ষা করিতে বেশ সুদক্ষ ছিল। মস্তকের কেশরাশি ও শ্মশ্রু-গুম্ফাদি ইহারা বেশ সুন্দরভাবে রক্ষা করিতে পারিত।

সুরাটে তখন ইংরাজদিগের কুঠী ছিল। তৎকালীন "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী"র বাৎসরিক ব্যয় ছিল, এক লক্ষ পাউণ্ড। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে বাণিজ্যার্থ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিত। সুরাটে যে গৃহে ইংরাজগণ বাস করিত, তাহা মোগল-বাদশাহের ছিল। গৃহটি নগরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। বাদশাহ ইংরাজদিগের উপর খুব সদয় ছিলেন। তিনি গৃহটির যে কর পাইতেন, গৃহের উন্নতির জন্য তাহা ব্যয় করিতে দিতেন। কোম্পানির কার্য্যাবলী একটা সভা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। যাহাতে কোম্পানির সম্মান বজায় থাকে, দ্রব্যাদি যাহাতে সুবিধা দরে ক্রয় করা যায়, ও স্বীয় পণ্যদ্রব্যাদি উচ্চহারে বিক্রয় করা যায়, তৎপ্রতি সভার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এই সভা চারিজন সভ্য দ্বারা গঠিত ছিল। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে এই সভাস্থ চারিজন সভ্য ছাড়া একজন ধর্ম্মযাজক ও একজন কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। কোম্পানির কার্য্য চালাইবার জন্য বহু কেরাণী আড়তদার ও পত্রবাহী ভৃত্যগণ নিযুক্ত ছিল। নিম্নতম ভৃত্যগণকে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সভাপতির নিকট উপস্থিত হইতে হইত। এই সমস্ত ভৃত্য ছাড়া সভাপতি নিজের জন্য কয়েক জন ভৃত্য পাইতেন। তাঁহার নিম্নতম কর্ম্মচারিগণের মধ্যে হিসাব-রক্ষক দুইজন, এবং ধর্ম্মযাজক ও প্রত্যেক সভ্য এক-একজন করিয়া চাকর পাইতেন। ইহাদের বেতন কোম্পানী দিতেন। সভার কর্ম্মচারিগণ বৎসরে একবার করিয়া বেতন পাইতেন। মাসিক বন্দোবস্ত ছিল না। তবে নিম্নতম ভৃত্যগণের মাসিক মাহিনা দেওয়া হইত। মাসিক চারি টাকা করিয়া তাহাদের বেতন ধার্য্য ছিল। ইহারা যেরূপ সৎপ্রকৃতির সেইরূপ কার্য্যদক্ষ ছিল। সভাপতির আদেশ ব্যতীত কেহ কুঠীতে প্রবেশ করিতে বা তাহা হইতে নির্গত হইতে পারিত না। দ্বারে দিবা-রাত্র পাহারা থাকিত এবং সভাপতি কুঠীর অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের সহিত দৈনিক একবেলা আহার করিতেন। সাধারণতঃ প্রতি রবিবারে তাঁহাদের ভোজ জাঁকজমকের সহিত নির্ব্বাহ হইত। কখন কখন তাঁহারা পবিত্র দিনে সকলে সম্মিলিত হইয়া নগর-সন্নিকটবর্ত্তী উদ্যানে গমন করিয়া আহার করিতেন। ভ্রমণের সময় তাঁহারা মহা আড়ম্বর করিয়া বাহির হইতেন, ইংরাজগণ তাঁহাদের দ্রব্য বিক্রয়ার্থ দালাল নিযুক্ত করিতেন। বেনিয়াগণই দালালের কার্য্য করিত। এ বিষয়ে তাহারাই বেশ দক্ষ ছিল। তাহারা শতকরা তিন-মুদ্রা পাইত। কুঠীর লোকের চিকিৎসার্থ একজন দেশীয় ও একজন ইংরাজ চিকিৎসক নিযুক্ত ছিল। ঔষধ-পত্রের ব্যয় কোম্পানী বহন করিতেন। কুঠীর মধ্যে একটী ভজনালয় ছিল প্রত্যহ প্রাতঃকালে ৬টার সময় এবং সন্ধ্যা ৮টার সময় উপাসনা হইত ধর্ম্মযাজকের বেতন বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড ছিল। ইহা ছাড়া তিনি আহার, বাসস্থান, ভৃত্য, গাড়ী-ঘোড়া বিনামূল্যে পাইতেন।

—

সমবায় ও প্রাথমিক শিক্ষা

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সরকার, বি-এসসি।]

প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্ম্মাণ দেশেই সর্ব্বপ্রথমে সমবায়-সমিতির উৎপত্তি হয়। রেফিসেন্ ও সুলজ ডেলিজ (Raifeisen & Schulze-Delitzsch) নামক দুই জন মহানুভব ব্যক্তি দরিদ্র কৃষক ও শিল্পিগণের সুবিধার জন্য পরস্পর পৃথক্ ভাবেই যৌথ-কারবার-পদ্ধতি চালাইবার চেষ্টা করেন। বহুদিন পর্য্যন্ত ইহার সেরূপ কোন উন্নতি হয় নাই; কিন্তু ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জার্ম্মাণীতে ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় রূপে স্থাপিত হয়, এবং তদবধি ইহার বিশেষ উন্নতি ও প্রসার হইতে থাকে। সমবায়-প্রথা ইংলণ্ডে সেরূপ বিস্তৃতি লাভ না করিলেও, ইউরোপের অন্যান্য দেশে ইহার বেশ আদর হইয়াছে; কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলে সমবায় যে একান্ত আবশ্যক, তাহা সে দেশের অধিবাসীরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। ডেনমার্ক, আয়ারল্যাণ্ড, সুইডেন্ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাশ্চাত্য দেশের সমবায়ই একমাত্র উন্নতির মূল দেখিয়া, সদাশয় ইংরাজ-রাজ দারিদ্র্য-নিপীড়িত ভারতীয় প্রজাবৃন্দের আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য এ দেশেও সমবায়-পদ্ধতি (Co-operative system) প্রচলন করিবার চেষ্টা করেন; এবং স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, স্যার ফেডারিক নিকলসন্, মিঃ ডুপারলে প্রমুখ মহাপ্রাণ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ এ দেশে ইহার প্রবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। তাঁহাদের অদম্য উৎসাহের ফলস্বরূপ ইংরাজী ১৯১২ সাল হইতে এ দেশে সমবায় সমিতির (Co-operative Societies) রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে; এবং ভারত-গবর্ণমেণ্ট সেই বৎসর হইতেই প্রচুর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া সমবায়-বিভাগ নামক একটী স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করেন।

যে দেশেই হউক না কেন, হঠাৎ কোন নূতন জিনিস সাধারণের সম্মুখে ধরিলে কেহই তাহা প্রথমে গ্রহণ করা ত দূরের কথা, দেখিতেও চাহেন না। তবে যে জাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার অধিক, যাঁহাদের মধ্যে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা পাঁচ জনেরও কম, তাঁহারা সেই নূতন জিনিসটা বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে চাহিবে; এবং ভাল বলিয়া মনে হইলে, পরীক্ষা করিয়া দেখিতেও চাহিবে। কিন্তু যে দেশের ৩১,৩৪,১৫,৩৮৯ জন লোকের মধ্যে ২৯,৪৮,৭৫,৮১১ জন নিরক্ষর এবং শতকরা ২ জন মাত্র শিক্ষিত, সে দেশের লোকে বৈদেশিক

মস্তিষ্ক-প্রসূত সমবায়-প্রথা উদ্ভূতই বা কিরূপে, এবং তাহার প্রচারই বা হইবে কি প্রকারে? সে-জন্য, যতদিন পর্য্যন্ত না পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার প্রতি কেহই লক্ষ্য করেন না, এবং পরে যাঁহারা দেখেন, তাঁহাদের সংখ্যা অণুবীক্ষণে নির্ণয় করা যায় কি না সন্দেহ। সুতরাং সমবায়-প্রথা এ দেশে যখন প্রথম আসে, তখন দুই-চারি জন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ভিন্ন কেহই ইহার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই; কাজে-কাজেই ইহার সেরূপ আদরও হয় নাই। পরে যখন এই বিভাগের ভার শিক্ষিত বহুদর্শী রাজকর্ম্মচারিগণের হস্তে ন্যস্ত হইল, এবং তাঁহারা ইহার মূল মন্ত্রগুলির প্রচার করিতে ও কার্য্যক্ষেত্রে ইহার উপকারিতা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই সমবায়-প্রথার আদর ও সমবায়-সমিতির বিস্তার হইতে আরম্ভ হইল। আজ শিশু "সমবায়-পদ্ধতি"—ইহার সপ্তম বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে; এবং ইহার মধ্যেই আমরা রাজসাহী জেলার "নওগাঁ গাঁজা চাষীদের সমবায়-সমিতি", কলিকাতার মেছুয়াবাজারে "চর্ম্মকার ঋণদান সমিতি", বঙ্গবাসী ও সেণ্টপল্‌স্‌-কলেজের ছাত্রাবাসে "সমবায়-ভাণ্ডার" (Co-operative Stores) ফরিদপুর, মেদিনীপুর পাবনা প্রভৃতি স্থানে বৃহৎ সমবায়-কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক দেখিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেমন উচ্চ আশা পোষণ করিতেছি, তেমনি অন্য দিকে গ্রাম্য সমিতি-গুলির দুর্দ্দশা দেখিয়া নৈরাশ্যের আবর্ত্তে পড়িয়া হাত-পা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। ইংরাজীতে একটা কথা আছে,—"What is in microcosm is in macrocosm". ব্যষ্টিতে যাহা আছে, সমষ্টিতেও তাহাই আছে। ব্যষ্টি লইয়াই যখন সমষ্টির উৎপত্তি, তখন পল্লী-সমবায়-সমিতির উন্নতি না হইলে কেবলমাত্র দুই-চারিটি সহরের সমিতির উন্নতি হইলেই সমগ্র দেশের উন্নতি হইবে কিরূপে?

দশজনে একত্র মিলিয়া কাজ করিবার পদ্ধতি আমাদের দেশেও যে পূর্ব্বে ছিল না, তাহা নহে। তবে তাহা অধুনা-প্রচলিত সমবায়-নীতির ন্যায় দেশবাসিগণের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিত কি না সন্দেহ। এখনও চলিত কথায় বলে, "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।" কিন্তু পূর্ব্বে দশে মিলে যে কাজ হইত, তাহা প্রায় বারোয়ারীর আমোদ-প্রমোদ কিম্বা দুই একটা পুষ্করিণী খনন বা রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতিতেই সীমাবদ্ধ থাকিত। তাহার মূলে ব্যক্তি বা জাতিগত উন্নতির ইচ্ছাও থাকিত না, আর তাহার সম্বন্ধে কোন চেষ্টাও হইত না। তাহার কারণ, আমাদের এই হতভাগ্য দেশে শতকরা ৯০ জন লোক অদৃষ্টবাদী। এক জনের উন্নতি হইল কি না, তাহা লইয়া অন্যে মাথা ঘামাইতে চাহে না। "যার হবার তার উন্নতি আপনিই হবে, তুমি-আমি হাজার চেষ্টা করলেও তা আটকাতে পারবো না; আর কপালে না থাকলে হাজার চেষ্টাতেও তাকে টেনে তুলতে পারবো না"—এই যে "বস্তুবিধ্য ভবিষ্যতি" সংস্কার বহুকাল হইতে আমাদের অস্থি-মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। জার্ম্মানী, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের কৃষিজীবিগণও প্রতিদিন সময়মত একটু-আধটু লেখাপড়া করিয়া থাকে। চর্ম্মকার জুতা সেলাই করিবার সময় তাহার পার্শ্বে একখানি পুস্তক রাখিয়া দেয়; এবং মধ্যে-মধ্যে অবসর পাইলেই দুই-এক পৃষ্ঠা পড়িয়া ফেলে। তাহারা এইরূপে লেখাপড়ার চর্চ্চা করে বলিয়াই, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়, এবং তাহারা আপন-আপন ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে উচ্চ-শিক্ষাও লাভ করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও জনকাদি রাজর্ষিগণের এরূপ বিদ্যা-শিক্ষার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা এক হাতে লাঙ্গল ধরিতেন ও অন্য হাতে বেদ লইয়া অধ্যয়ন করিতেন। আর সেই দেশেই জন্ম-গ্রহণ করিয়া আধুনিক কৃষক-সম্প্রদায়ের কি শোচনীয় অধঃপতন! তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, "যে চাষ-আবাদ করে, তাহাকে বোধ হয় আর কোন কাজই করিতে নাই।" তাহাদের অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বুঝাইতে গেলে তাহারা বলিবে, "মশাই, আমরা ছোট লোক—আমাদের আবার উন্নতি! আমাদের চাষ করে খেতে হবে, লেখাপড়ার সময়ই বা পাবো কখন, আর তার দরকারই বা কি? আপিসে চাকরী করতে যাচ্ছি না তো!" কি সুন্দর যুক্তি! যেন কেবল চাকরী করিবার জন্যই লেখাপড়া শিখিতে হয়! কায়ক্লেশে উদর-পূরণ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করাই যেন ইহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। আশা নাই, উদ্যম নাই, যেন একটী সজীব যন্ত্র! গ্রীষ্মে রৌদ্র, বর্ষায় বৃষ্টি, শীতে কম্বল উপভোগ করিয়া এক একটী মরসুমী কাঠের (Seasoned Wood) মত বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই যেন ইহাদের জন্ম। ইহারা না পায় দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে, না পায় একখানা ভাল কাপড় পরিতে। আর যাহারা ঋণের দায়ে ইহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া সামুদ্রিক শয়তানের (Octopus) মত ইহাদের রক্তশোষণ করিতেছেন, তাঁহারাই হইলেন ভদ্রলোক—দেশের গৌরব ও সমাজের শীর্ষস্থানীয়!

দরিদ্র কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য এই ভদ্রলোকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী। কিন্তু পাছে স্বাস্থ্যের গ্লানি কিম্বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সামান্য ত্রুটী হয়, এই ভয়ে তাঁহারা ক্রমশঃ পল্লীগ্রামের অভদ্র (?) কৃষিজীবিগণের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া সহরের লোক সংখ্যা-বৃদ্ধি করিতেছেন। ফলে পল্লীগ্রামগুলি ম্যালেরিয়া গ্রস্ত, দরিদ্র, অশিক্ষিত লোকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। তাহারা আপনার উন্নতি আপনি ত কখনও করিতে পারিবে না, আর যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য যত্নবান্ হন, তাহাও তাহারা সংশয়ের চক্ষে দেখিবে। কৃষিজীবিগণের কথা কি,—পল্লীগ্রামের অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকেরও ধারণা, গবর্ণমেণ্টের কোন স্বার্থ না থাকিলে তাহারা আমাদের সাহায্য করিতে আসিবে কেন? তাহাদের নিশ্চয়ই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাহা না হইলে তাহাদের এত মাথাব্যথা কিসের? কিন্তু কি যে সেই উদ্দেশ্য এবং কেন যে মাথাব্যথা, তাহা কেহই বুঝিবার চেষ্টা করিবে না। সুশিক্ষা পাইলে তাহারা এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ একবার জিনিসটী বুঝিবার চেষ্টা করিত।

আর একটা কথা—অভাবে পড়্‌লে শালগ্রামের পৈতা চুরী করাও যখন পল্লীনীতি-বিরুদ্ধ নহে, তখন চিরস্থায়ী অভাবের মধ্যে পড়িয়া আমাদের নৈতিক চরিত্র যে কত হীন হইয়াছে, তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা শিক্ষিত; তাহাদের চরিত্রবল খুব বেশী। তাহারা স্বার্থত্যাগ করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি করিতে পারে; এবং যাহারা উপকৃত হয়, তাহারাও বুঝে যে, নিজের ক্ষতি না করিয়াও অপরের উপকার করা সম্ভব। কিন্তু এদেশের শিক্ষাই এরূপ যে, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলেও, কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না।

তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পল্লীগ্রামেই এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা প্রথম জীবনে কিছু টাকা উপার্জ্জন করিয়া সেই টাকার সুদে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইহাতে আদত টাকাটা মজুতও থাকে, আর সময়ে-সময়ে সন্তান সন্ততিতে এই অর্থের দ্বিগুণ বা চতুর্গুণও আদায় হইয়া যায়। এরূপ লোকেরাই গ্রাম্য-সমবায় সমিতির প্রধান অন্তরায়। কৃষক ও শ্রমজীবিগণ যাহাতে সমিতির সভ্য হইয়া টাকা কড়ি ধার লইতে না পারে, তজ্জন্য ইঁহারা ঐ সকল অশিক্ষিত লোকের মনে নানা রূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দেন। এই উত্তমর্ণগণ স্বার্থত্যাগ কাহাকে বলে জানেন না; এবং সেই জন্য কিছু কম সুদে গ্রাম্য সমবায় সমিতির হস্ত দিয়া এই টাকা ধার দিতে একান্ত কুণ্ঠিত।

সহরে উদার ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া রাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিতগণ "সমবায়" প্রচারের জন্য যাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন তাহা পল্লীগ্রামের অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকের পক্ষেও যে প্রযোজ্য হইবে, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। সহরে শিক্ষার বিস্তার অধিক—কাজে-কাজেই লোকের চরিত্র বেশ উন্নত, রীতিনীতি মার্জ্জিত এবং মনও উদার। তথায় কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি সাধারণের মঙ্গলের জন্য যদি কোন কাজ করিবার চেষ্টা করেন, লোকে চারিদিক হইতে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ছুটিয়া আসিবে; কিন্তু পল্লীগ্রামে ইহার ঠিক বিপরীত। কেহ আবহমানকাল-প্রচলিত কোন মন্দ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া, গ্রামবাসিগণের উন্নতির জন্য কিছু করিতে গেলেই, লোকের মাথায় বজ্রাঘাত হইবে। তাহারা একটুও বঝিতে চেষ্টা করিবে না। "কাকে কাণ নিয়ে গেল" বলিলেই কাক মারিবার জন্য লাঠী লইয়া দৌড়াইবে: একবার কাণে হাত দিয়াও দেখিবে না কাণ আছে কি না। আর গবর্ণমেণ্টের সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারিগণ দার্শনিকের গাম্ভীর্য্য লইয়া বলিবেন, "একটা জেলায় ছয় মাসে ৩৬টী নূতন গ্রাম্য সমিতি গঠন কর। অংশ ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক চালাও। কেন হইবে না? এ সমস্তই ত লোকের উপকারের জন্য।" তাঁহারা ত সুচিন্তিত ও সুযুক্তিপূর্ণ মতামত লিখিয়াই নিশ্চিন্ত। যাহাদের জন্য এত উদ্যম তাহাদের মধ্যে এ সমস্ত শুনেই বা কয়জন, আর বুঝেই বা কয়জন? প্রায় সব পল্লীগ্রামের লোকেই বলে "প্রবেশ ফি দিয়ে, টাকা জমাই যদি দিতে যাব, আমাদের টাকা ধার করবার দরকার কি? অন্য লোকে ত আমাদের অমনিই টাকা দেবে। পূর্ব্বে যে দেশে এ সমস্ত কিছুই ছিল না তখন কি আমরা খাইতে পাই নাই, না, তখন পৃথিবী তাহার কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছিল?" যাহাদের জন্য এত চেষ্টা, তাহারাই যদি না বুঝিল, তবে সমস্তই ত অরণ্যে রোদন করার ন্যায় নিষ্ফল। যদি প্রকৃতই তাহাদের উন্নতি করিতে হয়, তাহা হইলে গ্রামবাসীদের মধ্যে অন্ততঃ সমবায়ের মূলমন্ত্র বুঝিবার মত শিক্ষার বিস্তার করিয়া, তাহাদের অজ্ঞতা দূর করা চাই,—তাহাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা দেওয়া চাই; তবে তাহাদের মন উদার ও চরিত্র উন্নত হইবে; আর তখন তাহারা "সমবায়ের ছায়ার তলে" বসিয়া সমস্বরে গাহিতে পারিবে,—

> ধন্য আমার দয়াল রাজা ধন্য তাঁহার দান
> বুকে আমার শান্তি ভরা ধন্য ভগবান!"

শ্রমণী-সঙ্ঘ।

(প্রতিবাদ)

[শ্রীচরণদাস চট্টোপাধ্যায়, বি-এ]

বিগত পৌষ মাসের "ভারতবর্ষের" "বিবিধ প্রবন্ধে" শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়-চৌধুরী বি এ, "শ্রমণী সঙ্ঘ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ, এবং তিনি সঙ্ঘের সুন্দর চিত্রটি যথাসাধ্য ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক প্রবন্ধ-মধ্যে কতকগুলি প্রধান থেরির ও উপাসিকার সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ করিয়া বিষয়টি সাধারণের বোধগম্য করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু ঐ সুন্দর প্রবন্ধটি কতকগুলি ঐতিহাসিক, কাল্পনিক ও ভৌগোলিক প্রমাদে অত্যন্ত দুষ্ট হইয়াছে। নাম বিধি বা technical terms সম্বন্ধেও লেখক দু'একটী ভয়ঙ্কর ভুল করিয়াছেন। বঙ্গে পালি-সাহিত্যের চর্চ্চা এখনও তত প্রবল হয় নাই; এজন্য যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয়ে একটু আধটু আলোচনা করেন, তাঁহাদের অতি সাবধানে কার্য্য করা কর্ত্তব্য; নচেৎ সাধারণে তাঁহাদের নিকটে বৌদ্ধধর্ম্ম ও শাস্ত্রের অন্তর্গত অসত্য বস্তুকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

প্রথমেই লেখক বুদ্ধ ও বোধিসত্ব সম্বন্ধে একটী ভয়ঙ্কর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "নারী সঙ্ঘের সেবিকা পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে দারুণ অমঙ্গল সাধিত হইবে, ইহাই ছিল বোধিসত্বের একমাত্র আশঙ্কা।" যদি সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে বোধিসত্ব যে কখনও শ্রমণী-সঙ্ঘ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা কুত্রাপি দেখা যাইবে না সমগ্র জাতকের গল্পগুলি বোধিসত্বের মাহাত্ম্য ও পারমিতার দৃষ্টান্তে পূর্ণ। বহুস্থানে দেখিলাম, বোধিসত্ব পশু রূপে পশু-সঙ্ঘের নেতৃত্বে বৃত হইয়াছেন, পশুসঙ্ঘে বহু নীতি কথার আলোচনা

করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহাকে পশু রূপে কেন মনুষ্য রূপেও কখনও শ্রমণী-সঙ্ঘ স্থাপন করিতে দেখিলাম না। এমন কি, বোধিমূলে (ষাউপাদিসেস) নির্ব্বাণ লাভ করা পর্য্যন্তও কখন শ্রমণী-সঙ্ঘ স্থাপন করার খবর "নিদান কথায়ও" (১) পাওয়া যায় না। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, লেখক কোথায় বোধিসত্ত্বকে ঐরূপ আশঙ্কা করিতে ও শ্রমণী-সঙ্ঘ স্থাপিত করিতে দেখিয়াছেন? তবে আমরা ভগবানকে বোধিসত্ত্ব রূপে নহে, বুদ্ধ রূপে ঐ আশঙ্কা ও ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ স্থাপন করিতে বিনয়পিটকে দেখিয়াছি বটে। (২)

গৌতমবুদ্ধ রূপে জন্মগ্রহণ করার পূর্ব্বে ভগবান যে পাঁচশতপঞ্চাশ বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এই সংখ্যাতীত বর্ষগুলি বোধিসত্ত্বের কার্য্যকাল। এমন কি বোধিমূলে নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বেও তিনি বোধিসত্ত্ব নামে বৌদ্ধশাস্ত্রে আখ্যাত। নির্ব্বাণলাভের পর তিনি বুদ্ধ বা সর্ব্বজ্ঞ। জাতকের কোনও গল্পে দেখা যায় না যে, বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ নামে আখ্যাত হইয়াছেন। সেইরূপ "নিকায়" প্রভৃতিতে বোধিমূলে নির্ব্বাণলাভের পরে তাঁহাকে কখনও বোধিসত্ত্ব বলা হয় নাই। নির্ব্বাণলাভের পর তিনি বুদ্ধ এবং তৎপূর্ব্বে বোধিসত্ত্ব—ইহাই বৌদ্ধশাস্ত্রের অভিমত; এবং তাহার প্রমাণ জাতকের প্রতি পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান। কপিলাবস্তুতে জন্মলাভ হইতে বোধিমূলে নির্ব্বাণের কাল পর্য্যন্ত সিদ্ধার্থ বোধিসত্ত্ব নামে খ্যাত; এ সময়ে তিনি যে কোনপ্রকার মনুষ্য সঙ্ঘ স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ, এমন কি পালি ভিন্ন বিভিন্ন ভাষায় পরিবর্ত্তিত বৌদ্ধশাস্ত্রেও লিখে না। মহাত্মা Kern তাঁহার Buddhism (৩) নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"The sublime place occupied by the Buddha cannot be reached before his having gone through numerous, nay innumerable existences, and having lived in lower and higher states. A being destined to develop into a Buddha is called a "Bodhisattva" he is, we may say, a Buddha "potentia" not yet "de facto". Properly "Bodhisattva" simply means "a sentient or reasonable being" possessing bodhi, but this faculty has not yet ripened to "samyak—sambodhi"—perfect sensibleness. He is, in a word, the personification of what the Jogins call "buddhisattva" potential intelligence, just as the Buddha, the samyak-sambuddha, personifies "buddhi" the highest product of nature, in most Indian systems of philosophy based on cosmogony." সেইরূপ প্রাতঃস্মরণীয় মনীষি Childers (৪) লিখিয়াছেন—"A being destined to attain Buddhaship. This term is applied to a Buddha in his various states of existence previous to attaining Buddhahood........ In his last existence when born as the son of king Suddhodhana, he was still a Bodhisattá and continued so until the age of 34 when he attained Buddhahood." লেখকের ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য বোধ হয় আর প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না।

আলোচ্য প্রবন্ধে আরও দেখা যায় যে, লেখক কোন-কোন স্থানে স্বীয় মন্তব্য স্থাপনেরও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ—"অল্পকাল পরে লিচ্ছবিবংশীয় বেশালির অধীশ্বরও সপার্ষদ বুদ্ধদেবকে রাজপ্রাসাদে আহ্বানের জন্য আগমন করিলেন"। লেখক "লিচ্ছবিবংশীয় বেশালির অধীশ্বর" কথাটি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? দীঘনিকায় অন্তর্গত মহাপরিনিব্বাণ সুত্তে (৫) "বেসালিকা লিচ্ছবি" অর্থাৎ বৈশালির লিচ্ছবি ইহাই লিখিত আছে, কিন্তু তথায় বৈশালির অধীশ্বর স্বয়ং আসিয়াছিলেন বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তথায় পার্ষদেরও কোন উল্লেখ নাই। আচার্য্য বুদ্ধঘোষও ঐ ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। কতকগুলি লিচ্ছবি নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন, ইহাই টীকায় লিখিত আছে। রাজাও আসেন নাই, রাজপ্রাসাদেরও উল্লেখ নাই। ঐ সংবাদ লেখকের সম্পূর্ণ অমূলক কল্পনামাত্র। বিনয়পিটকেও (৬) ঐ ঘটনার উল্লেখ আছে; কিন্তু তথায়ও লেখকের পক্ষ-সমর্থন-স্বরূপ কিছুই নিদর্শন পাওয়া যায় না; এবং সমন্তপাসাদিকায় বুদ্ধঘোষ ঐ ঘটনার সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। এ স্থলে আমাদের আরও বলা কর্ত্তব্য এই যে, তৎকালে লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্রে অধীশ্বর বলিয়া কোন একটী পদ ছিল না। প্রজাতন্ত্রের নেতা বা president রাজা উপাধিতে ভূষিত হইলেও, তিনি, অধীশ্বর অর্থে যাহা বুঝায়, তাহা ছিলেন না; এবং রাজকার্য্য একজনের দ্বারা পরিচালিত হইত না। লেখক আরও লিখিতেছেন, "তখন বিফলমনোরথ নরপতি অম্বপালীর শরণাপন্ন হইলেন।" এ স্থানেও মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্রে কেবলমাত্র লিচ্ছবিগণ প্রার্থনা করিলেন, ইহাই উল্লিখিত আছে, নরপতির নামমাত্রও নাই।

(১) Nidanakatha-Jataka Vol. I. Ed. V. Fausboll—Kopenhagen 1877.

(২) Cullavaggo—Vinaya Pitaka Vol. II. p p. 256-257. Ed. Hermann Oldenberg, Berlin 1880.

(৩) Manual of Buddhism—p. 65. Ed. H. Kern—Strassburg, 1896.

(৪) Pali-English Dictionary—p. 93. Ed. R. C. Childers, London, 1909. (4th Impression)

(৫) Digha Nikaya, Vol. II. p. 96. Ed. Rhys Davids, London, 1903. (Pali Text Society Series.)

(৬) Vinaya Pitaka Vol. I. Mahavagga, p. 232, Ed. Hermann Oldenberg—Berlin, 1879.

ঐ প্রসঙ্গে তিনি পুনশ্চ বলিয়াছেন, "কিন্তু সমগ্র রাজ-ভাণ্ডারের বিনিময়েও অম্বপালী তাহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন না।" লেখক রাজভাণ্ডারের কথা কোথায় পাইলেন? মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে কেবল আছে, "সবে পি মে অয্যপুত্তা বেসালিং সাহারং দস্সেথ এবং মহন্তং ভত্তং ন দস্সামী তি।" (৭) "বেসালিং সাহারং" অর্থে কি রাজভাণ্ডার বুঝায়? ইহার অর্থ বৈশালি ও তৎসমূহ জনপদ (৮) রাজভাণ্ডার ত দূরের কথা—অম্বপালী নিমন্ত্রণের পরিবর্ত্তে সমগ্র রাজ্য লইতেও স্বীকৃত হন নাই। সামান্য গণিকা যে কতদূর লোভ সংবরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভগবান বুদ্ধের উপর কিরূপ অটুট ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, তাহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই স্থান ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া যায় না। লেখক বোধ হয় অম্বপালীর মুখে "বেসালিং সাহারং" কথাটি শুনিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়াছেন যে, ইহারা অধীশ্বর স্বয়ং ও তৎপারিষদবর্গ,—নচেৎ বৈশালি ও তৎসমূহ জনপদ দান করার আর কাহার ক্ষমতা? কিন্তু লেখকের জানা উচিত ছিল যে, লিচ্ছবিদের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের ব্যবস্থা ছিল, এবং প্রত্যেকের রাজ্যশাসন-প্রণালীর উপর যথেষ্ট ক্ষমতাও ছিল। এজন্য লিচ্ছবিগণের সম্মুখে অম্বপালীর এ উক্তি। লেখক আরও জানিবেন যে, অম্বপালী গণিকা, লিচ্ছবিবংশসম্ভূতা ছিলেন না। সুতরাং যিনি লিচ্ছবিবংশীয় নহেন, তাঁহার মুখে এইরূপ উত্তর শোভা পায়; কারণ ইহা তথাগতের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির পরিচায়ক।

ঐ সম্বন্ধে লেখক আরও লিখিয়াছেন, "আহার ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে যুক্তপাণি অম্বপালী নিবেদন করিলেন, তাঁহার বিশাল ভবন ও বিপুল ধনরাজি একটী বিহার স্থাপন ও সংরক্ষণের নিমিত্ত অদ্য হইতে উৎসর্গীকৃত হইল।" অম্বপালী যে ঐ সময়ে তাঁহার বিশাল ভবন ও বিপুল ধনরাজি দান করিয়াছিলেন, এরূপ কথা নিকায়সমূহে বা বিনয়পিটকে পাওয়া যায় না। আমরা বিনয়পিটকে (৯) দেখিতে পাই যে অম্বপালী তাঁহার প্রশস্ত উদ্যান সুবিখ্যাত "অম্বপালীবন" বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দান করিয়াছেন। সে স্থানে বিশাল ভবনের ত কোনরূপ উল্লেখ নাই! মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে (১০) ঐ স্থলে "আরাম" কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এ স্থলে "আরাম" অর্থে প্রমোদ-কানন বুঝিতে হইবে; কারণ পালিভাষায় আরাম অর্থে কখনও বসতবাটিকা বুঝায় না। অম্বপালী, মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রের বর্ণনামতে অবশ্য তাঁহার প্রাসাদতুল্য ভবনে সসঙ্ঘ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ অট্টালিকা তিনি দান করেন নাই; কারণ, তাহা হইলে অবশ্য ঐরূপ অর্থের কোন একটী কথার উল্লেখ থাকিত; কিন্তু যে কথাটি ঐ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ উদ্যান বা প্রমোদ-কানন। Dr. Rhys Davids মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে ব্যবহৃত "আরাম" কথাটির "pleasance" বা প্রমোদকানন (১১) অর্থ করিয়াছেন। বহু কারণে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, অম্বপালী তাঁহার সুবিখ্যাত বৈশালি নগরীর বহির্ভাগস্থিত আম্রকানন ঐ সময়ে ভগবান তথাগতকে দান করিয়াছিলেন; কারণ বিনয়ের "মহাবগ্গে" স্পষ্টই "অম্বপালীবন" বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ প্রদত্ত উদ্যান বৈশালির মহাবন প্রভৃতির ন্যায় বৌদ্ধসঙ্ঘের একটী প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। বৈশালির ঘটনা-সংক্রান্তে মহাবন জীবক অম্ববন ও অম্বপালীবন এই কয়েকটির প্রধানতঃ উল্লেখ ত্রিপিটকে দেখিতে পাওয়া যায়। ফ-হিয়েন এবং য়ুয়ং চয়ঙ দুইজনেই বৈশালি ভ্রমণকালে ঐ আম্রকানন পরিদর্শন করেন; এবং দুইজনেই উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফ-হিয়েন বলিয়াছেন—

"Three li, south of the city, on the west of the road is the garden, (which) the same Ambapali presented to Buddha in which he might reside." (১২) সেইরূপ য়ুয়ং চয়ঙ বলিয়াছেন—"Not far to the south of this is a vihara, before which is built a stupa; this is the site of the garden of the Amre-girl which she gave in charity to Buddha" (১৩)। পরলোকগত মহাত্মা Watters ঐ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"In Pali scriptures we find the gift which Ambapali presents to the Buddha called a "Vana" and "arama." Thus the Vinaya represents the lady as giving this "Ambapalivana" to Buddha who accepts the "arama" and in the Maha-parinibbana-sutta, the lady gives and the Buddha accepts the "arama." The accounts generally seem to agree, in placing the Amra-garden (or Ambapali's Orchard) to the south of Vesali and at a distance of three or four li, from the city according to Fa hsien or seven li, according to a Nirvana sutra...........But then the authorities are not agreed as to the place at which the ceremony was performed, some making it the

(৭) Digha Nikaya loc cit.

(৮) সাহারং তি সজনপদং—Sumangala Vilasini, Mahavagga, Mahaparinibbanasuttantain—Rangoon Edition.

(৯) Vinaya Pitaka—Mahavagga, Vol. I. p. 233.

(১০) Mahaparinibbana suttantain, Digha Nikaya, Vol. II. p. 98.

(১১) Sacred Books of the Buddhists—Dialogues of the Buddha, Vol. III. p. & II. p. 105, trans. by T. W. and C. A. F. Rhys Davids, London, 1910.

(১২) Travels of Fa-Hien, Ed. J. Legge; Oxford, 1886, p. 72-73.

(১৩) Buddhist Records of the Western World, Ed. Beal, Vol. II. p. 69, London, 1906.

lady's residence (দীঘ) and others the orchard itself.' বিনয় (১৪)।

ফা-হিয়েন অম্বপালী-প্রদত্ত বৈশালি নগরের ভিতর একটী বিহারের (১৫) উল্লেখ করিয়াছেন, উহা সম্ভবতঃ অম্বপালীর বসতবাটিকা হইবে, এবং বোধ হয় গণিকা প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে তাহাও সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন। ঐ অট্টালিকা সম্ভবতঃ ভিক্ষুণিসঙ্ঘের বাসস্থান রূপে পরিগণিত হইয়া থাকিবে; এবং আরও বোধ হয়, গণিকা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈশালিস্থ ভিক্ষুণিগণের সহিত তথায় বাস করিতেন। যুয়ং চয়ঙ স্পষ্ট বলিয়াছেন—"Not far from this is a stupa; this is the old house of the lady Amra. It was here the aunt of Buddha and other Bhikshunis obtained Nirvana" (১৬) কিন্তু লেখক যে প্রসঙ্গে তাঁহার বিশাল ভবন ও বিপুল ধনরাজি দানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তাঁহার কল্পনামাত্র এবং মিথ্যা। ঐ সময়ে অম্বপালী তাঁহার উদ্যানমাত্র দান করিয়াছিলেন।

সৌভাগ্যবতী বিশাখার প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন "জীর্ণবস্ত্রধারিণী ভিক্ষুণিগণ অচিরাবতীতে নদীতে স্নানকালে নির্লজ্জা হাস্যকৌতুকময়ী বারবিলাসিনীদিগের দ্বারা উপহসিত হইত। ভিক্ষুণিগণের বসনদৈন্যের উল্লেখ করিয়া এই সকল বারাঙ্গনা তাঁহাদিগকে পঙ্কিল পাপপথে প্রলোভিত করিত। ভিক্ষুণিগণ তাঁহাদিগের অভাব বিমোচনের কোন পন্থাই আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইয়া, সলজ্জ বদনে অধোমুখে রহিতেন। করুণাময়ী বিশাখা তাঁহাদিগকে স্নান-বস্ত্র দান করিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন।" এ স্থলেও তিনি আমাদের যথেষ্ট অলীক সংবাদ দিয়াছেন। যতদূর বোধ হয়, তিনি অশ্লীলতা দোষ হইতে প্রবন্ধকে এক প্রকার রক্ষা করিয়া, সত্যের অপলাপ করিয়াছেন মাত্র, নতুবা তিনি এরূপ লিখিবেন কেন? সমগ্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুণি-সঙ্ঘ পুরাকালে প্রতিমোক্ষ ও বিনয়পিটকের নিয়মাবলীর উপর একরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এবং অধুনাও সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশস্থ ভিক্ষুগণকে যথাসাধ্য ঐ সকল নিয়মাবলী পালন করিতে হয়। সমগ্র নিয়মাবলী একেবারেই প্রচলিত হয় নাই; ক্রমে ক্রমে ঐগুলি সঙ্ঘের জন্য আবশ্যক হইয়াছিল; এবং তাহাদের প্রত্যেকটি জ্বলন্ত পাপ দৃষ্টান্তের কবল হইতে রক্ষা জন্য ভগবান বুদ্ধ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত উহাতে কতকগুলি ব্যবস্থাও আছে; এবং কোনগুলি আদিষ্ট ও কোনগুলি অনাদিষ্ট, কোনগুলি সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়, ইহারও উল্লেখ আছে। এ হেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘের চিরপ্রয়োজনীয় বিনয়ের মূলে লেখক আঘাত করিয়াছেন। যাহা হউক এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি "জীর্ণবস্ত্রধারিণী ভিক্ষুণিগণের জন্য বিশাখা স্নানবস্ত্রের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন" এইরূপ উল্লেখ বিনয়পিটকের কোন্ স্থানে দেখিলেন? আমরা মূল পালি হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া লেখকের বিবরণের সত্যাসত্যতা বিচার করিব। মহাবগ্‌গে এইরূপ লিখিত আছে, "ইধ ভন্তে ভিকখুনিয়ো অচিরবতিয়া নদিয়া বেসিয়াহি সদ্ধিং নগ্‌গা একতিত্থে নহায়ন্তি। তা ভন্তে বেসিয়া ভিকখুনিয়ো উপ্পণ্ডেসুং "কিং নু খো নাম তুম্হাকং অয্যে দহরানং ব্রহ্মচরিয়ং চিণ্ণেন, ননু নাম কামা পরিভুঞ্জিতব্বা যদা জিণ্ণা ভবিস্সথ তদা ব্রহ্মচরিয়ং চরিস্সথ, এবং তুম্হাকং উভো অন্তা পরিগ্গহিতা ভবিস্সন্তি ইতি"। তা ভন্তে বেসিয়াহি উপ্পণ্ডিয়মানা মঙ্কু অহেসুং। অসুচি ভন্তে মাতুগামস্স নগ্গিয়ং জেগুচ্ছং পটিকূলং। ইমাহং ভন্তে অত্থবসং সম্পস্সমানা, ইচ্ছামি ভিক্খুনিসংঘস্স যাবজীবং উদকসাটিকং দাতুন্ ' তি"। (১৭) অর্থাৎ বিশাখা ভগবানকে এইরূপ বলিতেছেন, "হে ভন্তে, ভিক্ষুণিগণ নগ্না হইয়া বেশ্যাগণের সহিত অচিরবতী নদীর একতীর্থে স্নান করিতেছেন (দেখিলাম), এবং সেই বেশ্যাগণ, হে ভন্তে! ভিক্ষুণিদিগকে উপহাস করিলেন, "হে আর্য্যাগণ, তরুণকালে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার কি প্রয়োজন। (এ সময়ে) বাস্তবিক কাম ভোগ করাই উচিত। যখন বৃদ্ধা হইবেন, তখন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন। তাহা হইলে আপনাদের উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে।" হে ভন্তে! তাঁহারা ঐরূপে উপহসিত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হে ভন্তে! স্ত্রীজাতির নগ্নতা অত্যন্ত কদর্য্য, লজ্জাদায়ক ও বীভৎসতাজনক। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া, ভন্তে! আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, যাবজ্জীবন ভিক্ষুণি-সঙ্ঘকে স্নানবস্ত্র দান করিব।" লেখক এস্থানে, তাঁহার প্রদত্ত সংবাদের সহিত মূলের কতদূর প্রভেদ, লক্ষ্য করিবেন। ভিক্ষুণিগণ জীর্ণবসনের জন্য উপহসিত হইতেন না, তাঁহারা উপহসিত হইতেন তাঁহাদের উলঙ্গ হইয়া স্নান করার জন্য। বারবিলাসিনীগণ তাঁহাদের বসনদৈন্য নির্দ্দেশ করিয়া প্রলোভিত করিতেন না তাঁহারা প্রলোভিত করিতেন, "যৌবনের জন্য প্রব্রজ্যা নহে, তাহা বৃদ্ধকালের জন্য" এই সকল পাপ যুক্তির দ্বারা। এস্থলে বসনের কোনই উল্লেখ নাই। বিশাখা স্নান-বস্ত্রের বন্দোবস্ত যে কেন করিলেন, তাহা তিনিই উত্তম রূপে বুঝিয়াছিলেন। তৎকালে পুরুষ ও স্ত্রীলোক অনেকেই নগ্নাবস্থায় নদীতে স্নান করিত, এরূপ উল্লেখ আমরা বহুস্থলে পাইয়াছি; এবং তাহা অত্যন্ত দোষাবহ বলিয়া তৎকালে পরিগণিত হইত না। ঐ দিবসে বিশাখার গৃহে নিমন্ত্রণে যাইবার পূর্ব্বে ভিক্ষুগণ উলঙ্গ হইয়া তথাগতের উপদেশানুসারে বৃষ্টির জলে জেতবন বিহারে স্নান করিয়াছিলেন; এবং ঐ দিবসই শ্রেষ্ঠী-পত্নীর পরিচারিকা আহারের সংবাদ দান করিতে যাইয়া, তাঁহাদের উলঙ্গাবস্থায় দেখিয়া, আজীবক বা নগ্ন সন্ন্যাসী বোধে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশাখাকে ঐ ঘটনা বলিলে,

(১৪) On Yuan Chwang (Royal Asiatic Society Series). Vol. II, Ed. Thomas Watters, p. 69-70. London, 1905.

(১৫) Travels of Fâ-Hien, Ed. Legge, loc. cit.

(১৬) Buddhist Records, Ed. Beal, Vol. II, p. 68.

(১৭) Vinaya-Pitaka, Vol. I, Ch, Ch. VIII, Sec. 15 p. 293 Ed. Hermann Oldenberg, Berlin 1879.

তিনি সসঙ্ঘ ভগবান বুদ্ধের সন্নিকটে যাবজ্জীবন ভিক্ষুসঙ্ঘকে বর্ষায় স্নানের বস্ত্রদানে প্রতিশ্রুত হন। (১৮) ভিক্ষুণিগণ যে সময়ে-সময়ে নগ্না হইয়া স্নান করিতেন, এ সংবাদ আমরা "সুত্তবিভঙ্গে" প্রাপ্ত হইয়াছি (১৯) এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ কুৎসিত ব্যাপার সামাজিক হিসাবে তৎকালে প্রচলিত থাকিলেও, তাহা যে ভিক্ষুণি-সঙ্ঘের অবনতির কারণ হইবে, ইহা সাধ্বী বিশাখা বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। যাহাতে ঐ দোষটি সঙ্ঘ হইতে বর্জ্জিত হয়, তাহার উপায় চিন্তা করিয়া ঐ দিবসেই তথাগতের সন্নিকটে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণি-সঙ্ঘে স্নানবস্ত্র দানের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভগবান বিশাখার ঐ সঙ্কল্পের সমর্থন করিয়া, সেই দিবসেই জেতবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, বিশাখার প্রার্থিত বরগুলির সমর্থন করেন। তন্মধ্যে প্রথমটি ভিক্ষুদিগের বর্ষায় স্নানবস্ত্র দান এবং শেষটি ভিক্ষুণিগণের স্নানবস্ত্র দান। (২০) এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে যে, বিখ্যাত মৃগার শ্রেষ্ঠীর মাতৃস্থানে প্রতিষ্ঠিত পুত্রবধূ প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী বিশাখার মাহাত্ম্য কোথায়? তাঁহার মাহাত্ম্য এই যে, কতকগুলি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণিসঙ্ঘে প্রচলিত অভ্যাস, যাহা সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধও স্বয়ং দোষ বলিয়া চিন্তা করেন নাই, বিশাখা এক মুহূর্ত্তে তাহা যে সঙ্ঘের অবনতির কারণ ইহা বুঝিয়াছিলেন, এবং তাহার মূলোৎপাটনের জন্য যত্নবতী হইয়াছিলেন। শুচিচরিত্র পুণ্যবতী বিশাখা উত্তমরূপে বুঝিতেন, এবং বারাঙ্গনাগণের ঐরূপ যুক্তিতে ভিক্ষুণি সঙ্ঘে সে কিরূপ কুফল ফলিবে, তাহাও তিনি উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। এজন্য যথাসাধ্য যাহাতে ঐ কলঙ্ক-কীট ভিক্ষুণি-সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার লাভ না করিতে পারে, তজ্জন্য মহিমামণ্ডিত রমনী তথাগতের সন্নিকটে ঐ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

হিরণবাবু ঐ সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন, "বৈশালির রমণীয়" "পূর্ব্বারাম" উদ্যানটি এই মহিমামণ্ডিত রমণীর দানের অন্যতম নিদর্শন। "পূর্ব্বারাম" নামক বিহারটিকে তিনি কি কারণে উদ্যান বলিয়া স্থির করিলেন? উহা কখনও উদ্যান বলিয়া ত্রিপিটকে আখ্যাত হয় নাই, সর্ব্বত্র বিহার বলিয়া উল্লিখিত আছে। উহা সঙ্ঘের একটী সুন্দর বাসস্থান ছিল। যাহা হউক, আমরা আরও আশ্চর্য্য হইলাম যে, শ্রাবস্তির সুবিখ্যাত পূর্ব্বারাম বিহারটিকে তিনি বৈশালিতে প্রেরণ করিয়াছেন। সমগ্র "বিশাখা বথু" (২১) পাঠে কি লেখক স্থির করিলেন, যে উহা বৈশালিতে বিশাখা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? বা ত্রিপিটকের কোথাও তিনি ঐরূপ উল্লেখ দেখিয়াছেন? বিশাখাবথু র সর্ব্বপ্রথমেই "শ্রাবস্তির পূর্ব্বারাম"—ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। বুদ্ধ ঘোষের টীকা ব্যতীত, আমরা আচার্য্য ধর্ম্মপালের বিমানবথু অট্ট কথায় (২২) তথা মজ্ঝিম (২৩) এবং অঙ্গুত্তর (২৪) নিকায়ের স্থানে স্থানে "শ্রাবস্তির পূর্ব্বারাম" এই সংবাদই প্রাপ্ত হইয়াছি। "বৈশালির পূর্ব্বারাম" নামে কোনও বিহারের নাম ত্রিপিটকে বা তাহার টীকায় কখনও প্রাপ্ত হই নাই। যাঁহারা একটু-আধটু বৌদ্ধ-সাহিত্যের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই জানেন যে, শ্রাবস্তিনগরে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণি সঙ্ঘের দুইটি প্রধান বাসস্থান ছিল। একটী তৎকালের উত্তরভারত-প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য-শ্রেষ্ঠী অনাথ পিণ্ডিক বা সুদত্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত "জেতবন" এবং অপরটি মৃগার শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা বিশাখা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত রমণীয় "পূর্ব্বারাম বিহার"। লেখক পরলোকগত মনীষি Watters-এর মন্তব্যটি (২৫) একবার পাঠ করিবেন; এবং উহা ভারতের প্রাচীন বিবরণে যে কতদূর আবশ্যক তাহাও একবার চিন্তা করিবেন।

পরিশেষে বলিতে হইবে যে, লেখক যে শীর্ষকটি মনোনীত করিয়াছেন, তাহা এ প্রবন্ধে না ব্যবহার করাই সঙ্গত ছিল। শ্রমণী-সঙ্ঘ অর্থে পূর্ব্বোল্লিখিত ভিক্ষুণি-সঙ্ঘের বিবরণ বুঝায় না। সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় ইহার যাহাই অর্থ হউক না কেন, বৌদ্ধ সাহিত্যে উহার অর্থ আর একরূপ। শ্রমণ বা সমণ কাহাদের বলে, তাহা বোধ হয় লেখক উত্তমরূপে জানেন। তৎকালে উত্তরভারতে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল, এবং তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ও বিবরণ জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ও বর্ত্তমান ছিল। এজন্য ত্রিপিটকের বহুস্থানে "সমণ ব্রাহ্মণ" কথাটি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন, অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই তথায় "সমণ" নামে আখ্যাত হইয়াছেন। গৌতমবুদ্ধ ক্ষত্রিয়, সুতরাং তিনিও "সমণগোতম" নামে পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই "সক্যপুত্তসমণ" নামে তৎকালে পরিচিত হইয়াছিলেন। "সক্যপুত্তসমণ" অর্থে শাক্যপুত্রশ্রমণ বুঝায়। ভগবান বুদ্ধ শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহার প্রতিভাশালী শিষ্যবৃন্দ তৎকালে অন্যান্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত নামে আখ্যাত হইতেন। এইরূপ তৎকালে কতকগুলি নারী-ধর্ম্মসম্প্রদায়ও বর্ত্তমান ছিল; এবং তাহার যথেষ্ট প্রমাণ Dr. Rhys Davids কৃত

(১৮) Vinaya Pitaka-Mahavaggo Vol. I Ch VIII Sec. 15, p. 290-91.

(১৯) Sutta-Vibhanga (V. P.) II—Bhikkhunivibhanga, p. 259-60 ed. Hermann Oldenberg, Berlin 1882.

(২০) Mahavagga (V. P.) Vol I Ch. VIII, Sec. 15, p. 294.

(২১) Dhammapada Commentary, Vol. pt. II p. 384 ed. Norman Lordon 1909. P. T. S.

(২২) Dhammapalas Paramatthadipani (Vimana-Vatthu) p. 187-195, ed Prof. Hardy; London 1901.

(২৩) Majjhima Nikaya, Vol. I p. 251 ed. V. Trenckner, London 1888.

(২৪) Ariguttara Nikaya, Pt. III, p. 344-45 Ed. Hardy, 1895.

(২৫) On Yuone Chwang (Royal Asiatic Society) Ed. Thomas Watters, p. 399, Vol. I, London 1904.

Buddhist India নামক পুস্তকে (২৬) পাওয়া যায়। উহা ব্যতীত সুত্তবিভঙ্গের অন্তর্গত ভিক্খুণি-বিভঙ্গে আমরা দেখিতে পাই, চণ্ডকালী ভিক্খুণি বলিতেছেন "কিং নু'মা'ব সমনিয়ো যা সমনিয়ো সাক্যধিতরো সন্তি অঞ্ঞাপি সমনিয়ো লজ্জিনিয়ো কুক্কুচ্চিকা সিক্খাকামা—তাস' আহম সন্তিকে ব্রহ্মচরিয়ং চরিস্সামীতি" (২৭) পালিসাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তৎকৃত প্রতিমোক্ষে উহা এইরূপে অনুবাদ করিয়াছেন—"এই যে শাক্যকন্যারা শ্রমণা হইয়াছেন ইঁহারাই কি শ্রমণা? আরো লজ্জাবতী (পাপকার্য্যে) অনুতাপিনী ও শিক্ষাভিলাষিণী শ্রমণা আছেন; আমি তাঁহাদেরই নিকট ব্রহ্মচর্য্য করিব" (২৮)। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায় বর্ত্তমান থাকায় ভিক্ষুগণের ন্যায় ভিক্ষুণিগণও 'সক্যধিতরো' বা শাক্যদুহিতা উপাধিদ্বারা শ্রমণী সঙ্ঘ হইতে বিশিষ্ট ছিলেন।

প্রাতিমোক্ষ (২৯) সুত্তবিভঙ্গ, নিকায় ও জাতকসমূহের দ্বারা বৌদ্ধ-যুগের বহুপ্রকার শ্রমণী সঙ্ঘের অস্তিত্ব বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, লেখকের মনোনীত প্রবন্ধ-নামে আমরা কোন্ সম্প্রদায়টির বিবরণ বুঝিব? শ্রমণী সঙ্ঘ বলিতে সাধারণতঃ ভারতের স্ত্রী-ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত বুঝায়,—কেবলমাত্র ভিক্ষুণি সঙ্ঘের বিবরণ বুঝায় না। যে সকল অভিধার বহু প্রকার অর্থ হয় বা সর্ব্বসাধারণে ভ্রমে পতিত হয়েন, এরূপ শীর্ষক মনোনীত করা কোন লেখকেরই যুক্তিযুক্ত নহে। শ্রী—

(২৬) Buddhist India, p. 142, Ed. T. W. Rhys Davids, London 1911.

(২৭) Sutta-Vibhanga Vol II. (Vinaya Pitaka IV,) p. 235, Ed. H. Oldenberg, Berlin, 1882.

(২৮) Patimokkha Ed. Vidhusekhar Sastri (Bhikkhuni Patim), p. 295, Calcutta.

(২৯) Pratimoksha Sutra Ed. Minayeff, p 99, St. Petersburg 1869.

ভ্রান্তি ও মীমাংসা

[শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্-এ]

(১)

তখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব; বৌদ্ধ বিশ্ব-বিদ্যালয় নানা স্থানে স্থাপিত; বিদ্যাচর্চ্চা সর্ব্বত্র প্রচলিত। সে আজ প্রায় দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা।

বিম্বিবতীর রাজা বীরবিক্রম স্বয়ং বিশেষ বিদ্বান্ না হইলেও, একমাত্র কন্যা দেবলাকে তিনি যত্ন-সহকারে বিদ্যা-শিক্ষা দিয়াছেন।—তাঁহার ইচ্ছা, আভিজাত্য-গৌরবে প্রশংসিত কোন বংশে কন্যার বিবাহ দেন।

দেবলা শৈশবে মাতৃহীনা; জননীর স্মৃতি তাঁহার বিমাতা পর্য্যন্তই। বিমাতা অরুন্ধতী দেবীর সন্তান নাই; দেবলাকে তিনি অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছেন। অরুন্ধতীর চিন্তা,—দেবলার এত সৌন্দর্য্য, এত গুণ,—তাহাতে তাহার মঙ্গল হইলে হয়!—রাণীর ইচ্ছা, গুণবান্ পতির সহিত দেবলার পরিণয় হয়।

এ বিষয়ে দেবলার নিজের কোনরূপ ইচ্ছা আছে কি না, তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। যতদূর দেখা যাইত, তাহাতে পিতামাতার মতই দেবলার মত,—কিন্তু পিতা-মাতার মত তো একমুখী নয়।

(২)

দেবলা দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন।

পিতাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদি চিত্তবৃত্তির নিরোধই জীবের ধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট পথ হ'লো, তবে পার্থিব স্নেহ ও আকাঙ্ক্ষার মর্য্যাদা কি? যদি নির্ব্বাণ জীবের স্বাভাবিক সমাপ্তি, তবে কর্ম্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের মূল্য কি? 'মুক্তি' আর 'নির্ব্বাণে' সম্বন্ধ কি?"

সপ্তদশবর্ষীয়া কন্যার আধ্যাত্মিক প্রশ্নে—পিতা মস্তক কণ্ডূয়ন করিয়া বলিলেন,—"এ-সব কথা অপর একদিন বুঝিয়ে দেবো।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা প্রায়ই হইত ;—কিন্তু কখনই পিতার অঙ্গীকৃত সেই শুভদিন উপস্থিত হয় না ! পিতা কন্যা-স্নেহে মুগ্ধ হইয়া ভাবেন,—"মেয়েকে দার্শনিক তত্ত্ব শেখানো ভাল হচ্ছে কি না ?"

অরুন্ধতী দেবী গর্ব্বিত দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবেন, "এত সৌন্দর্য্য, এত গুণের মর্য্যাদা রক্ষা হ'লে হয় ।" কন্যার শিক্ষাবিধানে তাঁহারই সর্ব্বপ্রধান যত্ন ; তিনি নিজে বিদুষী রমণী ।

(৩)

শৈলদত্ত বিদ্যার্থী যুবক। দেখিতে সুন্দর, পাঠে নিবিষ্টচিত্ত ; বয়স বিংশ বৎসর ; দরিদ্র-সন্তান। সে রাজ-বাড়ীতে থাকিত,—রাজা ও রাণী তাহাকে স্নেহ করিতেন। বিম্বিবতী নগরে আসিবার পূর্ব্বে সে তালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিল। তাহার অধ্যয়ন-স্পৃহা বয়সের অতিরিক্ত ; জটিল দার্শনিক প্রশ্নের সে মীমাংসা করিতে পারিত না,—কিন্তু প্রশ্নের বিষয় অনুধাবন করিতে পারিত ; মীমাংসা-স্পৃহা তাহার প্রবল ।

সে-দিন দেবলা যখন পিতাকে প্রশ্ন করিতেছিলেন, তখন শৈলদত্ত নিকটে ছিল ; দেবলার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বদনের গৌরব-প্রভা তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা-স্পৃহা জাগাইয়া দিল ।

সন্ধ্যার পর শৈলদত্ত দেবলাকে বলিল,—"একজন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন ।"

"কে ?"

"অনন্তব্রত,—তালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ।"

"আমি তাঁকে জানি না ।"

"আমি জানি,—তাঁর কাছে কিছু-দিন দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রেছি। তিনি অগাধ পণ্ডিত,—বিদ্যাচর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ ক'রেছেন ।"

(৪)

একদিন তালন্দা প্রদেশে রাজা ও রাণী পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন ; দেবলা সঙ্গে ছিলেন ।

রাজা দেবলাকে লইয়া পদব্রজে একটী মন্দির দেখিতে গিয়াছেন ; শিবিকা-সন্নিকটে রাণী অরুন্ধতী ।

গৌরবর্ণ, দীপ্তমূর্ত্তি, নগ্নপদ, দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়স্ক অধ্যাপক অনন্তব্রত সেই পথে চলিয়াছেন । অরুন্ধতী দেবী তাঁহার দূর-সম্পর্কীয়া পিতৃস্বসা হইতেন ;—তাঁহাকে দেখিবামাত্র অনন্তব্রত সহাস্য বদনে আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন ।

রাণী বলিলেন,—"তুমি আর একটু কাল অপেক্ষা কর্লেই রাজার সঙ্গে তোমার পরিচয় ক'রে দিতে পারি ।"

বিনীত ভাবে, সহাস্য বদনে, অনন্তব্রত উত্তর করিলেন, "আজ আমি একটু কার্য্যে ব্যাপৃত আছি ; আমার সৌভাগ্য হ'লে আর এক দিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো ।"

"বেশ,—আমাদের বাড়ী একদিন এসো ।"

"আস্‌বো,—নিশ্চয় ; কিন্তু কবে, তা তো ঠিক বল্‌তে পাচ্ছিনে ; আচ্ছা,—দু'-মাস পর আস্‌বো ।"

"বেশ তো ; আজই দিন স্থির করা যাক ।"

তখন বৈশাখ মাস ; স্থির হইল, আষাঢ়ের শুক্লা-দ্বিতীয়ায় অনন্তব্রত রাজবাড়ী আসিবেন। তার পর অনন্তব্রত অরুন্ধতী দেবীর পদধূলি লইয়া চলিয়া গেলেন ।

রাজা ও দেবলা শিবিকার নিকটে ফিরিয়া আসিলে, রাণী এ প্রসঙ্গ তাঁহাদের নিকট জ্ঞাপন করিতে বিস্মৃতা হইলেন ।

(৫)

শৈলদত্ত আর পাঠে মনোযোগ দিতে পারে না ; দেবলার সঙ্গে বাক্যালাপ আর দেবলার বিষয়ে চিন্তা এখন তাহার অধ্যয়নের স্থান পূর্ণ করিয়াছে ।

দেবলা ভাবিতেন,—"আহা, প্রতিভাপূর্ণ, উন্নত-চরিত্র বালক ! তার দারিদ্র্য-ক্লেশ দূর হ'লে হয় ।"

শৈলদত্ত ভাবিত,—"এই দেবীমূর্ত্তি রমণী ; এঁর কাছে কত শিক্ষার জিনিষ আছে !" আবার ভাবিত,—"এঁকে যদি গৃহিণীরূপে পাই !" দেবলা কিন্তু তাহাকে ভ্রাতৃস্থানীয়ই মনে করিতেন,—ওরূপ চিন্তা শৈলদত্তের মনে যে কখনও উদয় হইতে পারে, তাহা তাঁহার কল্পনার অতীত ।

* * * *

একদিন শৈলদত্ত রাজাকে বলিয়া ফেলিল,—"আমি দেবলাকে বিবাহ কর্‌তে চাই ; যদি আপনার অনুমতি হয়—"

রাজা বলিলেন,—"কি ব'ল্‌ছিলে ? তুমি বাতুল হয়েছ। শীঘ্র যদি এ চিন্তা পরিত্যাগ না কর, তবে আমি তোমার

মস্তিষ্ক-সংশোধনের জন্য সুখোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রুন।"

শৈলদত্ত নিরুত্তর। তাহার মনে হইল,—তাহার দারিদ্র্য দূর হইলেই সে দেবলার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবে।

(৬)

পরদিন এই কথা অন্তঃপুরে প্রচারিত হইল।

দেবলা শৈলদত্তের আকাঙ্ক্ষার অনুমোদন করিলেন না: কিন্তু তাহার হৃদয়ের ব্যথা স্বয়ং অনুভব করিলেন;—অনুকম্পায় দেবলার হৃদয় ভরিয়া গেল।

শৈলদত্তের অনুসন্ধান করায় জানা গেল,—সে গত রাত্রিতেই রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেবলা ডাকিলেন,—"এস ভাই, ফিরে এস। কেন এমন চিন্তার হৃদয়ে স্থান দিলে?"

(৭)

ইতোমধ্যে একদিন তালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনন্তব্রত বিদ্বিবতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত আধ্যাত্মিক বিষয়ক প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা পাঠ করিলেন।

মূল প্রবন্ধের নাম,—"নির্ব্বাণ ও মুক্তি।" লেখকের নাম,—শ্রীদেবব্রত।

সমালোচনাংশে অনন্তব্রত পাঠ করিলেন,—

"দুই শ্রেণীর প্রবন্ধের সমালোচনা আবশ্যক; এক উৎকৃষ্ট, অপর অপকৃষ্ট। প্রবন্ধ নামতঃ চিত্তাকর্ষক হইলেই তাহাতে সহসা হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্তি হয়; বর্ত্তমান প্রবন্ধ নামতঃ চিত্তাকর্ষক,—কিন্তু ইহার চিত্তাকর্ষতা কেবল নামতঃই; বস্তুতঃ ইহা সারবত্তা বিহীন।

"আবার প্রবন্ধটী যদিও নামতঃ কোন পুরুষের রচিত, বাস্তবিক কিন্তু একটুকু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ইহা কোনও স্বল্প-বিদ্যায় বিদুষী বালিকার লিখিত।

"অধ্যাত্ম-তত্ত্বের মীমাংসায় ইহা ভ্রান্তিপূর্ণ। 'মায়া' এবং 'মুক্তি' বিষয়ক তত্ত্বের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া লেখিকা (কারণ তিনি লেখিকাই বটেন) কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীতা হইতে পারেন নাই।

"বালিকা দার্শনিক-তত্ত্ব মীমাংসায় প্রগল্‌ভতা না দেখাইয়া, যদি গৃহস্থালীর কার্য্যে মনোযোগ দিতেন, তবে তাহাতে পৃথিবীর অধিকতর উপকার হইতে পারিত।"

* * * *

এই সমালোচনার বিষয় রাজকুমারী দেবলা শুনিলেন।

মাতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া দেবলা বলিলেন, "মা, এই সমালোচক এমন ভুল বুঝ্‌লে কেন?" তার পর বলিলেন, "আমি কি বাস্তবিকই এই রকম প্রগল্‌ভা রমণী?"

স্নেহবিগলিত নেত্রে মাতা বলিলেন, "মা, তুমি ক্ষোভ ক'রো না। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা প্রায়ই গর্ব্বিত হন।" অরুন্ধতী দেবী জানিতেন না, এই সমালোচক অনন্তব্রত।

কন্যার এই নূতন ক্লেশ মাতা ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

(৮)

শৈলদত্ত তালন্দায় গিয়া অনন্তব্রতের পদধূলি গ্রহণ করিল; সে বলিল,—"আমি এক বালিকাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছায় তার পিতাকে এ বিষয় জানা'লে, তিনি আমাকে 'বাতুল' ব'লে বিদায় ক'রেছেন। আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন সেই বালিকার উপযুক্ত পাত্র হ'তে পারি।"

অনন্তব্রত বলিলেন, "বৎস, আমি সে বালিকাকে জানি না; তার বিষয় তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস্ ক'রতেও আমার ইচ্ছা নাই। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যেন তার উপযুক্ত পাত্র হ'য়ে ফিরে আস্‌তে পার।"

শৈলদত্ত আবার বলিল, "আমার দারিদ্র্যই আমার আকাঙ্ক্ষার প্রধান অন্তরায়।"

তখন অনন্তব্রত বলিলেন, "আমি তো ধন সন্ধানের বিষয়ে অনভিজ্ঞ; স্ত্রী-জাতিকেও আমি বুঝ্‌তে অক্ষম; তবে তোমার যেমন প্রতিভা ও অধ্যবসায়, তাতে নিশ্চয়ই তুমি দারিদ্র্যের অন্তরায় অপনোদন ক'রতে পারবে,—এ আমার বিশ্বাস।"

(৯)

আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়া।

অনন্তব্রত রাজবাড়ীতে আসিয়া অরুন্ধতী দেবীর পাদবন্দনা করিলেন। তিনি কয়েক দিন এখানে থাকিবেন।

দেবলা বিশেষ কিছু চিন্তা না করিয়াই অনন্তব্রতকে বলিলেন, "আপনি সে-দিন আমার প্রবন্ধের অন্যায়

সমালোচনা ক'রেছেন। অযথা তীব্রতা দ্বারা মানুষকে ক্লেশ দেওয়া অনুচিত কাজ।"

মৃদুহাস্যে অনন্তব্রত বলিলেন, "অবস্থাবিশেষে ক্লেশ দেওয়া ন্যায্য সমালোচকের কর্ত্তব্যের মধ্যে; তবে সেই কার্য্যানুযায়ী ক্লেশ যতটা কোমল ভাবে দেওয়া যায়, তাই উচিত। আমি জান্‌তেম না সেই প্রবন্ধ আপনার লেখা, আপনার কথায় তা' বুঝ্‌তে পেলেম; এবং আমি সন্তুষ্ট হ'য়েছি, আমার সমালোচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই।"

"আপনি আমার 'প্রগল্‌ভতার' অপবাদ দিয়ে অবিচার ক'রেছেন।"

"তা'তে আমি ব্যথিত হ'লেম; কিন্তু,—'প্রগল্‌ভতা' যখন বাস্তবিক, তখন তার উল্লেখ করায় 'অপবাদ' বা 'অবিচার' হ'য়েছে, তা' আমি স্বীকার করি না।"

"স্ত্রীজাতির পক্ষে কি দার্শনিক তত্ত্ব মীমাংসার চেষ্টা ক'র্‌তে নেই?"

"চেষ্টায় বিশেষ দোষ না থাক্‌তে পারে,—তবে আমি স্ত্রীজাতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ; আমার বিবেচনায় কিন্তু এরূপ চেষ্টায় পৃথিবীর কোনো হিতই সাধিত হয় না।"

দেবলা দেখিলেন, কি দৃঢ়তা ব্যঞ্জক অথচ সহাস্য, স্থির বাক্য! তাহার বোধ হইল, যেন অনন্তব্রতের কথায় কোনও গর্ব্ব নাই,—অথচ জ্ঞানের গভীরতা আছে।

সমালোচক দেবলার সহিত ধীর, সংযত বাক্য ব্যবহার করিলেও দেখা গেল তিনি তাঁহার নিজ অভিমতের এক বর্ণও প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত নন। অনন্তব্রতও একটী বালিকার নিকট এতদূর দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপক উক্তি আশা করেন নাই। উভয়ের মত-পার্থক্য থাকিলেও পরস্পর পরস্পরের স্পষ্ট বাক্যে আশ্চর্য্য হইলেন।

দেবলা অনুভব করিলেন, তিনি পরাজিতা।

* * * *

সেই রাত্রিতে দেবলা আবার মাতার ক্রোড়ে মুখ রাখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। স্থির করিলেন, এই জ্ঞানী মহাত্মার নিকট তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহার সহিত আর তর্ক করিবেন না।

হায়! বালক শৈলদত্ত অবাধে দেবলাকে 'শিক্ষয়িত্রীর' আসন দিয়াছিল। এ ব্যক্তি কিন্তু 'শিক্ষকের' মর্য্যাদা হইতে একপদও নিম্নে আসিবেন না!

(১০)

আজ তিন দিন অনন্তব্রত রাজবাড়ীতে আছেন।

দেবলা নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করেন তর্কের ক্ষমতা তাঁহার অপসৃত হইয়াছে।

সে-দিন "নির্ব্বাণ ও মুক্তি" সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে দেবলা শ্রোত্রী।

অনন্তব্রত বলিতেছেন, "পার্থিব স্নেহ ও পার্থিব আকাঙ্ক্ষা আমার বিবেচনায় নির্ব্বাণ-প্রার্থী জীবের আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করে, তাকে দরিদ্র করে না। সেই প্রবৃত্তির অস্তিত্বেই তার সম্পদ,—বাসনার অন্ধ অনুসরণে তার কোনও তৃপ্তি নাই। কর্ম্মের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সেই সম্পদের পরিমাপ জ্ঞাপন করে।"

তার পর আবার বলিলেন,—"যথাযথ 'কর্ম্ম' সাধনেই ইহলোক হ'তে জীবাত্মার মুক্তি; তখন 'মুক্ত' আত্মা স্বত্ব পরিত্যাগ ক'রে অনন্ত, অবিনশ্বর 'আত্ম'-সাগরে বিলীন হয়,—সেই তার 'নির্ব্বাণ' লাভ।"

আবার,—"মহাসাগরের এক বিন্দু জল তু'লে নিলে তা'তে সমুদ্র-সলিলের সকল ধর্ম্মই বিরাজিত দেখ্‌তে পাওয়া যাবে; তা'কে জগতের কার্য্যে ব্যবহার করা যেতে পারে,—সেই কার্য্যের অবসানেই জলবিন্দুর অবস্থা হ'তে তার 'মুক্তি'; তার পর মহাসমুদ্রে আবার যদি সে মিশিল, তবে তার 'নির্ব্বাণ' লাভ হ'ল। তখন আর তার কোনো পৃথক, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিল না।"

তার পর, "কিন্তু পার্থিব আকাঙ্ক্ষা বা স্নেহের অনুভূতি যে ব্যক্তির নাই, তার জীবাত্মার মর্য্যাদা তৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ। যদি ভগবান্‌ সিদ্ধার্থ-দেবের পার্থিব স্নেহ বা আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি না থাক্‌তো, তবে তাঁর মহানিষ্ক্রমণের এত বড় মাহাত্ম্য জগতে বিখ্যাত হ'তো না।"

আবার,—"সাধারণ মানবমাত্রেরই লৌকিক যশঃ-প্রয়াস স্বাভাবিক; কিন্তু যে ব্যক্তি পার্থিব সম্পদের প্রার্থনা দ্বারা জীবাত্মাকে ভারাক্রান্ত করে, কাম্য সম্পদ্‌ প্রায়ই তার নিকট হ'তে দূরে চ'লে যায়,—অথচ তার প্রার্থনার জ্ঞাপন দ্বারা সে ব্যক্তি স্বীয় লঘুত্বই প্রচারিত করে।"

* * * * *

দেবলার হৃদয় শ্রদ্ধায় নত হইল।

সমুদ্রের বিরাট গাম্ভীর্য্যের মধ্যে তটশ্রালিনী নদীর পূর্ব্ব শোভা-স্মৃতি বিলুপ্ত হইল।

এ-কি অদম্য আকর্ষণ বক্তার দিকে তাঁহার হৃদয়কে টানিয়া লইতেছে!

অনন্তব্রত বুঝিলেন, বালিকাও সামান্য নয়। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সমালোচনা স্মরণ করিয়া মনে মনে সঙ্কুচিত হইলেন।

(১১)

আরও প্রায় পাঁচবৎসর চলিয়া গিয়াছে। দেবলা আজও অবিবাহিতা।

তাঁহার পিতা উৎপলবতীর রাজপুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। অরুন্ধতী দেবীর ইচ্ছা ছিল, অনন্তব্রতের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়া। অনন্তব্রতের ইচ্ছা ছিল, শৈলদত্তের অনুসন্ধান করিয়া তাহার সহিত এই দেবীপ্রতিমার পরিণয় সাধন করেন।

দেবলার নিজের কি ইচ্ছা ছিল, তাহা কেহই জানিল না।

শৈলদত্ত এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি,—উৎপলবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি তথায় রাজ-অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন; তাঁহার দারিদ্র্য দূর হইয়াছে।

একদিন শৈলদত্ত আসিয়া অনন্তব্রতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন;—উভয়ে বিম্বিবতী নগরে গেলেন।

সেদিন রাজবাড়ীতে বিবাহ-উৎসব। উৎপলবতীর রাজপুত্রের সহিত দেবলার বিবাহ হইবে।

*　　*　　*　　*　　*

দেবলা মন্দিরমধ্যে বুদ্ধদেবের ধ্যানগত মূর্ত্তির পদ-প্রান্তে ধ্যানমগ্না। ধীর, কম্পিত স্বরে প্রার্থনা করিতেছেন,—

"ভগবন্, তোমার অনন্ত স্থিতির মধ্যে আমার সমস্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষা ও স্নেহ নিমজ্জিত হোক। তোমার বিশালত্বের নিকট পৃথিবীর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয়ই সমান! যে স্নেহ ও আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে জাগ্রত, তা' তোমার অস্তিত্বে লিপ্ত হ'লে তবে তো ন্যায্য অধিকারীর নিকট স্থির ভাবে উপনীত হবে,—সেই উপনীতিতেই যে তার পরিসমাপ্তি। পার্থিব প্রণালীতে পরিচালিত হ'লে, তা' ন্যায্য স্থানে উপস্থিত হবে না।"

ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া আবার বলিলেন,—"আমার স্নেহময় পিতা-মাতার ও আমার ভ্রাতৃতুল্য শৈলদত্তের মঙ্গল হোক! আর যাঁর স্থির, গম্ভীর মূর্ত্তি আজ আমার হৃদয়ে জাগিতেছে, যাঁর বাক্যধ্বনি আজ আমার ক্ষুদ্রত্বকে অসীমত্বের সন্ধানে অনুপ্রাণিত ক'রেছে,—তিনি আমার পার্থিব বাসনা, প্রয়াসের অতীত। তাঁকে আমি তোমার ওই অনন্ত অস্তিত্বে মিলিতে দেখিয়াছি। তোমার ভিতর 'তাঁকে',—এবং তাঁর ভিতর ও সর্ব্বত্র 'তোমাকে'—আমি প্রণাম করি।"

*　　*　　*　　*　　*

রাজা ও রাণী দেবলার অনুসন্ধান করিতে-করিতে আসিয়া মন্দিরমধ্যে তাঁহাকে ধ্যানরতা দেখিলেন; তাঁহার প্রার্থনা-বাক্য শুনিতে পাইলেন।

তার পর নিকটে গিয়া দেখিলেন, দেবলার প্রাণহীন দেহ বুদ্ধমূর্ত্তির পদতলে লুণ্ঠিত!

তখন বহিঃপ্রাঙ্গণে বিবাহের বাদ্য বাজিতেছিল।

(১২)

আরও পাঁচবৎসর অতীত হইয়াছে।

সেই মন্দির প্রাঙ্গণে এক মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে। সেখানে রাজা ও রাণী দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষার বিপুল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এক নবীন শ্রমণ তাঁহার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ সেই কার্য্যে ব্যয় করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন। আর এক প্রবীণ শ্রমণ সেই মঠে দার্শনিক তত্ত্বের অধ্যাপক। উভয়ে প্রতি সন্ধ্যায় এক প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করেন, -আর ভক্তি-অশ্রুতে প্রস্তরবেদী প্লাবিত করেন।

প্রবীণ শ্রমণ একদিন অশ্রু-বিগলিত নেত্রে তাঁহার নবীন সহকারীকে বলিলেন,—

"বৎস,—আমার ভ্রান্তির মীমাংসা হ'য়ে গিয়েছে। বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তির সহিতই এই দেবীমূর্ত্তি আমাদের নমস্যা!"

নব্যতন্ত্র ও হিন্দুমহিলা

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

গতানুগতিকের সকল সম্ভ্রম-দায় হইতে কে যেন আজ আমাকে মুক্তি দিয়াছে। অন্তরে আমার ভরিয়া উঠিল কি এ?—কোন্ বিশ্ব-বিমোহনের চিরকিশোর চরণ-স্খলিত নৃত্য-নূপুর-কাকলি হৃদয়-নিকুঞ্জ ভরিয়া দিল,—আমার অন্তরের গানে-গানে ঝঙ্কৃত করিল! নবীন অনুভূতিতেই আমি আজ অখণ্ড, সম্পূর্ণ, পরিতৃপ্ত! বাহিরের স্পর্শ ভিতরের স্বর্গ-সৃষ্টিকে ব্যর্থ করিবার নহে। মর্ত্ত্যে তাহা পরিদৃশ্যমান না হইলে, আমার স্বর্গে আমার মর্ত্ত্যে মেশামিশি না হইলে, এ ব্যাকুল আগ্রহ হৃদয়ে যেন চাপিয়া রাখা সাধ্যাতীত। অনন্তে লীন মুক্ত আত্মা ততদিনই অতৃপ্ত, আপনা হইতে মানবে অসংখ্য বন্ধনের জাল উর্ণনাভের মত সৃষ্টি করিতে থাকিবে। এ অনুভূতির উৎস-মূল আছেই। তথা হইতে সমগ্র মানবে আমায় একাকার, একযোগ। এ নিশ্চয়।

ঐ যে জগতের অন্তর্যামীর প্রেরণা অজ্ঞাতে হিন্দুর হৃদয়ে তলে-তলে নূতনের আহ্বান পৌছিয়া দিতেছে—ও যে সত্য। আমার চক্ষে প্রত্যক্ষ, সকলেরই চক্ষে হইবে। কিন্তু কি উৎকট প্রলয়ের সাজে তাহার আগমন! কি নির্দ্দয়, নিষ্পেষণ-তন্ত্রে তাহার প্রতিষ্ঠা! প্রথম দৃষ্টিতে যে দিন তাহা সম্মুখে পরিস্ফুট হইল, কি আন্তরিক আতঙ্কেই না শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম! তার পর ক্রমে-ক্রমে দেখিতে-দেখিতে হৃদয়বৃত্তি সমস্তই স্তম্ভিত, নিশ্চল হইয়া গিয়াছে। আজ যে বুঝিয়াছি, ঈশ্বরের বিচার-অবিচার নাই। সকলি ঈশ্বরের লীলা। অসাড়তার চরম প্রকাশ করিয়াছেন,—এদিকে কষা-প্রহারে চরমতা ফুটিয়া উঠিবেই ত!

আঁধারে-আঁধারে কতই না বৈচিত্র্য দেখিলাম। ঘটে-ঘটে রহস্যের কত বিভিন্ন মূর্ত্তিই না চোখে পড়িল! যে প্রকৃতি-গ্রন্থ, যে জীবন-গ্রন্থ খুলিয়া শিক্ষক শিখাইলেন, তাহার পত্রে-পত্রে লব্ধ-অভিজ্ঞতা স্মৃতির সম্মুখে জ্বল্‌জ্বল্ জ্বলিতেছে। অনর্থক সে সব স্মরণ করা। সবার মূল রহস্য এইটুকু বলিতে পারি—লীলা-রহস্যের এইটুকু মাত্র আভাষ দিতে পারি যে, সাড় জাগিলে তবে অসাড়তার উপলব্ধি মানবে আসে। স্নেহ-কর-স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গ যতক্ষণ না অভিষিক্ত করে, নির্দ্দয় কষা কেমন করিয়া কাহাকে বাজে,—ততক্ষণ তাহা অন্ধকার।

অসাড়তা জাতির সর্ব্বাঙ্গে। কষাও সর্ব্বাঙ্গে। ঘরে এই যে সংখ্যাহীন মর্ম্মন্তুদ ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে, তাহাদের অশ্রুগাথা শত-শত পরিবারে কত ভগ্ন-হৃদয় বীণার তারে থমকিয়া আছে,—সে বিষাদ-মলিন দুর্ভাগ্য-মসীমাখা জীবন-পত্রগুলি কি কোনও শিল্পীর রচনা নহে? বালকের অঙ্কিত অসংলগ্ন রেখা-সংলেপ মাত্র? অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, পরিণামহীন? যতদিন মধ্যে ছিলাম, কত কি ভাবিতাম। আজ না কি বিশ্ব-শৃঙ্খলার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি,—ইহার স্পষ্ট অর্থ-নির্দ্দেশ আজ আমার চোখে সুস্পষ্ট। বাহিরেও মানুষ হিসাবে অপরিণত, আমাদের সমষ্টিগত পশ্চাদ্বর্ত্তিতায়, ব্যষ্টি যখন দেশে-বিদেশে লাঞ্ছনা, অবমাননা, গ্লানি বহন করিতেছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে বৈষয়িক ব্যাপারের প্রতিযোগিতায় শিল্পে, বাণিজ্যে কি যেন নিহিত পাপের বোঝা আমাদের তুলনাহীন বিত্ত-সম্পদ, বুদ্ধি-সম্পদ, কিছুই বিকশিত হইতে দিতেছে না, সমস্তই চাপিয়া রাখিতেছে। ক্রয়-বিক্রয়ের হাটে আমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হইতেছে—প্রতিদান মরণের মুদ্রায় গণিয়া পাইতেছি। এই সমস্ত নিত্য দেখিতেছি। কষাঘাত সত্য, তাহা আর ভুলিতে পারিতেছি কই? সংশয় দিনে-দিনে এমন করিয়া নিশ্চয়ে দাঁড়াইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্যও সুস্পষ্ট।

এই সকল অপ্রত্যাশিত ঘটনা চমকের পর চমক দিয়া, আত্মোপলব্ধি পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ে বিকশিত করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চায়। অন্তর্যামীর প্রেরণা, নূতনের আহ্বান এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই। সমস্তের অন্তর্নিহিত অখণ্ড লক্ষ্য—হিন্দুর জাগরণ। আর সে হিন্দু কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানবিশেষ নহে, মনুষ্যত্বের কোনও খণ্ডও

নহে,—সে সমগ্র পরিপূর্ণ মানবের ভাবমূর্ত্তি। সে জগতের ভাবী পরিণতির আলেখ্য-চিত্র। *

এ প্রেরণা যে জাগরণের জন্ত, সে জাগরণ হয় ত এখনও আমাদের কল্পনাতীত। যে কল্পনা-মধ্যে এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রথম বিকাশ পরিণত হইয়াছিল, হয় তো তাহারই মধ্যে সে জাগরণ এখনও তুরীয় সত্তায় লীন। চিত্রিত আলেখ্যের মত সেই জন্তই সে এখনও মানব-কল্পনায় ফুটিয়া উঠে নাই। আভাষ ব্যক্তি-বিশেষে জাগিয়াছে মাত্র।

মানবের সমগ্রতা, পরিপূর্ণতা, বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যতখানি পরিস্ফুট হইবার, সে হইয়া গিয়াছে। এ স্তর-বিশেষে মানুষ যতটা গঠিত হইবার তাহা সম্পূর্ণ। বিচার-জ্ঞান আহরণ ও সংরক্ষণ দ্বারা জগৎকে যতটা ভরান যায়, ততটা সে এত দিনে সম্পন্ন করিল। এইবার নব-পর্য্যায়। এ পর্য্যায়ে মানুষের কোন অংশটাই আর নেপথ্যে থাকিবে না। সবটা প্রকাশ পাইয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে। মানুষ অখণ্ডতা লাভ করিবে। এবারকার মন্ত্র তাই প্রেম ও বিশ্বাস। এবারের কর্ম্ম সম্প্রসারণ ও সংগঠন। অদূর-ভবিষ্যতেই মানুষের জীবন-সংগ্রামের ছুটাছুটি, অতৃপ্তি, পার্থক্যের অবসান হইবে। জীবন লইয়া আর সংগ্রাম চলিবে না। জীবনযাত্রা কথাটাই সত্য হইবে। অনবরত চেষ্টা করিয়া আপনার জন্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকু রক্ষা করার পরিশ্রমে মানুষ সত্যই রুদ্ধশ্বাস। তাহার অহঙ্কারের ঘূর্ণিত মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়াছে। অমৃত তাহার দুরবস্থা দেখিয়াই কাতর হইয়া কোল পাতিয়া দিয়াছেন।

অমৃতের এই আহ্বান, অন্তর্যামীর এই প্রেরণা, সফল হইবেই। মানবের বিচ্ছিন্নতামুখী জীবন-স্রোত মহামিলনের এক লক্ষ্যে বিপরীত-মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইবেই। ঈশ্বর এ পরিণাম চাহিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষের চিরন্তন সুখে-দুঃখে, শত-শত উচ্চাত্মার তপস্যায় এ নির্দ্দিষ্ট। এই দেব ভূমিই মানবের দেব-জন্ম লাভের সূতিকাগার হইবে। এই ভূ-স্বর্গেই মানবাত্মার চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোক, কল্পনালোক হইতে অবতরণ করিয়া বাস্তবলোকে বিকশিত হইবে। জয়ে-পরাজয়ে আমরা প্রস্তুত হইয়াছি। ঔদার্য্যের সংকীর্ণতায় বিভিন্ন বিকাশে তাহারি জন্ত আমরা নিজেদের গড়িয়া আসিয়াছি। ভারতবর্ষের এই বিচিত্র ইতিহাস—তাহার এই বিপুল বিস্ময়কর আয়তন সমস্তই স্রষ্টার উদ্দেশ্যমূলক রচনা—ইহার মধ্যে বিপুল অর্থ প্রকাশিত হইবার আছে।

তাই তো এত একাগ্র আহ্বান তোমাদের। মানসিক জড়ত্বের কারাগার ভাঙিয়া বাহিরে এস নারী,—রমণী জননী হও। তুমি মা। সৃষ্টির নব-বীজকে রস-সেকে উদ্ভিন্ন নবাঙ্কুরে পরিণত করিবে তুমি। তোমারই তপঃসিদ্ধ মন্ত্রে ঐশী তেজোধারা ধূর্জ্জটী-জটা-কলাপ-উচ্ছ্বসিত পতিতপাবনী পুণ্যময়ীর মত নামিয়া বিশ্বের ভবিষ্য প্রকাশের জন্ত জীবনী-বেগ উল্লাসে থমকিয়া অপেক্ষা করিবে—সেই নবাবির্ভূত নবযুগের ঋষিদিগের আগমনের, যাঁহারা জাতির নব-জীবন-ধারা প্রবাহিত হইয়া বহিয়া যাইবার পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। ব্যষ্টি-হিসাবে উত্থিত হও, জাতি-হিসাবে গঠিত হও। বাহিরের প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন হয় তো না হইতে পারে। অন্তরের সমবেদনায় একে অন্যের সহিত স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া গিয়া মিলিত হইতে থাক। তোমরাও মানুষ হও—জাতির অঙ্গ বলিয়া নিজেদের বিবেচনা করিতে আরম্ভ কর। তোমাদের জীবন তোমাদের হউক। আদর্শে যাহারই অনুগামী হও, তুমি কাহারও আয়ত্তে নহ।

আর আদর্শ সেও ত,—সকলেরই, ভগবান, যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত। তাঁহার মধ্যে আপনাকে সমর্পিত করিতে, তাঁহার প্রেরণার চেতনায় আপনাকে জাগাইয়া রাখিতে—সে আবার কাহার আদেশ-মুখে আপনাকে সমর্পিত করিতে হইবে? কাহার প্রসন্নতার জন্ত মুখাপেক্ষার চেতনায় নূতন করিয়া আবার আপনাকে জাগাইয়া রাখিবার হস্ত-গঠিত শৃঙ্খলে আপনাকে বদ্ধ হইতে হইবে! কাহারও নহে। ভগবানের পূতস্পর্শে চিত্ত-কমল দলে-দলে বিকশিত হইয়া ভগবানময় হইয়া যাক। যে দেহ সে প্রাণ মন ধারণ করিবে, সে ত ভগবতী তনু,—মানুষের নিন্দা, মানুষের গ্লানি, মানুষের ঈর্ষ্যা, সন্দেহ তাহাকে স্পর্শ করিবার নহে। সে ভাগবত আদর্শে, ভাগবত ইচ্ছায় নূতন সৃষ্টিকে বিকশিত করিবার ব্রত মাথায় লইয়াছে। ভাগবত শ্রদ্ধা তাহার সম্ভ্রম। আপন অধিকার আপনি চিনিয়া সে যখন আত্মবিকাশে অগ্রসর হইবে, তখন তাহাকে রোখে কে?

হিন্দুস্থানীয় অন্তঃপুরে, মানব-প্রাণের সংস্কার-সংকীর্ণতায়, বাসনার আবিলতায়, দৈহিক অভাবে অক্ষমতায় সর্ব্বত্র

খণ্ড-খণ্ড হইয়া হিন্দুনারীর মহত্ব আজ চূর্ণীকৃত, ধূল্যবলুণ্ঠিত। সকল দিক হইতে ফিরিয়া আজ আহাকে পুনরায় আপন স্বরূপের মহান প্রতিমা পুনর্গঠিত করিতে হইবে। বাহির যতই বাধা দিক, তাহার ভিতর হইতে আত্মার অতৃপ্তি ক্রমাগতই তাহাকে এই গঠনে উত্তেজিত করিতেছে। তাহার প্রাণে ইহাই নূতনের আহ্বান। ইহাই অমৃতের প্রেরণা। যে অসাড় থাকিবে, কশা প্রহার তাহার পৃষ্ঠে অনিবার্য্য। কেরোসিনের বিষ-লিপ্ত অগ্নিশিখা এই কশারই একটা আঘাত। বিধবার দুঃখ, কন্যাদায়ের অপমান সমস্তই এই একই অন্তর্নিহিত বস্তুর বাহিরের অংশ। নারীত্বের বিজয়িনী মহিমায় নারীকে জাগিতে হইবেই। জাগো নারী! শত শত মিথ্যা ছলনার কুহকে সঙ্কীর্ণ জীবন-গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া দিন কাটাইও না। ওই শোন, বড় কাছে সাগরের কলগর্জ্জন! চল—চল, অনন্তে উধাও হইয়া চল।—জীবন-গণ্ডী অনন্ত ব্যাপিয়া অসীম মধ্যে এলাইয়া দেওয়া যায়।

তুমি কাম নও, ক্রোধ নও, লোভ নও, মায়াও নও। কোনও অমঙ্গলেরই কোনও কুণ্ঠা জাগাইবার বস্তুরই তুমি মূর্ত্তি-স্বরূপিণী নও। অখণ্ড চৈতন্য সাগরের তুমিও ত এক খণ্ড-প্রকাশ। হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ সরসতায় ইহলোকের সংস্রবটাকে লইয়া বৈরাগ্যের ভণ্ডামি করিতে জান না, বাহিরের প্রতিবাদের ইহাই ত তোমায় আঘাত করিবার স্থান? লজ্জা দূর কর নারী! প্রতিবাদে-প্রতিবাদে কথা-কাটাকাটি জীবন-সাধনার সিংহদ্বারের ঠেলাঠেলি মাত্র। সঙ্কল্প তোমার নির্দ্দেশক হউক। ভিতরে ঢুকিয়া পড়। তোমার —আজ আবার নূতনের অভিযান। ঐশী প্রেরণায়, ঐশী আহ্বানে, গতানুগতিকের অবশ, নিশ্চেষ্ট প্রাণ থাকিয়া-থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। পাষাণ-গহ্বরের সুপ্ত-নির্ঝর-ধারা সহসা একদিন সূর্য্যালোক-স্পর্শে ফুলিয়া গরজিয়া হুঙ্কারে ডাকিয়া ছল্ ছল্ কল্-কল্ বেগে ছুটিয়া বাহিরে আসিবেই। ইহার ব্যতিক্রম নাই।—একদিন এককে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। আত্মা আপনার ব্যষ্টি-মূর্ত্তি তাহার আলোক-সম্পাতে গড়িয়া লইল। পরদিন এককে রূপান্তরিত করিলেন। আপনার মত পরকে স্বীকার করিয়াই আত্মা সমষ্টি-মূর্ত্তির উপাদান রচিতে আরম্ভ করিল। স্বাধীনতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানবের হইল অন্তরের সত্য। উপাদান সম্পূর্ণ—তাই তাহারই আতিশয্যে পরিতৃপ্ত আত্মা নূতনের আবাহনে উদ্বুদ্ধ হইবেই।—আবার এক রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেছে—জগৎ ফিরিবেই। এবার সে অনাবশ্যক ব্যষ্টিকে সমষ্টির মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া, সমষ্টির অতীত যিনি, তাঁহার জন্যই সাধনা আরম্ভ করিবে। মনুষ্য-জাতি আর এক ধাপ উঠিবে।

নব-তন্ত্রের আকর্ষণে নারী নূতন হইবেই। "হিন্দু-মহিলা" এ নামটা কি এম্‌নি-একটা অলৌকিক আবরণ যে, তাহার প্রভাব অকাট্য! স্থল, জল, বায়ু, কালাকাল, কিছুরই প্রভাব তাহাকে অভিভূত করিবে না। যেম্‌নি তাহার কাণের কাছে তুমি "হিন্দু-মহিলা", এই সম্মোহন বাণী উচ্চারিত হইবে, অম্‌নি সে মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধ-বীর্য্য ভুজঙ্গের মত উদ্যত ফণা সংহরণ করিয়া নত মুখে, মৌন দীর্ঘশ্বাসে, আপনার সমস্ত বিদ্রোহকে দমন করিয়া ফেলিবে। তা' হয় না।—এমন করিয়া স্বভাবকে অ-স্বভাবে পরিণত করিলে সে বিষাইয়া উঠে,—উঠিতেছেও। তাই আজ ঘর এত অশান্তিপূর্ণ।

সমাজের এই দিকে একটা প্রকাণ্ড ত্রুটী রহিয়াছে। নূতনের স্বর্গ-সৃষ্টি ইহার চাপে ফুটিতে বিলম্ব হইবে। এই এখানেই আমি কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ভগবানের আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছি। মানুষের অবস্থা যখন স্বাভাবিক, তখন তাহাদের ত্রুটিগুলা প্রদর্শনেই সংশোধিত হয়। অস্বাভাবিক অবস্থায় তাহা হয় না, বরং বাড়িয়া যায়। আমার অন্তরে যে সুর ধ্বনিত হইয়া এমন উজানে বহিয়াছে, সেই সুর যদি ইহাদের কর্ণে তুলিতে পারি, ইহারাও আমার মত হইলেও হইতে পারে। ভালবাসার বাঁশি কোন্ রন্ধ্রে ভরিব, তবে সে ধ্বনি ফুকরিবে,—তাহারই প্রত্যক্ষ-বোধ আজ আমার তপস্যা! চারিদিকে ওই স্বার্থের অনলকুণ্ড—মোহের ধূমোদ্গীরণের আবর্জ্জনা-স্তূপ! তাহারই মধ্যে আজ আমি ধ্যানের আসন পাতিয়াছি। রুদ্ধশ্বাস হইলেও নিবৃত্ত হইব না। হে আমার ভগবান! শেষ পর্য্যন্ত আমায় রক্ষা করিও! হৃদয় তোমার আপনারই। তাহার চাহিবার অধিকার আছে, ক্ষমতাও আছে। আপনাকে প্রকাশ করা সকলের মত তাহার চিরন্তন অধিকার, বাঁধিয়া রাখা দাসত্ব মাত্র। কাহারও চাওয়ায় নির্ব্বিচারে ধরা দিয়া বসিয়া থাকা সক-

লেরই মত তাহারও বেলায় হতবুদ্ধিতা। এখানে সে প্রবঞ্চিত,—তা' সে প্রবঞ্চনা যত বড় নামের মুখস্ পরিয়া আসুক। শুধু এক কথা, আপন ভার আপন হস্তে লইবার পূর্ব্বে আপনাকে ভাগবতময় করিতে হইবে। চলিত কথায় মনুষ্যত্বের আদালতে আপনার সাবালকতা প্রমাণ করিয়া লইতে হইবে।

আজই না-হয় হিন্দুর মনীষা লক্ষ্যহীন। আজই না-হয় ভারতের অদৃষ্টাকাশ-প্রান্ত ঝটিকার আসন্ন-সূচনায় মৌন ইঙ্গিতে নিস্তব্ধ হইয়াছে;—চারিদিক শান্ত, স্থির। দিন পরিবর্ত্তনশীল। অতীতের স্মৃতি যখন এত জীবন্ত, ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার মানস-দর্পণ-উদ্ভাসিত এই চিত্রগুলি ব্যর্থ, সে কি সত্য? স্বপ্ন পর্য্যন্তও ত অনর্থক নহে। অতীত মুছিবার নয়, অতএব ভবিষ্যৎ জাগিবার নয়, অসংশয়ে এ কথা মানিতে পারিলাম না। দিনের পর দিন আসিয়াছে দেখিয়াছি। পরস্পর তাহাদের কত বৈচিত্র্য!—আসিবেও দেখিব। শুধু দেখিব না, মনের আ-প্রান্ত ছাপাইয়া যে ঈষণা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই সার্থকতা? তবে এ কি? তবে আমি কি? বিশ্বের সব সত্য, কেবল আমি আর আমার আজগুবি খেয়াল, এই দুইটিই মিথ্যা? অথচ, উভয়ই জ্বল্-জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে! বেশ। কাহার অভিধান উল্‌টিয়া যায়, জীবন-অন্তে বিচার করা যাইবে। জীবন প্রকাশ করা আমার সত্য, নূতন আমার তন্ত্র। জীবন চাপিয়া রাখা কাহারও সত্য থাকে, সে করুক আমার সহিত যুদ্ধ-ঘোষণা—চলুক যুদ্ধ। জগৎ যা হইয়াছে, তাহা কোন্ দিব্য ঈষণার প্রকাশে, কোন্ সত্যের কতখানি আলোক-সম্পাতে কেমন করিয়া দিনে-দিনে প্রস্ফুটিত, সে ক্রম-বিকাশ অতীতের সহস্র যুগেও যখন হারাইয়া যায় নাই, ভবিষ্যতে কোন্ ঈষণার বৈচিত্র্য-প্রতিঘাতের মধ্যে সত্যের আলোকধারা কোন্ রশ্মি-শিখায় বিচ্ছুরিত হইবে, সে-ও হারাইয়া থাকিবার নয়! সংঘাতে, সংগ্রামে, মিথ্যার বিরাট পরিবেষ্টনের গ্রন্থি, কোন্ প্রণালীতে উন্মোচিত হইতে থাকিবে, সে রহস্য অখণ্ড চৈতন্য-সাগরের যোগে নিশ্চয়ই নূতনের সৈনিক করগত করিবে। তপস্যার অধিকার কোন যুগেই মানবের সঙ্কুচিত হইবার নয়। তপোবলে অজ্ঞাতের সকল বার্ত্তাই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। নূতনের তপস্যাপরায়ণ অবিচল সঙ্কল্পশক্তি তাহা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। জয় তাহারই করতলগত।

"নূতন" এই শব্দমাত্রে শিহরিব কেন? ইহার আহ্বান বিশ্বের কাছে অপরিচিত নহে ত। পুরাতনের বিপরীত অর্থের ইহা দ্যোতনা করিতেছে বলিয়া অস্বাভাবিক ইহার মধ্যে কি দেখিলে?—বরং বিশ্বরাজের সভায় নূতনের সঙ্গীত জমে ভাল। বহুবার নূতন বহু রূপে আসিয়াছে, আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া আপনিই আবার পুরাতনে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহাদের যাওয়া-আসা পরম্পরা-সম্বন্ধ-বদ্ধ। একের পশ্চাতে অপরে আছেই,—আসিবেই। কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ নাই। বিরোধ যা-কিছু সত্যে ও মিথ্যায়, নূতনে ও পুরাতনে নহে।

ভারতে দিব্য-অনুভবের প্রথম বিকাশ যে-দিন মানব-কণ্ঠে প্রথম ঝঙ্কৃত হইল, আত্মার জাগরণ হইল। মানুষ জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে আপনার রহস্যময় অন্তঃপুরে যে 'এক' আছেন, তাঁহারই বন্দনা-মুখর মণ্ডলী গড়িয়া আপনাদের হিন্দুত্বের সৃষ্টি করিতে বসিল, সে-দিন, সেই জাতির গঠনের দিনে, দেখগে গিয়া বেদের সূক্তে সূক্তে, 'ব্রাহ্মণের' পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায়, সর্ব্বত্রই সমবেত কণ্ঠধ্বনি! পুরুষের সহিত নারীর চেষ্টা! কেহ পিছাইয়া নহে, কেহ আগাইয়া নহে। সেখানে অত্রি আছে, বিশ্ববারাও আছে, কশ্যপ আছেন, ইন্দ্রমাতৃগণও আছেন। অপালা, লোপামুদ্রা, অদিতি, যমী, দশাশ্বতী, কত নাম করিব? অরণ্যের শান্তি শ্রী-সম্পন্ন পর্ণকুটীর-প্রাঙ্গণে যে হোমানল প্রজ্বলিত হইত, তাহাতে ঘৃতাহুতি শুধু কেবল ঋষিগণ দিতেন, তাহা নহে, তাঁহাদের জায়া-কন্যা-ভগিনীরাও সে কার্য্যে সমাবৃতা হইতেন; বেদের কলেবর পুষ্টির জন্য তাঁহারাও মন্ত্রের পর মন্ত্র রচনা করিয়াছেন।

এখনও মানব-প্রাণের চিরন্তন প্রার্থনা রূপে মৈত্রেয়ীর রমণীকণ্ঠের রমণীয় বাণীই শান্তি বহন করিয়া আমাদের গৃহে ধ্বনিত হইতেছে—"অসতো-মা-সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়। আবিরাবীর্ম্মএধি, রুদ্র যাত্ত দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

তার পর বৌদ্ধযুগের প্রথম উন্মেষ-কাল। একের সন্ধানে উধাও ব্রাহ্মণের উপেক্ষায় ক্ষুব্ধ নরের অন্তর-পুরুষ ভেদ করিয়া নারায়ণের সেই অমিতাভ বুদ্ধরূপে সৃষ্টির বুকে

সাগরের কলগর্জ্জনে নূতনের প্লাবন তুলিবার দিন। সে দিন বুদ্ধের নির্ব্বাণের গোপন দিনে অন্তর-সাধনার পশ্চাতে নারীর পশ্চাদ্বর্ত্তিতা আছে স্বীকার করি; সে দিন পরিত্যক্তা বধূরূপে, ভগ্নপ্রাণা জননীরূপে, অশ্রুমোচনে, হারাইবার, ছাড়িবার ব্যথায় সে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে তো নারীত্ব নহে। সে দুঃখে, সে বিষাদে যেটা চূর্ণ হইয়াছিল, সেটা নারী-নরের সম্পর্ক। পরক্ষণেই দেখিতে পাই, তরুণ শাক্যসিংহ সে দিন আর সাধক নহেন, —[illegible] প্রচারের দিন আসিয়াছে। সাধনা আর অন্তরের নহে, তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে হইবে। তিনি নর-নারী সকলকেই ডাকিয়া আপনার চারি-দিকে সমবেত করিয়াছেন।—সে-দিন, ভিক্ষুণী সঙ্ঘে তাঁহার মাতা আসিয়াছেন, বণিতা আসিয়াছেন, জীবন-লব্ধ তপস্যার ফল সকলেরই হাত দিয়া তিনি জগৎকে বিলাইতে উদ্যত। নারী ঘরের কোণে থাকিবে, পুরুষ বাহির লইবে।—পুরুষ মানাইবে, নারী মানিবে, সে সম্পর্ক সহসা অন্তর্হিত হইয়া জীবন এক উদ্দেশ্যে বিকশিত হইতে লাগিল—জগৎব্যাপী নির্ম্মমতার মহানল নির্ব্বাণ কর—নির্ব্বাণ কর।

এই নির্ব্বাণের অভিযানে অমৃত-পরিপূর্ণ হৃদয় উজাড় করিতে যাঁহারা ছুটিলেন, সে দলে অনন্যসঙ্কল্প-পরায়ণা ব্রত-ধারিণীরূপে ছিল-না-কি সুমেধা,—রাজকন্যা? শুভা,—চর্ম্মকার-কন্যা? অম্বপালী,—বারাঙ্গনা? পূর্ব্বের জীবন নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া, এই মঙ্গল-প্রবাহে প্রাণটাকে প্রস্রবণ-ধারার ন্যায় উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিবার একই সাধনার সম-সিদ্ধিতে সকলেই সহযোগিনীরূপে সমান হইয়া গিয়াছিলেন।

নিষ্কৃতি

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেশে সেবার বিষম অজন্মা, কারণ জল-দেবতার অনুগ্রহ সে বৎসর একেবারেই হয় নাই বলিলেই হয়। 'বিধাতার মার, দুনিয়ার বা'র'—কাযেই দুনিয়ার মনুষ্য-জাতীয় জীব যাহারা, এক ঘা' মার খাইলে দশ ঘা' দিবার জন্য প্রাণপণ পর্য্যন্ত করিয়া থাকে, তাহারাও—অম্লানবদনে ঠিক নয়,—সেই অদৃশ্য মার' বাধ্য হইয়া সহ্য করিল। প্রথমে আশা করিল; আশা ফুরাইতেই প্রার্থনা, স্তব, কাকুতি, মিনতি, অনুযোগ, অভিযোগ, বাটিপোতা, প্রভৃতি নানারূপ ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিল; তাহাও যখন উক্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব বিধাতা-পুরুষ শুনিলেন না, তখন বলহীন নিরুপায়ের ব্রহ্মাস্ত্র নানাবিধ অশাস্ত্রীয় এবং অহিন্দুর ভাষায় তাঁহাকে দিনরাত্রি বিশেষিত করিতে লাগিল। কিন্তু সে ব্যক্তি এমনই পাষাণ এবং আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানহীন যে, তবুও কোন উচ্য-বাচ্য পর্য্যন্ত করিলেন না। অন্যান্য লোকে ক্ষেতের ভরসা পরিত্যাগ করিল। ধানগাছগুলি এক হাত পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করিয়া, যকৃৎ-দুষ্ট রোগীর মত পীতবর্ণ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তার পর ক্ষেতের মত সকলে ধর্ম্মঘট করিয়া একদিন শুইয়া পড়িল, আর উঠিল না।

মানুষের অন্ন যেমন ফলিল না, গরু-বাছুরের খাদ্যও সেইরূপ হইল না। মাঠ উষর, প্রান্তর বিস্তীর্ণ, রক্ত-পীত-ধূসর-বর্ণ; কোথাও হরিতের লেপ পর্য্যন্ত নাই। যত-দূর দৃষ্টি চলে, তত-দূর পর্য্যন্ত ধূ-ধূ মরুর মত।

ভাদ্র মাসের প্রারম্ভেই দেবতার দয়া গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল—নানা আকারে;—যথা, কলেরা, বসন্ত, জ্বর প্রভৃতি। ডাক্তার বাবুরা রোগী পান, কিন্তু পয়সা নাই। তাঁহারা পেটেণ্ট ঔষধ-সৃষ্টিতে লাগিয়া গেলেন। উকিল মহাশয়েরা গালে হাত দিয়া বাসায় কেবল তামাক খান, এবং আদালতে গিয়া বার-লাইব্রেরীতে বসিয়া দেশের দুর্দ্দশার কথা আলোচনা করেন; কেহ-কেহ বা এই সময়ে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখিতে মনঃসন্নিবেশ করিলেন; যেহেতু

ওকালতী ব্যর্থ হইলেও, ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস বৃথা যাইবে না। সকলেই এইরূপে অর্থোপার্জ্জনে যখন চিরাচরিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, নব-নব সদুপায় অবলম্বন করিলেন, শ্রীমান্ দাশরথি দাস ওরফে দেশো মালোও তখন একটা সুরাহা দেখিতে পাইল।

এই সময়, অর্থাৎ এমন দুর্দ্দিনে, যখন ডাক্তার-উকিল পর্য্যন্ত বিশেষ চিন্তিত,—এক সম্প্রদায়ের কিন্তু এ একটা ভারি মরশুম্। সে সম্প্রদায় চা-বাগিচার জন্য কুলি-সংগ্রাহক আড়কাঠি-কুল। সমস্ত নামটা তাহার কেহই জানিত না,—শুধু পাঁড়েজী নামক একজন আড়কাঠি একদা মাঝডাঙ্গা গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন; এবং বিন্দি তেলিনীর বহির্কক্ষে, যেখানে শ্রীক্ষেত্রের পাণ্ডারা, ব্রজবাসীরা, কাশীর শিবদূতগণ, গয়ার স্বনামখ্যাত অসুরবরের অনুচরবৃন্দ আড্ডা করিয়া থকেন, সেইখানে নিবাস আরম্ভ করিলেন। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, মাঝডাঙ্গার বিন্দি তেলিনীর কক্ষটিই এ গ্রামে উক্ত প্রকার ভ্রমণকারীদের ডাকবাংলো অথবা গ্রাণ্ড-হোটেল রূপে বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কাযেই, সেখানে কোন নূতন লোককে অবস্থান করিতে দেখিলেই, লোকের মনে তৎক্ষণাৎ কৌতূহল হইত লোকটিকে জানিবার জন্য। কারণও তাহার ছিল নিতান্ত মন্দ নয়,—বস্তুতান্ত্রিক। পাণ্ডা আসিলেই লোকের চুয়া ও কর্পূরের মালা, ব্রজবাসীদের দান নামাবলী, শিব-দূতগণের দ্বারা কাশীর পেয়ারা, কাঠের খেল্‌না এবং গয়ালীদের দ্বারা প্যারা-নামক অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন-প্রাপ্তি হইত। এতদ্দ্বারা তৎপুরুষের আগমন-বার্ত্তা গ্রামময় যেরূপ শীঘ্র এবং যেরূপ প্রীতির সহিত বিঘোষিত হইত, তেমন বোধ হয় "অমৃতবাজার" বা "ষ্টেটসম্যানে" পূর্ণপৃষ্ঠা সচিত্র বিজ্ঞাপন অথবা ব্যাণ্ড বাজাইয়া নির্ব্বিচারে অজস্র হ্যাণ্ডবিল বিলি করাইলেও হইত কি না সন্দেহ।

দাশু দেখিল, খোট্টা,—সুতরাং নিশ্চয়ই সে এক জন পাণ্ডা। সে গেল। কয়েক ছিলিম তামাক খাইল; দুই ছিলিম 'বড়-তামাক'ও পাঁড়েজীর প্রসাদ পাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিল—মনটা একটু প্রফুল্ল এবং সচেতন।

দাশুর সংসারে তাহার জননী, একটী কন্যা এবং পত্নী। সে ছাড়া আর সকলেই জ্বরে শয্যাগত। দাশুর বয়স ত্রিশ, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ দেহ। তাহার চারি বিঘা রাজ-প্রদত্ত ক্ষেত আছে; তাহার জন্য জমিদারের যখনি মাছের প্রয়োজন হয়, দাশু গিয়া জাল ফেলে এবং মৎস্য সরবরাহ করে। বাদ-বাকী দিন সে চাষ করে, মাছ ধরে,—মা ও স্ত্রী বাজারে বিক্রয় করে। কন্যা দত্তদের বাড়ী গোয়াল সাফ করে এবং গোবর দেয়,—তৎপরিবর্ত্তে দুইবেলা খাইতে পায় এবং মাসিক চারি আনা বেতন পায়। মেয়ের নাম মুক্তো, অর্থাৎ মুক্তকেশী। বয়স আট বৎসর।

দাশু বাড়ী আসিয়াই, ঘরে ঢুকিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, কেমন আচিস্, আজ আর জ্বর এসেচে? আর ওরাই বা কেমন?"

মা পুত্রের হঠাৎ ঈদৃশ মাতৃ-ভক্তিতে মনে-মনে প্রীত হইয়া, পুত্রের আরও একটু ভক্তি ভোগ করিবার জন্য অনুনাসিক স্বরে কহিল,—"আজ আর আমাদের কেরুরই জ্বর আসে নেই, বাবা। এখন কবে সেরে উঠবো, তাই ভাবচি।"

"হাঁ, শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরেই ওঠ। পেট চলা চাই ত?" তাড়াতাড়ি কথা কয়টি বলিয়াই সম্প্রতি-শ্রুত মতি-রায়ের যাত্রার "দাদা অভি, যদি যাবি" গানটি গুন্-গুন্ করিয়া নাকি-সুরে গাহিতে-গাহিতে বড়ঘরের দাওয়ার কোণে বসিয়া হর্‌ফিটি টানিয়া তামাক খাইবার জন্য চকমকি ঠুকিতে লাগিল।

পাঁড়েজীর নিকটে দুই-তিন দিন ঘন-ঘন গতিবিধি করিতে-করিতে, একদিন দাশু কুড়িটি টাকা আনিয়া জননীর হস্তে দিয়া বলিল যে, সে কলিকাতায় চাক্‌রী করিতে চলিল। পাঁড়েজীর জনৈক অত্যন্ত নিকট আত্মীয়,—কারণ, সম্বন্ধটা যে কি, তাহা সে সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই,—কলিকাতায় থাকেন; তিনি এখন এই কুড়ি টাকা পাঠাইয়াছেন, তার পর সেখানে গেলে আরও দিবেন। কাজও এমন-কিছু শক্ত নয়,—বাগানের মালীগিরি।

দাশু কথা কয়টি এমন সহজ ভাবে এবং পুলকিত ও উৎসাহিত হইয়া বলিল যে, তাহাতে কাহারও কোন দুঃখ হইল না; বিশেষতঃ যখন বৃক্ষে না আরোহণ করিতেই এক কাঁদি সুপরিপক্ব কদলী লাভ হইল, তখন, এ যে একটা অপরিহার্য্য দাঁও, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। সারারাত্রি স্ত্রী, জননী ও নিজে পরামর্শ আঁটিল,—সংসারের কার্য্য কে কি করিবে, এবং ভদ্রাসনখানির কি প্রকার পরিবর্ত্তন ভবিষ্যতে আবশ্যক হইবে; কন্যার বিবাহ

দেশে অপেক্ষা কলিকাতাতেই হওয়া শ্রেয়ঃ—প্রভৃতি। আবার অজ্ঞাত কাল্পনিক কলিকাতাবাসী সেই বাবুর বাগান যখন আছে, তখন তাঁহার পুষ্করিণী যে গোটা-দশেক নিশ্চয়ই আছে, সে বিষয়ে এক-রকম সিদ্ধান্ত হইয়াই গেল। কেবল তৎবাসী মৎস্যগুলির ঠিকা লওয়াটিই আপাততঃ কেবল বাকী রহিল। শেষোক্ত সৌভাগ্য যদি কখনও ঘটে, তবে সকলকেই যে কলিকাতা যাইতে হইবে, ইহাও এক প্রকার স্থির হইয়া গেল; কিন্তু ইহাতে বুড়ী কেবল একটু নিমরাজি হইল মাত্র।

পর দিন দাশু লাল ডুরে একখানি গামছা কিনিল। মাতার, স্ত্রীর এবং কন্যার এক-এক জোড়া কাপড় কিনিয়া দিল, কারণ পূজা সন্নিকট। নিজের আর কাপড় কিনিল না,—কারণ, বাবুর বাড়ীতে পূজায় তার তো মিলিবেই—কারণ বাবু যখন এত-বড় লোক।

বাড়ী-শুদ্ধ সকলেরই ইচ্ছা যে, পূজার পর দাশু যায়। দাশুরও তাহাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পাঁড়েজী বলিয়াছেন যে, বিলম্বে কার্য্যহানি সুনিশ্চিত। অতএব, এ দুর্দ্দিনে এমন সুযোগ ছাড়া নিছক্ বাতুলতা ব্যতীত আর কি?

গায়ে বখ্‌শিশপ্রাপ্ত ডবল্-ব্রেষ্ট ছেঁড়া এক সার্ট, পরণে আটহাত একখানা কাপড় ও কোমরে নূতন লাল গামছা বাঁধিয়া, দুঃস্থ পরিবারের দুঃখমোচন করিতে দাশু পাঁড়েজীর সঙ্গে কলিকাতা রওনা হইল।

দাশরথির অকস্মাৎ অর্থলাভ, চাকরিলাভ এবং কলিকাতা-গমন-ব্যাপার এত দিন গ্রামের লোকের কাছে গোপন ছিল; যেহেতু পাঁড়েজী নিষেধ করিয়াছিল। পরশ্রীকাতর মন্দলোকের ত অভাব নাই? হয়তো তাহারা দাশরথিকে বাধা দিবে। তাহার একান্ত হিতৈষী পাঁড়েজী নিতান্ত অনুগ্রহ করিয়া তাহার যে সৌভাগ্যের সূচনা করিয়া দিল, গ্রামের পাঁচজনে শুনিলে হয়ত তাহা হইতে দিত না। কিম্বা আরও দশ জনে উপর-পড়া, রবাহুত হইয়া জুটিয়া সমস্ত পণ্ড করিয়া দিত। দাশুর মা পাঁড়েজীর কল্যাণের জন্য নিয়ত কামনা করিতে লাগিল। তাহার বড় দুঃখ রহিয়া গেল, একটা ভাল মাছ একদিন এমন মহানুভব মহাপুরুষকে তাহার দেওয়ার ভাগ্য হইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আজ চারি বৎসর হইয়া গেল, দাশু জলপাইগুড়ি জেলার একটী চা-বাগানের কুলি। বর্দ্ধমান জেলার পল্লীগ্রামের চাষারা নির্ব্বুদ্ধিতায় নিখিল-ভারতবর্ষীয় পল্লীবাসীদের মধ্যে অদ্বিতীয়; তাই প্রথমে দাশু কিছুই বুঝিতে পারে নাই। এবং পাঁড়েজীর মত সদ্‌ব্রাহ্মণ,—যিনি বঙ্গদেশীয় নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণেরও অন্ন গ্রহণ করেন না পাছে জাতিনষ্ট হয়,—তিনি যে, এরূপ প্রবঞ্চনা করিবেন, অথবা অসত্য কথা বলিবেন, ইহা মালো-নন্দনের মস্তকে প্রথমে ঢুকিতেই চাহে নাই। কিন্তু এই বাগানে অষ্টাহকাল বাস করিতে-করিতেই, সহস্রাধিক সমদশাপন্ন সহযোগীদিগের কথায় জানিতে পারিল যে, পাঁড়েজী ও তাঁহার অসম্বন্ধীয় আত্মীয়গণ এইরূপ জাল ফেলিয়া নিয়তই মনুষ্য ধরিয়া বেড়ান। সকলেই আপন আপন বুদ্ধিহীনতায় এবং দুর্ভাগ্যে শিরে করাঘাত করে, কাঁদে এবং কাষ করে।

কষ্টটা যে কি তাহা বুঝিতে, অন্যান্য সকলের মত দাশরথিরও কিছুদিন বিলম্ব হইল। যখন অবস্থার সম্যক উপলব্ধি ঘটিল, তখন সে চক্ষে অন্ধকার দেখিল; এবং পাঁড়েজীর উপর তাহার প্রীতিটা যত মধুময় ছিল, তত বিষতিক্ত হইয়া উঠিল। সময়ে-সময়ে তাহার মনে হইত যে, যে তাহাকে তাহার নিভৃত পল্লীকুটীর হইতে, স্নেহ-পরিপূর্ণ সুখনীড় হইতে মিথ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়া, তাহার আজন্ম-পরিচিত সুখ সান্ত্বনার স্নিগ্ধ আবেষ্টন হইতে ছিনাইয়া, তাহার শতসহস্র দুঃখ-দারিদ্র্যের সমুদ্রমন্থন-সঞ্জাত একান্ত বাঞ্ছিত প্রীতির এবং আদরের পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে, তাহাকে নিকটে পাইলে দ্বিখণ্ডিত করিয়া, ফাঁসি যায় কিম্বা দ্বীপান্তরিত হয়, সেও ভাল—তবু বাগানের কুলিগিরি তাহার অসহ্য। কিন্তু উপায় নাই। দাশরথি নিরুপায়, নিষ্ফল আক্রোশে আপনিই গর্জ্জিয়া উঠে; আবার পাঁচজনকে দেখিয়া, সর্দ্দারের রক্তচক্ষুতে ভীত হইয়া ভুলে। পলাইবারও উপায় নাই,—উপায় থাকিলে, আবার হাতে পয়সা হয় না।

দাশু উপার্জ্জন যাহা করে, গ্রহবৈগুণ্যে ব্যয় তদপেক্ষা প্রায়ই বেশী হইয়া যায়। কাজ করিতে-করিতে যদি কখনও সর্দ্দার তাহাকে একটু বসিয়া থাকিতে দেখে, অমনি তাহার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়,—সেদিনের মজুরী কাটা গেল। কাযেই মা শীতলা অথবা ওলাইচণ্ডীর পূজার মত সর্দ্দার সাহেবকে মাসে-মাসে কিছু দিতেই হয়।

যে বাবু মজুরী বাটেন, তাঁহারও প্রাপ্য বরাবরকার—তাহাও জমিদারের খাজনার মত অবশ্য দেয়; অর্থাৎ তিনি নিজ অংশ কাটিয়া দয়া করিয়া বাকীটা প্রদান করেন। বাগানে যে ব্যক্তি মুদীখানার দোকান করে, তাহাকে বাগানের বাবুদিগকে অল্পমূল্যে সামগ্রী সরবরাহ করিতে হয় বলিয়া, কুলিদিগকে তাহার খরচ পোয়াইতে হয়। সেই জন্য বাজারে সাড়ে চারি টাকা মণ চাউল কিনিয়া বাগানে তাহাকে নয় টাকায় বিক্রয় করিতেই হয়;—কারণ, তাহারও, কুলিগণ ব্যতীত, অন্য সকলেরই মত, পুত্র-পরিবার তাহারই উপর নির্ভর করে। ইহা ছাড়া, ধারে বিক্রয়ে তাহার পক্ষেরও সুবিধা আছে যে, জিনিস বিক্রয় না করিয়াও দেনা বাড়াইবার বিশেষ সুবিধা। ফলতঃ ইহারা কেহই কখনও ঋণমুক্ত নহে—দাশুও হইতে পারে নাই; সুতরাং বাগানে আসিয়া প্রথম দুই মাস মাত্র দুইবার সে আটটাকা করিয়া বাড়ী পাঠাইয়াছিল। তাহার পর আর কখনও এক পয়সাও পাঠাইতে পারে নাই,—তাহার একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও সে অসমর্থ।

তাহার সেই বিশাল বক্ষ, বলিষ্ঠ দেহ আর নাই। এ দেশীয় জল-হাওয়ার একটী অতি মহৎ গুণ এই যে, কুইনীন্ ভিন্ন জল-হাওয়া হজম হয় না। এ কারণ দাশুর এখন দাঁড়াইয়াছে এই যে, জঠরে অন্নজলের অভাবটা প্লীহা-যকৃৎ পুরাইয়াছে, অবকাশ-কালটি ঔষধ-সেবনে কাটে এবং অপরাহ্ণগুলি জ্বরের ঘোরে যায়; বিনা আয়াসে এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে।

ক্রমে দাশুর স্বাস্থ্য একবারে গেল। যে আগে দেড় মণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিত, সেই দাশু এখন পাঁচ সের বোঝা উঠাইতেও হাঁপাইয়া পড়ে। মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন কামাই; যাহা উপার্জ্জন করে—তাহারও কিছু অংশ সর্দ্দার এবং বাবুকে দিয়া, বাকীটা দোকানের বাকীতে উশুল দেয়,—তবুও একবারে সব ঋণ শোধ হয় না।

দাশু দেখিল, সে রোজগারের আশায় এখানে প্রবঞ্চিত হইয়া আসিয়া, উপার্জ্জন করিল ম্যালেরিয়া, প্লীহা এবং অপরিশোধ্য ঋণ। কতবার সে ভাবিয়াছে, সাহেবকে গিয়া জানাইবে যে, সে দেশে ফিরিয়া যাইবে; কিন্তু সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ আর তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। ভগবানের দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু চা-বাগানের বড়সাহেবের দেখা পাওয়া অসম্ভব। যার সম্ভব, তার শুধু জন্ম-জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফলেই হয়। কাযেই নিরুপায় দাশু বাগানেই থাকে। কায করুক্ আর নাই করুক্, ছুটি নাই, মুক্তি নাই! যদি এমনি ছুটি না পায়—তবে মরিয়া ছুটি করিয়া লইবে ভাবিয়া, দাশু কতবার আত্মহত্যা করিতেও সঙ্কল্প করিয়াছে; কিন্তু পারে নাই;—যদি কখনও সে মুক্তি পায় তো দেশে গিয়া পুনরায় স্ত্রী পুত্র-পরিবারের সহিত মিলিত হইতে পারিবে, এই ভরসায় পারে নাই। সময়ে-সময়ে তাহার মনে হইয়াছে যে, একবারে সমস্ত লোককে সে এক রাত্রে খুন করিয়া আপনার এবং তার মত সমদশাগ্রস্ত সহস্র-সহস্র নরনারীর বন্ধন মোচন সে করিয়া দেয়;—কিন্তু পরক্ষণেই আপনার বাতুলতায় সে আপনিই হাসিয়াছে। তাহার মন দিবারাত্রি তাহার পরিবারবর্গের চিন্তাতেই পরিপূর্ণ। এতদিনে তাহারা কে কত বড় হইয়াছে, কাহার দেহে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সাংসারিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, কন্যার বিবাহ হইল কি না, তাহার ক্ষেতে কে চাষ দিতেছে, পাশের ক্ষেতে কি হইয়াছে,—এই কথাগুলিই ঘুরিয়া-ফিরিয়া তাহার মনের মধ্যে মধুচক্র-নির্ম্মাণ-রত মৌমাছির মত রাত্রিদিন আনাগোনা করিতেছে। গ্রামের লোকেরা তাহার কথা বলে কি না, বন্ধুরা কি বলে, শত্রুরা কি ভাবে, আত্মীয়েরা কি মনে করে,—সে আপন মনেই কথা গাঁথিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর তৈরি করে। কখনও মনে করে, যদি সে আর দেশে না ফিরে, তবে তাহার পরিবারের কি দশা হইবে—সে চিত্রও আঁকে। আবার কখনও ভাবে, জ্বর সারিয়া গেলে শরীরটা এবার সুস্থ হইলে, সে দ্বিগুণ পয়সা উপার্জ্জন করিয়া নিশ্চয়ই দেশে ফিরিবে; কটিদেশে গেঁজেভরা রজতমুদ্রা দেখিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলে অবাক্ হইয়া যাইবে। সেই কাঙাল পরিজনবর্গের ম্লান মুখে আনন্দোচ্ছল হাসির স্বপ্নে দাশরথি আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইত। কিয়ৎক্ষণের জন্য তাহার সমস্ত চেতনা বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু সেটা কল্পনা! বাস্তব নিদারুণ কঠিন, কঠোর এবং নিষ্ঠুর। দাশু উন্মাদের মত রুদ্ধমুষ্টিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পরক্ষণেই আবার স্থির হইয়া বসিয়া পড়িত; আর তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে তপ্ত জলধারা শীর্ণ পাণ্ডুর গণ্ডযুগল বহিয়া টপটপ করিয়া গড়াইয়া পড়িত।

ন্যায়-অন্যায় নানা প্রক্রিয়া করিয়াও দাশু তাহার ছাড়পত্র যোগাড় করিতে যখন পারিল না, তখন ঠিক করিল যে একদিন রাত্রিকালে সে পলাইবে। প্রথম-প্রথম ভাবিত যে ইচ্ছা করিলেই ত' যাইতে পারে; কিন্তু যখন আসিয়াছে এতদূর, তখন কিছু না কামাইয়া রিক্তহস্তে সে ফিরে কেমন করিয়া? তাই সকলের সঙ্গে হাসিমুখেই কায করিত। জ্বর আসিত, কম্বল মুড়ি দিয়া শুইত; এবং যাহা পাইত, তাহাতে তাহার সব কষ্টের অবসান হইত। কিন্তু পরে যখন দেখিল যে স্বাস্থ্য গিয়াছে, এখান হইতে নিষ্কৃতি নাই, এবং যাহা পায় তাহা এইখানেই উড়িয়া যায়,—তখন সে বাড়ী যাইবার জন্য পাগল হইল। স্বর্ণমৃগের অনুধাবন করিয়া সে এমন জালে পড়িয়া গিয়াছে যে, এখন সে নিজেই বাহির হইতে অক্ষম! অমনি তাহার সমস্ত রক্ত চন্ করিয়া মাথায় উঠে এবং অনুপস্থিত পাঁড়েজীর উদ্দেশে নিষ্ফল আক্রোশে যষ্টি উত্তোলন করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাঘ মাস। কন্‌কনে শীত। আকাশভরা মেঘ—তাহাতে অন্ধকার রাত্রি। কোলের মানুষ দেখা যায় না। দাশু আপনার কম্বল, কম্বলের একটা কোট, একটা ঘটী, একখানি পিতলের থালা, বাটি এবং গ্লাস একটা পুঁটুলিতে থান ২।৩ ছেড়া কাপড়, একশিশি কুইনীনের বড়ি, কতকগুলি চা, সেরখানেক চাউল, চারিটি আলু, খানিকটা লবণ, একটা মাটির চোঙায় একটু সরিষার তেল এবং এমনি আরও কয়েকটা কি লইয়া উন্মাদের মত বাগিচা হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

বিগত কয়েকদিন যাবতই সে কেবলমাত্র পলাইবার ফিকিরই করিতেছিল; কিন্তু নানা কারণে সে সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই; তন্মধ্যে প্রধান, জ্বর বিশ্রাম না হওয়ার দরুণ দৌর্ব্বল্য ও দ্বিতীয়তঃ মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাহার প্রাপ্যটা আদায়। প্রধানতঃ এই দুই কারণেই সে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই।

দোকানী একবার তাগাদা করিয়াছিল; কিন্তু দাশু আগামী কল্য দিব বলিয়া রেহাই লইয়াছে। দাশু ঠিক করিয়াছে যে, সে অনেক দিয়াছে, আর দিবে না। যেন সকলে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছে যে, তাহাকে ধনে-প্রাণে মারিয়া ফেলিবে। বাগানের লোকেরা খাটাইয়া-খাটাইয়া, আধপেটা খোরাক দিয়া, তাহার জীবের মত দেহ ছারেখারে দিয়াছে,—আর এই নিকট কুটুম্ব জুয়াচুরি করিয়া তাহার এই কষ্টের হাড়-জল-করা পয়সা আত্মসাৎ করিতেছে। দাশুর আর ধৈর্য্য বা বিবেচনা নাই! এ সংস্রবে যারা আছে, সকলেরই উপর সে জাতক্রোধ হইয়া উঠিয়াছে! তাই সে পলাইবে।

সকাল হইতেই সে দুঃসহ প্রতীক্ষায় রাত্রির অপেক্ষা করিতেছিল। দেহে জ্বর না থাকা সত্বেও সে জ্বরের ভান করিয়া, চুপ করিয়া শুইয়া-শুইয়া, তাহার স্ত্রী, কন্যা ও মাতার মুখ স্মরণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিল। আবার সে বাড়ী ফিরিবে! আবার আপনার পরিবারবর্গের সঙ্গে মিলিত হইবে! আবার আপনার আজন্ম-পরিচিত গ্রামের পথে সে চলিবে! এই কল্পনা—উগ্র মদের মত তাহাকে সারাদিন মাতাল করিয়া রাখিয়াছিল।

এই শক্ত পাহারার জেলখানা হইতে সে নিশ্চিন্তে, নির্ব্বিবাদে পলাইবে—মুক্ত হইবে—এই সমস্ত নরখাদকের চক্ষুতে সে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইবে,—ভাবিতে-ভাবিতে সে সময়ে-সময়ে অজ্ঞাতে হাসিয়া ফেলিতেছিল; কখন-কখন অজ্ঞাতসারে হস্ত-পদাদিও আস্ফালন করিতেছিল। গোপনে সে পাক করিয়া খাইতে বসিল; কিন্তু মনের অব্যক্ত আনন্দে সে ভাল করিয়া খাইতেই পারিল না। তাহার মনে আর অন্য কোনও চিন্তাই ছিল না,—কেবল একবার সন্ধ্যা লাগিলেই, গা ঢাকা আঁধার হইলেই, সে বাহির হইয়া পড়িবে।

অন্ধকারও হইল ঘুটঘুটে সে দিন। দাশু ভারি খুসী। সে, তাহার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই কোনও রকমে কম্বলখানায় জড়াইয়া মাথায় করিয়া, "জয় মা সিদ্ধেশ্বরী" বলিয়া আপনার কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

তাহার হৃৎপিণ্ড ঢক্‌ঢক্ করিয়া আঘাত করিতে লাগিল; কাণ বোঁ-বোঁ করিতে লাগিল; গায়ে স্বেদোদ্গম হইতে আরম্ভ হইল।

প্রথমটা খুব আস্তে-আস্তে চারিদিক দেখিতে-দেখিতে চলিতে লাগিল; ক্রমশঃ তাহার পদক্ষেপ দীর্ঘতর হইল,—শেষে সে রীতিমত দৌড়িতে লাগিল। কতবার হোঁচোট খাইল, কতবার পড়িয়া গেল, কতবার উঁচু-নীচু স্থানে পা পড়িয়া পড়িতে-পড়িতে বাঁচিয়া গেল,—তবু ভ্রূক্ষেপ নাই।

দৌড়িতে-দৌড়িতে কতদূর, কোন্ পথে আসিয়া পৌছিল, তাহাও খেয়াল নাই! কোন্ পথে যে যাইতে হইবে, তাহাও সে জানে না! তবু ছুটিয়াছে—এই অনির্দ্দেশ, নিরুদ্দিষ্ট পথে ছুটিয়াও তাহার সান্ত্বনা; কেন না, সে মুক্ত! তাহার ছয় বৎসরের কারা-ক্লেশের আজ অবসান!

কতটা পথ, কোন্ দিকে, কত রাত্রি কিছুই দাশুর খেয়াল না থাকিলেও, তাহার বিশ্বাস, সে এখনও বেশী দূর আসিতে পারে নাই। এখনও সে বাগানের অতি নিকটে;—হয় ত সবাই জানিতে পারিয়াছে যে, দাশু পলাইয়াছে। লোক বুঝি ছুটিল! পিতলের-তক্‌মা-ঝুলান, চাপকান্-পরা, পাগ্‌ড়ী-আঁটা চাপ্‌রাশীরাও তাহার পিছু লইয়াছে। তাহারা সুস্থ, সবল,—খালি হাতে-পায়ে আসিতেছে;—তাহারা বেশ দৌড়িতে সমর্থ; কিন্তু দাশুর যে নানা বাধা! কি করে? সে বেগ বাড়াইয়া দিল। ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়িতে লাগিল। এখন তাহার ভাবনা যে, বাধা পড়িলে,—যে কষ্ট তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল,—তাহাই যে দ্বিগুণ হইবে। অতএব যখন পলাইয়াছে, তখন পলাইতেই হইবে। সে ঝড়ের মত দৌড়িতে লাগিল। যত দৌড়ায়, ততই মনে হয়, যেন সে চলিতেই পারিতেছে না।

কেবলি তাহার মনে হইতেছিল, যেন তাহার পিছু-পিছু আরও কে একজন সমান বেগে ছুটিতেছে! মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া তাকায়, কাহাকেও দেখিতে পায় না—তবু ছুটে। সে যে এত কাছে, তার পায়ের শব্দ শোনা যায়, কিন্তু লোক দেখা যাইতেছে না। হয় ত অন্ধকারে! দাশু তাহার দৌড়ের বেগ আরও বাড়াইয়া দিল! সংজ্ঞাহীন উন্মত্তের মত ছুটিতে-ছুটিতে একঝাড় কালকাসিন্দা গাছের উপর সজোরে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। মাথার বোঝা তাহার আরও বহু আগে গিয়া সশব্দে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। সত্য-সত্যই সে এতক্ষণে অজ্ঞান!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যখন তাহার জ্ঞান হইল—তখন বেলা প্রায় আটটা। তাহার চারিদিকে অসংখ্য লোক,—মায় পুলিশ পর্য্যন্ত উপস্থিত!

চক্ষু চাহিয়া দেখিয়াও সে প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না। কথা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না! সর্ব্ব-শরীরে তাহার প্রচণ্ড বেদনা। সে যে কি করিয়াছে, এবং কোথায় আসিয়াছে, এবং কেন এরূপ হইয়াছে, কিছুই মনে করিতে পারিল না!

সমাগত লোকেদের মধ্য হইতে কতজনে কত কি তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল,—সে প্রশ্নও ভাল বুঝিতে পারিল না,—কথার উত্তর দিবারও তাহার সামর্থ্য ছিল না। সকলে আস্তে-আস্তে কথা বলার দরুন একটা যে কলরব উঠিতেছিল, তাহাও সে ধরিতে পারিতেছিল না। একবার উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাও না পারিয়া, সে বিহ্বল নেত্রে লোকগুলির পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া সকরুণ ভাবে চাহিয়া রহিল।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছেলে-ছোক্‌রাই বেশী,—বয়স্ক লোক দুই-চারিজন। ছেলেরা কৌতূহলী হইয়া দাশুর মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া নির্ব্বাক্,—আর মাতব্বররা মধ্যে-মধ্যে ছড়ান জিনিষগুলির পানে কটাক্ষ হানিতেছেন; এবং সন্দিগ্ধ ভাবে অন্য একজনকে ইঙ্গিত করিতেছেন,—আর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মধ্যে মধ্যে দাশুর মুখপানে চাহিতেছেন।

ফিস্‌ফিস্ জটল্লায় সুখ কোন দিনই নাই। কাযেই আলোচনাটা মা দুর্গার মত হঠাৎ দশভূজা মূর্ত্তি ধারণ করিল। বৃদ্ধদের মধ্য হইতে কেহ বলিল চোর; কেহ বলিল খুনে; কেহ বলিল বদমাইস সে তার আর কোনও সন্দেহ নাই। দেখচ না কথা বল্‌চে না; কেহ ইত্যাদি। কিছু সিদ্ধান্ত হইল না,—যাহা এদেশে কোন বিষয়ে কখনও কোন দিনই হয় না, বিশেষতঃ সিদ্ধান্তপঞ্চানন দারোগা বাবুও যখন আসিতেছেন। ছেলেদের পক্ষ হইতেও বিচার হইতে লাগিল। কেহ বলিল বোবা; কেহ বলিল, একেই কে মেরে সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে গেছে; কেহ বলিল কি জানি! একজন কলেজের ছাত্র ছিল; সে বলিল, ডিটেক্টিভ্ নয় ত? সহসা সকলের দৃষ্টিই কথক মহাশয়ের উপর পড়িল এবং সকলের অন্তরেই অপ্রত্যক্ষ ভাবে একটা অহেতুকী ভীতির মন্দ হাওয়া বহিয়া গেল। বেশ একটু চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। এমন সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে দারোগা বাবু আসিয়া হাজির। সকলে অতি ভক্তিভাবে তাঁহাকে অভিবাদন অভ্যর্থনা করিলেন।

দারোগার আগমনের পর সকলেই চুপ করিল। সমাগত জনসংঘের পিছনদিক হইতে লোকও ক্রমশঃ ভাঙ্গিতে

আরম্ভ হইল। দারোগা অনেক প্রশ্ন করিল; দাশু কোন উত্তর দিতে পারিল না। অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দারোগা বলিল, "লোকটার যে খুব জ্বর! আপনারা সব এতক্ষণ কি তামাসা দেখছিলেন? লোকটা যে মরে!" সম্মুখস্থ সকলের মুখ-মণ্ডল মলিন হইয়া গেল। কেহ গলা নাড়িতে, কেহ ঘাড় নাড়িতে এবং কেহ হাত কচ্‌লাইতে লাগিলেন।

"ওরে হরে, যা,—শীগ্‌গীর একটা ডুলি কি পাল্কি যা হয় জনচ্যারেক বেহারা সুদ্ধ এখুনি নিয়ে আয়। একে থানায় নিয়ে যেতে হবে। আমি এই গাছতলায় বস্‌ছি। যাবি আর আসবি।" হরিদাস ওরফে হরে চৌকিদার সমস্ত কথাটা না শুনিয়াই দৌড়িল। দারোগা বাবু আসিয়া রুমাল দিয়া ঝাড়িয়া গাছতলে উঁচু শিকড়টির উপর বসিয়া অন্যদিকে চাহিয়া সিগারেট ধরাইলেন।

পশ্চাদ্দিকে দণ্ডায়মান লোকগুলি কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া উস্‌খুস্ করিল, কাসিয়া গলা ঝাড়িল, অকারণ দু-একটা শব্দ করিল; কিন্তু দারোগা বাবু ফিরিয়া চাহিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রায় একমাস কাল হাসপাতালে থাকিয়া দাশু নীরোগ হইল। দারোগা বাবু দাশুর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। দাশু আবার দেশের পথে চলিল।

থানা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দাশু যে কয়টি দিন সেখানে ছিল, তাহার মধ্যে সে সকলেরই বড় অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। সকলেই দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে যাইবার সময় কিছু-কিছু দিল। দাশু রেলগাড়ীতে চড়িল।

সকলেই তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, নৈহাটী ষ্টেশনে টিকিটখানি দেখাইয়া যেন অন্য গাড়ীতে চড়ে; টিকিট-খানি যেন হস্তান্তরিত না করে; কিন্তু বর্দ্ধমানবাসী মালোনন্দন দাশরথি নৈহাটীতে টিকিটখানি টিকেট-কালেক্টারকে দিয়া সকলের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর যাহা হয় তাহাই ঘটিল, আবার অকূল সমুদ্রে পড়িল। রেলের বাবুদিগকে, খালাসীদিগকে, কুলিদিগকে পর্য্যন্ত অনেক অনুনয়-বিনয় করিল; কেহই তাহার টিকিট-খানি আর ফিরাইয়া দিল না। সে চারি আনা পর্য্যন্ত পান খাইতে দিতে পারিত, তাহাও দিতে স্বীকৃত হইল; কিন্তু বাবু আরো কিছু বেশী প্রাপ্তির আশায় তাহাতে রাজী হইলেন না। দাশু চলিয়া গেল। আপনার হতভাগ্যকে ধিক্কার দিতে-দিতে দাশু বাহিরে গেল—যদি কোন সুরাহা হয়। কিন্তু দাতা পৃথিবীতে এত সুলভ নয়। দাশু পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিল। সারাদিন পথ চলে; ক্ষুধা পাইলে কিছু মুড়িমুড়্‌কি কিনিয়া খায়; বৃক্ষতলে শয়ন করে; অথবা কোন লোকের বহির্ব্বারান্দায় রাত্রিযাপন করে; আর প্রভাত হইলেই চলিতে আরম্ভ করে।

পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেল। দাশু মাত্র ছয়আনা পয়সা সম্বল করিয়া নৈহাটি হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোনমতে জীবন রক্ষা করিয়া সে চলিতে ছিল। কিন্তু আজ সে একেবারে কপর্দ্দকহীন। যেখানে আসিয়াছে, এখান হইতে তাহাদের গ্রাম বারো ক্রোশ মাত্র। তবু আপন জেলায় ত! যে কোন উপায়ে সে বাড়ী পৌঁছিবেই, এই আনন্দে সে দিন উৎসাহে খালিপেটেই চলিতে লাগিল। যখন বড় পিপাসা পায়, তখন একেবারে পেট ভরিয়া জলপান করে। ক্ষুধায় চোখে অন্ধকার দেখিলেও ভিক্ষা করিতে মন সরিতেছিল না। অনেকবার মনে করিয়াছে যে, অন্য কোথাও না গিয়া কোনও ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া যদি দুই মুঠা প্রসাদ যাচিঞা করে, তাহা হইলে অন্যায় কি হয়, বা তাহাতে তাহার লজ্জাই বা কি; সে যে মালো—ব্রাহ্মণের দাসানুদাস; কিন্তু তবু পারিল না। কেমন একটা বাধ-বাধ ঠেকিল,—যাহা সে নিজেই সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারিল না। ফলে, সে সারাদিন অভুক্ত রহিয়া গেল।

একে মাঘ মাস, শীতকাল,—তাহাতে সমস্ত দিন না খাইয়া পথ চলিয়াছে; কাজেই অপরাহ্নেই দাশু একেবারে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। শীতের প্রবল হাওয়ায় তাহার হাত, পা, মুখ, ঠোঁট সব ফাটিয়া গিয়াছে; শীতে, কয়েক দিনের দুর্ভাবনায় এবং পথশ্রমে মুখ-চোখ বসিয়া গিয়াছে; তৈলা-ভাবে কৃষ্ণ দেহবর্ণ আরো কৃষ্ণ এবং রুক্ষ হইয়াছে; পদতল ফাটিয়া-ফাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে; পেট ধক্-ধক্ করিতেছে। দৌর্ব্বল্যে মুখ দিয়া কথা ফুটিতেছে না। এই অবস্থায় দাশু একটি গ্রামে প্রবেশ করিয়া একজনের বাহিরের দাওয়ায় হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বসিয়া পড়িল। কোমর টন্‌টন্ করিতেছিল, শরীর অবশ অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল; বেশীক্ষণ বসিতে পারিল না, পুঁটুলিটি মাথায় দিয়া শুইয়া

পড়িল এবং অচিরে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মৃতের মত ঘুমাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই হঠাৎ দাশুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঢোল কাঁসি চড়বড়ে নাগরা রামশিঙা প্রভৃতি বাজাইয়া, বিপুল কোলাহল করিয়া, মশাল রং-মশাল বোম্ তুবড়ি প্রভৃতি রোশ্‌নাই করিতে-করিতে মহা সমারোহে এবং সোরগোলে উত্তরপাড়ায় বিরাট বাহিনী সহ একটি বর আসিল।

দাশু প্রথমে মাথাটি তুলিয়া এদিকে-ওদিকে চাহিয়া, ব্যাপারটি কি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, পুনর্ব্বার যথাস্থানে মস্তক স্থাপিত করিয়া, চক্ষু মুদিয়া শুইয়া রহিল। তখন তাহার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল, এবং ক্ষুধায় জঠর জ্বলিয়া যাইতেছিল। একে শীতকাল। তাহাতে বারান্দায় শুইয়া, অল্প স্বল্প হাওয়াও বহিতেছিল—শীতের কাঁপুনি ধরিল। দাশু কম্বলটা ঢাকিয়া ভাল করিয়া আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া জড়-সড় হইয়া পাশ-ফিরিয়া শয়ন করিল। অনেকক্ষণ রহিল, কিন্তু ঘুম আসিল না, বা কাঁপুনিও থামিল না। তখন বিবাহ-বাড়ীর কলরবটা কয়েক পর্দ্দা নীচে নামিয়া গিস্-গিস্ শব্দে পরিণত হইল। দাশু উঠিয়া বসিল।

খানিকক্ষণ একমনে কি ভাবিয়া চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কম্বলখানি বেশ করিয়া দেহে জড়াইয়া লক্ষ্য করিয়া দাশু বিবাহ-বাড়ীর দিকে টলিতে-টলিতে গমন করিল। বিবাহ-বাটীতে পৌঁছিয়া সে দেখিল যে, তখন বরযাত্রীদিগকে আরো রসগোল্লা কিম্বা পানতুয়া অথবা একটু ক্ষীর খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি চলিতেছে। বরযাত্রীরা যতই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, ততই অনুরোধ প্রবলতর হইতেছে। কেহ-কেহ পাতের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মিষ্টান্ন প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। দাশু নিষ্পলক নেত্রে দূর হইতে একমনে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। সে একবারে তন্ময়। বরযাত্রীরা যখন উঠিয়া পড়িল, তখন দাশুর ঘুম ভাঙিল এবং একবারে সে বসিয়া পড়িল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

পাশের খালি গো-শকটে বরযাত্রীরা শুভাগমন করিয়াছেন; তাহার গনের জন চালক, পাল্কী, বেহারা, ভৃত্য, নাপিত প্রভৃতি বরপক্ষীয় ব্যক্তিও বড় কম ছিল না। তাহাদেরও কন্যার পিতার গৃহে আজ জামাতার মত সমান আদর; কাযেই ব্রাহ্মণাদি বরযাত্রীদের ভোজন শেষ হইতে না হইতেই ইহাদের ডাক পড়িল। ইহারা অমনি, "দাদারে", রামুখুড়ো", "হারুজ্যাটা", "ম'তো", "মাধা" প্রভৃতি আজন্ম-কথিত জাতীয়-আখ্যায় বেশ একটি হাঁকা-হাঁকি বাধাইয়া দিল। অনুপস্থিতদের মধ্যে সকলেই প্রায় যথা-তথা শায়িত এবং নিদ্রিত। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়াও যখন সকলকে একত্র করা গেল না, তখন দুই এক জন বিশিষ্ট শকট-চালক তাহাদিগকে অপ্রস্তুত খাদ্য খাওয়াইতে-খাওয়াইতে প্রস্তুত খাদ্যের জন্য ডাকিতে গেল। যাহারা রহিল, তাহারা শীতে, ক্ষুধায় অনিদ্রায় এবং দৈবলব্ধ সুখাদ্য-ভোজনে বিলম্বহেতু হাঁই তুলিয়া, হি-হি করিয়া, চোখ্ রগড়াইয়া অপ্রসন্নচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল; কেহ কেহ সেইখানেই উপুড় হইয়া বসিয়া পড়িল।

খালি-গায়ে একখানি র‍্যাপার জড়াইয়া, খালি-পায়ে, পরিহিত বসন-খানি আজানু-উত্তোলিত কন্যাকর্ত্তা মহাশয় তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত লোকগুলিকে পরিতৃপ্তি-সহকারে আহার করিতে এবং যে দ্রব্য প্রয়োজন, তৎক্ষণাৎ তাহা চাহিয়া লইতে অনুরোধ করিয়া আবার তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। যাইতে-যাইতে জনৈক পরিবেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় বলিয়া গেলেন, যেন বরপক্ষীয় লোক ছাড়া বাহিরের কোন লোক এখন না বসে। দাশুর মাথা ঘুরিতেছিল; সে অতর্কিতে একটু সরিয়া অদূরে অন্ধকার পানে গিয়া বসিয়া পড়িল। দাশু স্থির করিয়াছে যে, সে-ও এই সঙ্গে বসিবেই; কারণ তাহাকে কোন পক্ষই চিনে না, আর চিনিলেও, সে পশ্চাৎপদ নহে, কারণ বড় ক্ষুধা। ক্ষুধা এখন খাদ্যদানে এবং তাহার গন্ধে চতুর্গুণ বাড়িয়াছে; সে আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না।

পাতা পড়িল। দাশুও একখানি পাতা লইয়া বসিয়া পড়িল। ভোক্তারা দাশুকে মনে করিল কন্যাপক্ষীয় কেহ, পরিবেষ্টা ভাবিল বরপক্ষীয় ব্যক্তি। পাতায় জল ছিটান হইতেছে, এমন সময় বরকর্ত্তা মহাশয় শাল-গায়ে, পায়ে খড়ম, একটা ডাবা হুঁকা হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন,—"দেখো ঈশেন, তোমার উপর সব ভার, কেউ যেন চীৎকার গোলমাল করো না। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বসে খাও, যা পারবে, তাই নিও; গুচ্ছের নিয়ে পাতে ফেলে কোন

জিনিস যেন আপ্‌চো ক'রো না। মাঝডাঙ্গার চাটুজ্জে-দের যেন মুখ হাসিও না।"

দাশু নতমুখে পাতে লুচিগুলি গোছ করিতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিতে সাহস করে নাই। কিন্তু হঠাৎ মাঝডাঙ্গার নাম শুনিয়া তাড়িতাহতের মত দাশু শিহরিয়া উঠিয়া বর-কর্ত্তার মুখপানে চাহিল। তাহার বুক ধরাস্‌-ধরাস্‌ করিতেছিল, মাথার মধ্যে ঝিম্‌-ঝিম্‌ শব্দ হইতেছিল। সে আহার ভুলিয়া আবিষ্টের মত একদৃষ্টে চাটুজ্জে মহাশয়ের মুখপানে চাহিয়া-চাহিয়া ঘামিয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে স্তম্ভিত থাকিয়া, এক লম্ফে চাটুজ্জে মহাশয়ের পদপ্রান্তে আসিয়া, তাঁহার চরণ-যুগলে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া ডাকিল, "খুড়োঠাকুর!"

প্রথমে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটু চমকিয়া উঠিয়া-ছিলেন। বলিলেন—"কে, কে?"

দাশু কাঁপিতে-কাঁপিতে অতি-কষ্টে কহিল,—"আমি, দাশরথি, মাধবদাসের ছেলে।" দাশুর গলা শুকাইয়া গিয়াছিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চিন্তিত হইয়া, দাশুর মুখের পানে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া কহিলেন,—"দাশরথি, মাধবের ছেলে? কে? আমি তো চিন্‌তে পারলু না বাপু! কোন্‌ পাড়ায় তোমাদের বাড়ী বল তো?"

দাশু তখনও ভাল করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই; বলিল—"মালোপাড়ায় আমাদের বাড়ী। নারান্‌ দা'-ঠাকুরের পৈতের সময় আমরাই খুড়ো-ঠাকুরকে মাছ দিয়ে'লাম।—"

"ওঃ! দাশু, দাশু, তাই বল্‌। তুই এখানে কোত্থেকে, তোকে যে আমি চিন্‌তেই পারি নাই।"

দাশু বাঁচিল। কহিল—"সে অনেক কথা খুড়ো-ঠাকুর, আমার মা'-রা সব ভাল আছে-তো?"

ভোক্তাদের দল হইতে এক জন হাত চাটিতে-চাটিতে বলিয়া উঠিল—"সে কি-রে দেশো, তোরি যাবার দু' তিন মাস পরেই তো তোর মা, ইস্তিরী আর তোর মেয়ে যে তোর কাছেই গিয়েছে, সেই পাঁড়েজী এসে নিয়ে গিয়েচে।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, তাইতো শুনেচি আমিও। তোর খুব ভাল চাক্‌রী হয়েছে—ও কি, ও কি, অমন কচ্চিস্‌ কেন?"

হতাশভাবে দাশু বলিল,—"চাক্‌রী কোথা খুড়োঠাকুর, আমাকে ভাঁড়িয়ে,—সে শালা চা-বাগানে আমাকে কুলি-চালান দিয়েছিল।"

দাশুর হাত-পা অসাড় হইয়া গেল। সে বসিয়া পড়িল। কপালে করাঘাত করিয়া দাশু কাঁদিয়া অস্ফুটস্বরে একটা শুষ্ক শব্দ করিল। দু' একজন লোকও জমিয়া গেল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হতভম্বের মত হুঁকাটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোর মা-মেয়েরা তবে—"

"আর মা-মেয়ে খুড়োঠাকুর! তবে আর কার জন্যে আসা?" বলিতে-বলিতে দাশু সেইখানেই শুইয়া পড়িল।

"ওরে, ওরে, খেয়ে-নে আগে। দাশু, দাশু, দাশু! মূর্চ্ছা গেল না-কি?"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, বিবাহের বর নারায়ণ কলিকাতায় মেডিকেল-কলেজে উচ্চশ্রেণীতে পড়িত। এই গোলমালে সে-ও আসিয়া পড়িল। একটু নাড়াচাড়া করিয়া নাড়ী ও বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া কহিল—"হার্ট ফেল্‌ ক'রে মারা গেছে! কি হয়েছিল কি?"

পুরুষের পাতাকাটা ও য়্যালবার্ট

সাহেবী ফ্যাসান

থিয়েটারী ফ্যাসান

ব্যারিষ্টারী ফ্যাসান

যোধপুরের রাজপথ

ফালকনুমা রাজপ্রাসাদ হইতে হায়দরাবাদের (দাক্ষিণাত্য) দৃশ্য
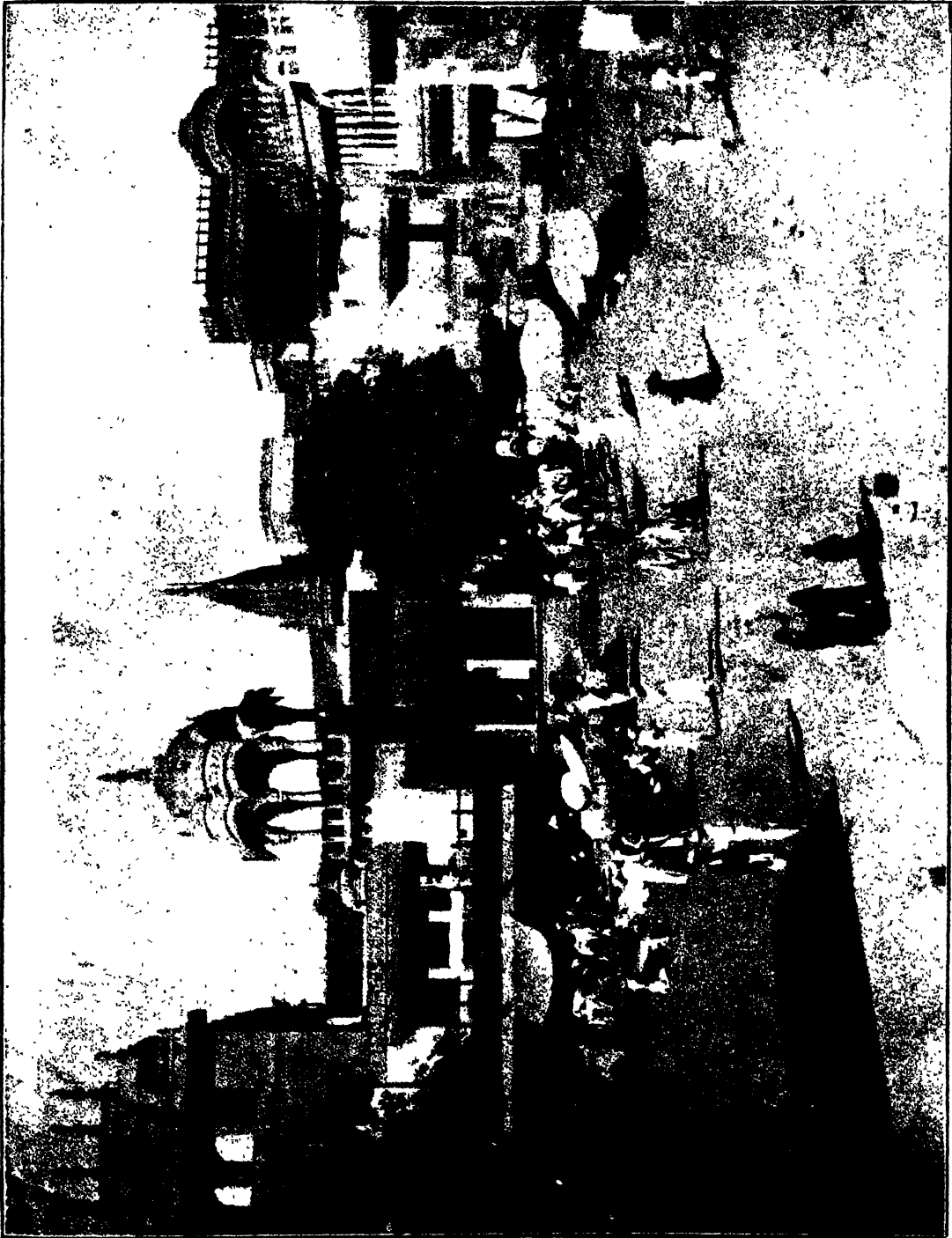
কয়লার খনি

[শ্রীসুশীলচন্দ্র রায় চৌধুরী বি-এস-সি]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কয়লার অন্বেষণ (Search after Coal)

কোথায়, কোন্ জমির নিম্নে কয়লা পাওয়া যাইবে, তাহা জানিতে হইলে, অন্য কোনরূপে বৃথা অর্থ নষ্ট না করিয়া, সর্ব্বাগ্রে কোন স্থানের ভূ-তত্ত্বের আলোচনা করা আবশ্যক। স্বর্ণ, রৌপ্য বা অন্য কোন ধাতুর খনি আবিষ্কার করা অধিকাংশ স্থলে দৈব ঘটনার উপর নির্ভর করে। মেক্সিকোর বৃহৎ রৌপ্যখনি ও অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনি এইরূপে হঠাৎ আবিস্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু কয়লার খনি আবিষ্কারের জন্য আমাদিগকে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে হয় না। কোন স্থানে কয়লা খুঁজিতে হইলে, প্রথমে সেখানকার শিলাগুলি (rocks) কোন্ সময়ের, অর্থাৎ Carboniferousএর (অঙ্গারক) পূর্ব্বের কি পরের যুগের, তাহার পরীক্ষা করিতে হয়। যদি পূর্ব্বের হয়, তবে সেখানে কয়লা পাওয়ার কোন আশা নাই; কারণ Carboniferous-এর পূর্ব্বে বৃক্ষ-লতাদির আদৌ সৃষ্টি হয় নাই; আর যদি পরের হয়, তবে সেখানে কয়লা থাকা সম্ভব। যদি সে স্থলের শিলা (rocks) Carboniferousএর সময়ের হয়, তবে খুব সম্ভব সেখানে কয়লা আছে। তখন সেখানে out-cropএর সন্ধান করা উচিত। নিকটস্থ কোন নদী, ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী, কূপ ইত্যাদির কিনারা পরীক্ষা করিলে out-cropএর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। অনেক সময়ে নূতন মৃত্তিকা আসিয়া out-crop ঢাকিয়া দেয়। সেখানকার মৃত্তিকার রং দেখিয়া সেটা অনেকটা বুঝা যায়। অনেক সময়ে জমির উপর লাঙ্গল দিতে-দিতে out-cropএর অস্তিত্ব জানা যায়। এইরূপে কয়লার অস্তিত্ব জানিতে হইলে, ভূ-তত্ত্ব ভাল জানা দরকার।

এইরূপে কয়লার অস্তিত্ব জানিবার পর দেখা উচিত, সেখানকার কয়লা দ্বারা লাভ হইবে কি না; অর্থাৎ কয়লা কিরূপ ও কত নীচে আছে এবং কয়লা-স্তরের ঘনতা (thickness) কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় জানিয়া তবে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই সমস্ত বিষয় জানিতে হইলে সেই স্থানে গর্ত্ত করিয়া দেখিতে হয়। ইহাকে Boring বলে। Boring দ্বারা আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারি :

১। গভীরতা (depth)—কয়লার স্তর কত নিম্নে অবস্থিত।

২। স্তরের পরিমাণ (Number of Seams)—সেই স্থানে কতগুলি স্তর আছে।

এইস্থানে বলিয়া রাখি যে, এক স্থানে একের অধিক কয়লার স্তর থাকিতে পারে। হয় ত কিছু নিম্নে ১০ ফিট ঘন (thick) একটা স্তর আছে। তাহার পর হয় ত কিছুদূর পর্য্যন্ত মৃৎপ্রস্তর (shale) বা বালুকা শিলা (Sand-stone) আছে; আবার তাহার নিম্নে ৮ ফিট ঘন আর একটা কয়লার স্তর আছে।

৩। কয়লা-স্তরের Dipএর দিক নির্ণয় ও তাহার মাপ।

৪। Fault—সেখানে Fault কিম্বা অন্য কোন বিঘ্ন আছে কি না।

একস্থানে Boring দ্বারা উপরিউক্ত সব বিষয়গুলি জানা যায় না। সমস্তগুলি জানিতে হইলে অন্ততঃ ৩টি Borehole চাই।

মনে কর ক খ গ ৩টি Bore-hole

ক—১৩০ গজ গভীর

খ—২০৫ ”

গ—১৭০ ”

সুতরাং খ ক অপেক্ষা ৭৫ গজ গভীর এবং ক খ ৩০০ গজ দীর্ঘ সুতরাং dip—৭৫/৩০০—১/৪ অর্থাৎ ৪এ১ (1 in 4)·

আবার গ ক অপেক্ষা ৪০ গজ গভীর এবং ক গ ৩৬০ গজ দীর্ঘ।

সুতরাং dip—৪০/৩৬০—১/৯ অর্থাৎ ৯এ১ (1 in 9)

আমরা এই পাইলাম যে, ক খ এর dip ৪এ১ অর্থাৎ ক হইতে ৪ গজ দূরস্থিত ঘ ক অপেক্ষা ১ গজ গভীর; এবং ক গ এর dip ৯এ১ অর্থাৎ ক হইতে এই দিকে ৯ গজ দূরস্থিত ‘ঙ’ ক অপেক্ষা ১ গজ গভীর। সুতরাং ‘ঘঙ’ যোগ করিলে ইহা সর্ব্বত্র ১ গজ গভীর হইবে। ইহাকে strike line বলে। এখন ক হইতে যদি এই রেখার উপর ক চ লম্ব টানি তবে তাহাই dip। ক হইতে ক ঘ যে মাপে ধরা আছে সেই মাপে ক চ মাপিলে দেখা যাইবে যে ক চ ৩·২ গজ এবং আমরা জানি যে ইহা ১ গজ গভীর; সুতরাং True dip—৩·২এ১।

BORING

Boring দুই প্রকারে করা হয়।

১। Percussive Boring—অর্থাৎ যাহাতে পুনঃ পুনঃ আঘাত দ্বারা গর্ত্ত করা হয়।

২। Rotary Boring—যাহাতে Bore-rodকে যন্ত্র দ্বারা ঘুরাইয়া-ঘুরাইয়া গর্ত্ত করা হয়।

Boringএ ব্যবহার্য্য কতকগুলি যন্ত্রের বিবরণ।

১। Head-gear—

তিনটী দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড ত্রিভুজাকারে দণ্ডায়মান থাকে; এবং উপরে দণ্ড কয়টি একসঙ্গে আবদ্ধ থাকে। ইহার উচ্চতা Bore-rodএর অন্ততঃ দ্বিগুণ হওয়া উচিত; নচেৎ Bore-rod খুলিবার বা পরাইবার সময় বিশেষ অসুবিধা হয়। উপরদিকে একটা কপিকল থাকে। (১নং চিত্র)

২। Bore-rod—

ইহা উৎকৃষ্ট লৌহ দ্বারা প্রস্তুত। ইহার আকার গোল ও চতুষ্কোণ হয়। ইহা ফাঁপা এবং ইহা ৬ হইতে ১৮ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। পরস্পর যুক্ত হইবার জন্য ইহার উভয় পার্শ্বে পেঁচ থাকে। (২ নং চিত্র)

৩। Chisel—

ইহা Bore-rodএর নিম্নে থাকে এবং ইহাই প্রস্তর কর্ত্তন করে। ইহার আকার বিভিন্ন প্রকারের হয়; তন্মধ্যে Flat Chiselই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (৩ নং চিত্র)

৪। Brace-head—

ইহাতে ৪টী কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতল থাকে; এবং ইহারা লম্বভাবে (at right angles) থাকে। প্রত্যেক হাতল প্রায় ১৮" লম্বা এবং ইহা Bore-rodএর উপরে পেঁচ দ্বারা সংযুক্ত থাকে। (৪ নং চিত্র)

৫। Sludger—ইহা লৌহনির্ম্মিত ফাঁপা নল। ইহা Bore-rodএর মধ্যে প্রস্তর বা কয়লার কর্ত্তিত অংশ যাহা জমে তাহা উপরে তুলিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার নিম্নে একটী দ্বার (valve) আছে, তাহা কেবল উপরের দিকে খোলা যায়। ইহা দ্বারা সজোরে Bore holeএর নিম্নে ২।৪বার আঘাত করিলে প্রস্তর বা কয়লার কর্ত্তিত অংশ ইহার ভিতরে প্রবেশ করে এবং দ্বার (valve) দিয়া আর নীচে পড়িয়া যাইতে পারে না। তাহার পর ইহা উপরে তুলিয়া লওয়া হয়; এবং ইহার ভিতরের কর্ত্তিত অংশ দেখিয়া বুঝা যায় যে, কিরূপ প্রস্তরের ভিতর দিয়া Bore hole যাইতেছে। (৫ নং চিত্র)

৬। Rocking lever—যখন Bore-rodগুলি এত ভারী হয় যে Brace-head এর লোকগুলির পক্ষে তাহা উঠান অসাধ্য হয়, তখন এই lever দিয়া তাহা উঠান হয়। (৬ নং চিত্র)

৭। Stirrup—ইহা lever হইতে ঝুলান থাকে এবং Brace-head ও leverএর মধ্যস্থলে থাকে।

১। Percussive Boring :—

লৌহদণ্ড (Bore-rod) দ্বারা প্রস্তর কাটিয়া গর্ত্ত করা হয়। Bore-rodএর নিম্নে Chisel থাকে এবং উপরে Brace-head থাকে, যাহা দ্বারা Bore-rod উঠান কিম্বা নামান হয়। প্রস্তর কাটিবার সময় ২ বা ৪ জন লোক Brace-head ধরিয়া কিছু দূর উত্তোলন করে; তার পর সেখান হইতে জোরে ছাড়িয়া দেয় এবং Chisel দ্বারা প্রস্তর কাটিয়া যায়। গর্ত্ত গোলাকার করিবার জন্য Bore rod উঠাইবার সময় উপরের লোকগুলি Brace-headএর
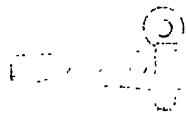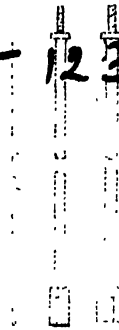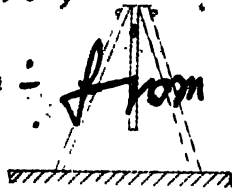
উপরের বামপার্শ্ব হইতে যথাক্রমে ১, ২, ৩ নং চিত্র ও নিম্নের বামপার্শ্ব হইতে ৪, ৫, ৬ নং চিত্র

হাতল ধরিয়া একটু ঘুরাইয়া লইয়া তবে উপরে উঠায়। কিছুক্ষণ কার্য্য করিবার পর Bore-rodগুলি উপরে উঠাইয়া তাহার নিম্নের Chisel খুলিয়া সেখানে Sludger পাঠাইয়া, তাহার দ্বারা নীচের কর্ত্তিত অংশ উপরে উঠানহয়।

Sludger দ্বারা উত্তোলিত প্রস্তরগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া, কিরূপ স্তরের পর স্তর কিরূপ পাওয়া যায়, তাহা Note-Bookএ লিখিয়া রাখা হয়; এবং সর্ব্বশেষে সেই Note-book দেখিয়া খনির সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারা যায়।

২। Rotary Boring—ইহার মধ্যে Diamond Drill Boringই প্রধান। Boringএর যন্ত্রের মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট। ইহাতে Bore rodএর নিম্নে Core-tube থাকে এবং তাহার ভিতর কর্ত্তিত প্রস্তরাংশ থাকে। Core-tubeএর নিম্নে হীরক বসানো একটী ছোট চোঙ্গ (Cylinder) থাকে। ইহাকে Crown বলে। এই হীরকের রং কালো ও ইহা অল্প মূল্যের। ইহা সাধারণতঃ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে আনীত হয়। Bore-rod একটী Engine দিয়া ঘূর্ণিত হয় এবং সেই সঙ্গে Crownটিও ঘুরে এবং ইহার উপরকার হীরকগুলির দ্বারা নীচের প্রস্তর কর্ত্তিত হইতে থাকে। সেই কর্ত্তিত অংশ Core-tubeএর ভিতর উঠিতে থাকে। যখন Crown ঘুরিতে থাকে, তখন Bore-rodএর ভিতর দিয়া জল দেওয়া হয়, যাহাতে Crownটিকে শীতল রাখে এবং সেই জলস্রোতে

Bore-rodএর পার্শ্বস্থিত ছোট-ছোট প্রস্তরাংশকে উপরে তুলে। কিছুদূর কাটা হইলে উপর হইতে সব নল-গুলিকে টানিয়া তুলা হয় এবং Core tubeএর ভিতর হইতে কর্ত্তিত অংশ বাহির করিয়া ঠিক পরে-পরে সজ্জিত করিয়া রাখা হয়। ইহার দ্বারা উপর হইতে কয়লার স্তর পর্য্যন্ত প্রস্তরের স্তর কিরূপ ভাবে আছে, তাহা সুন্দর রূপে বুঝিতে পারা যায়।

ইহার খরচ মোটের উপর প্রতি ফুটে ৫।৹ টাকা আন্দাজ পড়ে।

কোথায় ও কত নীচে কয়লা আছে, তাহার ঘনতা (thickness) কিরূপ, তাহার উপরে কিরূপ প্রস্তরের স্তর আছে, ইত্যাদি বিষয় এতক্ষণে আমরা জানিতে পারিলাম। এখন সমস্যা এই যে, কি উপায়ে ঐ কয়লা কাটিলে সুবিধা হইবে। সুবিধার অর্থ খরচ কম হইবে এবং তাহা হইলেই বেশী লাভ হইবে। মনে থাকে যেন, ইহা ব্যবসায়ের জিনিস; সুতরাং সর্ব্বদা খরচের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

আমাদের এখানে তিন প্রকারে কয়লা কাটা হয়।

১। Quarry working (পুকুরে খাদ)

২। Incline সিঁড়িখাদ)

৩। Pit (কুয়াখাদ)

১। Quarry working: ইহা অনেকাংশে পুষ্করিণী খনন করার মত। যতক্ষণ কয়লা-স্তরে পৌছান না যায়, ততক্ষণ উপর হইতে প্রস্তর ও মৃত্তিকা কাটিয়া দূরে ফেলা হয়। তৎপরে কয়লা স্তরে পৌছিলে, মাটী কাটার মত কয়লা কাটিয়া ঝুড়ি করিয়া উপরে আনা হয়। এই উপায়ে কয়লা কাটিতে গেলে, যাইতে খরচের ভাগ বেশী না পড়ে, সেজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রাখা হয়—

(১) কয়লা-স্তর পুরু হওয়া চাই—

(২) যে জমি লওয়া হইয়াছে, তাহা কয়লা-স্তরের strike lineএ হওয়া চাই; কারণ lineএ হইলে অনেক মৃত্তিকা ও প্রস্তর তুলিতে হয়।

(৩) কয়লা-স্তর ভূপৃষ্ঠের খুব নিকট হওয়া চাই।

ইহার অসুবিধা।—

(১) বর্ষাকালে জল জমিয়া বিশেষ অসুবিধা হয়।

(২) উপরের মাটি কাটিয়া দূরে ফেলিতে হয়। অন্য উপায়ে হইলে উপরে চাষ ইত্যাদি অনায়াসে চলিতে পারিত।

(৩) বর্ষাকালে পার্শ্বের পাড় ভাঙ্গিয়া ভিতরে পড়ে।

২। Incline working (সিঁড়ী খাদ)

ইহাকে সিঁড়ী খাদ বলে। ইহাতে উপর হইতে বরাবর ঢালু করিয়া কয়লা-স্তরের নীচে পর্য্যন্ত কাটিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেখান হইতে কয়লা কাটিয়া উপরে মাথায় করিয়া বহিয়া আনে; কিম্বা নীচেই টব গাড়ীতে বোঝাই দেয়। কয়লা তুলিবার জন্য একপ্রকার ছোট-ছোট গাড়ী আছে, তাহাকে টবগাড়ী বলে; এবং সেই গাড়ী যাতায়াতের জন্য উপর হইতে খাদের তল পর্য্যন্ত বরাবর লাইন (ইহাকে Tram line বলে) বসান থাকে। নীচে মালকাটারগণ (যাহারা কয়লা কাটে) কয়লা কাটিয়া টবগাড়ীতে বোঝাই দেয়। তাহার পর উপর হইতে Engine দিয়া টানিয়া তোলা হয়। ইহা টানিবার যে রজ্জু ব্যবহৃত হয়, তাহা লোহার তারের দ্বারা প্রস্তুত; এবং খনিতে এই রজ্জুই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খনিতে সাধারণতঃ পুরুষে কয়লা কাটে ও মেয়েরা বোঝাই দেয়। এক-একটী পুরুষের সহিত একটী করিয়া মেয়ে থাকে এবং উভয়কে লইয়া এক গাঁইতি বলে। যদি ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মেয়ে কাজ করে, তবে ৫গাঁইতি কাজে লাগিয়াছে বলিবে। গাঁইতি অনেকে রাস্তা খুঁড়িবার সময় দেখিয়া থাকিবেন। ইহারা কয়লা কাটে। খাদের যেখানে টবগাড়ী বোঝাই হয়, সেখান হইতে Engine ঘর পর্য্যন্ত একটি লৌহতারের সিগন্যাল থাকে,—গাড়ি বোঝাই হইলে 'মালকাটাররা' ইহার সাহায্যে Engine খালাসিকে Engine চালাইবার সঙ্কেত করে।

সিঁড়ি খাদের অসুবিধা।—

১। উপর হইতে অধিক পরিমাণে জল গড়াইয়া খাদের ভিতর প্রবেশ করে।

২। কয়লা কাটিয়া লইয়া যাইবার সময় মালকাটার-দিগকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে উপরে উঠিতে হয়।

৩। ইহাতে খালি টব নামান ও বোঝাই টব তোলা একসঙ্গে হয় না। সে জন্য বোঝাই টব তুলিয়া তবে খালি টব নামান হয়; তাহাতে অনেক সময় নষ্ট হয়।

সিঁড়ি খাদের স্থান-নির্দ্দেশ কালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ক—এঞ্জিন ঘর

খ—লৌহ রজ্জু

গ—ট্রাম লাইন

ঘ—Friction roller

ঙ—ইষ্টকের খিলান

চ—কয়লা-বোঝাই টব্ গাড়ী

ছ—কয়লা

জ—শিলাস্তর
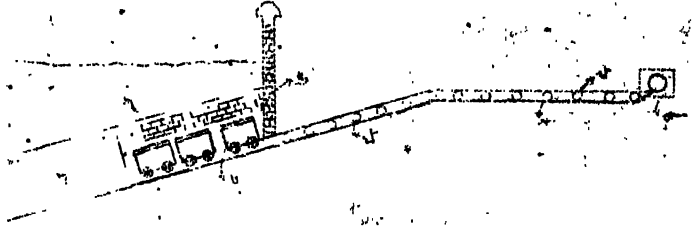
সিঁড়ি-খাদের চিত্র

১। ইহা অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে কাটা উচিত। কারণ, তাঁহা হইলে উপরের সব জল ভিতরে ঢুকিতে পারে না।

২। অপেক্ষাকৃত শক্ত জমিতে কাটা উচিত, যাহাতে উভয় পার্শ্বের মাটী ভাঙ্গিয়া না পড়ে।

৩। ইহা জমির এমন স্থানে কাটা উচিত, যেখান হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কয়লা পাওয়া যাইতে পারে।

৪। ইহা রেলওয়ে ষ্টেসনের যত নিকটে হয় ততই ভাল; কারণ তাহাতে চালান দিবার সুবিধা হইবে।

সিঁড়ি খাদ dip-lineএর দিকে কাটিতে হইবে। তার পর উপর হইতে নীচে যতদূর পর্য্যন্ত কঠিন প্রস্তর না পাওয়া যায়, ততদূর পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বে ইষ্টকের প্রাচীর দেওয়া হয় ও উপরিভাগে খিলান করা হয়; যাহাতে উপরিভাগ বা পার্শ্বদেশ হইতে মাটি ভাঙ্গিয়া না পড়ে। সিঁড়ি খাদ এরূপ ঢালু হওয়া উচিত, যাহাতে টব গাড়ীর সংলগ্ন রজ্জু বরাবর ভূমি স্পর্শ করিয়া যায়। ভূমির উপর ঘর্ষণ দ্বারা রজ্জু খারাপ হইয়া না যায়, এজন্য Tram lineএর মধ্যে ২৫।৩০ ফিট অন্তর একটী করিয়া Friction roller থাকে। এই rollerএর উপর রজ্জু থাকাতে তাহা ঘর্ষণ দ্বারা তত শীঘ্র নষ্ট হয় না।

৩। Pit (পিট্ খাদ)

ইহা কূপের ন্যায়। উপর হইতে কূপ খনন করার ন্যায় কয়লা-স্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত খনন করা হয়। কঠিন প্রস্তর সকল, যাহা কোন অস্ত্রের দ্বারা খনন করা যায় না, তাহা ডিনামাইট্ ইত্যাদির দ্বারা ফাটাইয়া খনন করা হয়। উপর হইতে কঠিন প্রস্তরের উপরিভাগ পর্য্যন্ত ইষ্টকের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করা হয়, যাহাতে পার্শ্ব ভাঙ্গিয়া না পড়ে, এবং ভিতর হইতে জল চুয়াইয়া আসিতে না পারে। ইহাতে অবশ্য সিঁড়ি খাদের ন্যায় হাঁটিয়া উপর উঠিবার কোন উপায় নাই। ইহার গভীরতা আমাদের এখানে ১৫০।২০০ ফিট হইতে ১০০০।১২০০ ফিট পর্য্যন্ত দেখা যায়।

পিট্ খাদের উপরে কাষ্ঠের বা লৌহের কাঠাম থাকে; তাহাকে Head gear বলে। ইহার উচ্চতা পিটের গভীরতার উপর নির্ভর করে। Head-gearএর উপর বড়-বড় দুটি কপিকল (Pulley wheel) থাকে। তাহাদের ব্যাস ৪ ফিট হইতে ২০ ফিট পর্য্যন্ত হয় এবং ইহা লৌহরজ্জুর পরিধির উপর নির্ভর করে। Headgearএর নিকটেই Engine-ঘর থাকে। Engineএর Drumএর গায়ে রজ্জু জড়ান থাকে, এবং ঐ রজ্জুর দুই প্রান্ত উপরি-উক্ত Pulley wheel দুটির উপর দিয়া পিট-মুখেস্থিত দুটি লৌহ-পিঞ্জরের উপর সংলগ্ন থাকে। যখন Engine চলে, তখন Drumএর এক প্রান্তের রজ্জু ইহার উপর জড়াইতে থাকে এবং অপর প্রান্ত ঢিলা হয়। সুতরাং ইহা দ্বারা একটী পিঞ্জর যখন খাদের নীচে যায়, তখন অপরটি উপরে উঠে। এই পিঞ্জরের আকার পিট্এর আকারের উপর নির্ভর করে। Pitএর আয়তন এইরূপ হইবে, যাহাতে দুইটি পিঞ্জর পাশাপাশি যাইতে পারে এবং তদ্ভিন্ন খাদের ভিতর উষ্ণজলোত্থিত বাষ্প (steam) ইত্যাদি লইয়া যাইবার জন্য উভয় পার্শ্বে স্থান থাকে। এই পিঞ্জর দ্বারা খাদের ভিতর হইতে একটী বোঝাই টব উপরে আনা হয়, এবং একই সময়ে অন্যটি দ্বারা একটী খালি টব নীচে পাঠান হয়। লোকজনও ইহার ভিতর চড়িয়া খাদে যাতায়াত করে।

Position of Shaft (স্থান-নির্দ্দেশ)

Boring ইত্যাদি দ্বারা কয়লা-স্তরের যথেষ্ট সন্তোষজনক প্রমাণ পাইবার পর, পিট খাদ খনন করিতে আরম্ভ করা হয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে, কোথায় উহার স্থান নির্দ্দেশ করিলে সকল দিকে সুবিধা হইবে, তাহা দেখা উচিত।

১। গহ্বরটি জমির এরূপ স্থলে হওয়া উচিত, যেখানে হইতে সকল দিকের কয়লা লওয়ার সুবিধা হইবে।
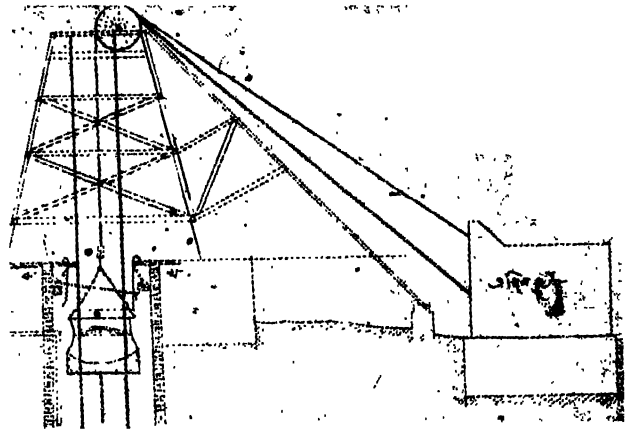
পিট খাদের উপরের চিত্র
'ক' 'খ,—গহ্বর মুখ
(লৌহ পিঞ্জর ভিতর হইতে উপরে আসিয়া 'ক' 'খ' এর নিকটে থাকে)

২। ইহা কয়লা স্তরের Dipএর শেষের দিকে থাকা উচিত (সাধারণতঃ ⅓ উপরের দিকে ও ⅔ Dipএর দিকে)। ইহার সুবিধা এই যে, উপরের দিকে যে কয়লা কাটা হইবে, তাহা টব বোঝাই হইলে লাইনের উপর দিয়া আপনি গড়াইয়া নীচে আসিতে পারিবে।

৩। ইহা রেলওয়ে ষ্টেশনের যত নিকটে হয়, ততই ভাল। তাহা হইলে কয়লা চালান দেওয়ার খরচ কম হয়।

৪। যে স্থানে ইহা খনন করা হইবে, সে স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ হওয়া আবশ্যক। ইহাতে উপরের জল সব গড়াইয়া ভিতরে যাইতে পারে না; এবং তদ্ভিন্ন জমি উচ্চ হইলে সেখান হইতে টব গাড়ী বিনা আয়াসে গড়াইয়া নীচের জমিতে যাইতে পারিবে।

(একটী পিটগহ্বর অন্ততঃ ২০ বৎসর স্থায়ী হওয়া উচিত।)

ইহার পর দেখিতে হইবে, সেই জমিতে কাজ করিবার জন্য কতগুলি ও কি আয়তনের গহ্বরের দরকার হইবে। Mines Act অনুসারে প্রত্যেক খাদে অন্ততঃ ২টি গহ্বর (Shaft) রাখিতে হইবে; এবং ঐ দুইটির মধ্যে যতদিন সংযোগ না হয়, তত দিন খাদের কাজ চলিতে পারিবে না। দুইটি গহ্বর রাখার প্রধান উদ্দেশ্য বায়ু-চলাচল (ventilation)। খাদের ভিতর বায়ু-চলাচল না হইলে তাহার ভিতর কায করা অসম্ভব। ইহার বিষয় পরে বলা যাইবে।

সময়ে-সময়ে ২টার অধিক গহ্বর করিলে কাযের সুবিধা হয়; কিন্তু তাহা খরচের উপর নির্ভর করে। যদি খুব গভীর করিতে হয়, তবে ২টার অধিক রাখা সম্ভব হয় না।

খাদের গহ্বরের আয়তন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

১। প্রতিদিনের প্রাপ্ত কয়লার পরিমাণ

২। জমির আয়তন।

যদি জমি বেশী হয় এবং প্রতিদিনের প্রাপ্ত কয়লার পরিমাণও বেশী হইবে বলিয়া বোধ হয়, তবে গহ্বরের আয়তনও সেই অনুসারে বেশী করিতে হইবে।

৩। টব গাড়ী ও লৌহ পিঞ্জরের আকার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পাশাপাশি ২টা লৌহপিঞ্জর থাকিবে। তদ্ভিন্ন জলীয় বাষ্প (steam) যাইবার ও নিচের জল দমকলের (pump) সাহায্যে উপরে তুলিবার জন্য নল ইত্যাদির জন্য স্থান রাখিতে হইবে।

পিট গহ্বরের ব্যাস সাধারণতঃ ৮ ফিট হইতে ১৪ ফিট পর্য্যন্ত হয়।

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

মাঘ ও ফাল্গুন মাসের "ইঙ্গিত" পাঠ করিয়া অনেকেই অনুগ্রহ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। সে জন্ত আমি তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ইহার মধ্যে একটু দুঃখের কারণ ঘটিয়াছে। কয়েকজন পত্র-লেখক এমন সব জিনিসের সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন, যাহা তৈয়ার করিতে একটুও পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করিতে হয় না; অথচ ঘরে বসিয়া জলের মতন অর্থোপার্জ্জন করিতে পারা যায়। তাঁহাদিগকে দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথ এতটা সোজাও নহে, সহজও নহে। এরূপ ফাঁকির ব্যবসায় যে একেবারেই নাই এমন নহে; কিন্তু সেরূপ ব্যবসায় কখনও স্থায়ী হয় না। তাহাতে প্রথম-প্রথম কিছু-কিছু উপার্জ্জন হইলেও, ক্রমে তাহা কমিয়া আসে; অবশেষে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কারণ, এই সব সহজ জিনিসের secret বেশী দিন গোপন রাখা যায় না, অল্প আয়াসেই তাহা লোকে ধরিয়া ফেলিতে পারে; এবং সহজ দেখিয়া, অনেকেই ঐরূপ এক-এক দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। কাজেই লাভের অংশটা অনেকের মধ্যে ভাগা-ভাগি হইয়া যাওয়ায় 'চটকস্ত মাংসং ভাগশতং' হইয়া পড়ে।

ব্যবসায় করিতে হইলে, মূলধন না থাকে, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা থাকা চাই; মনের দৃঢ়তা, অধ্যবসায় না থাকিলে ব্যবসায় মোটেই চলে না। একটা বিষয়ে লাগিয়া থাকিবার (sticking to the bush) মত চিত্তস্থৈর্য্য থাকা নিতান্তই আবশুক।

আবার বলি, geometryর মত, There is no royal road to trade, commerce, manufacture। আর একটা প্রধান কথা এই যে, ব্যবসায় করিতে হইলে অনেক মাথা খাটাইয়া নূতন-নূতন ফন্দী বাহির করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, যে সব জিনিস নষ্ট হইয়া যাইতেছে; সেই সকল জিনিসকে কাজে লাগানোই অর্থোপার্জ্জনের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ উপায়। কারণ, এই রকম নূতন জিনিসের ব্যবসায়ে গোড়ায় মোটেই প্রতিযোগিতা থাকে না। জিনিসটা যদি লোকের প্রয়োজনীয় হয়, এবং তাহার ব্যবসায় ক্ষেত্রে যদি প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে, তবে সে ব্যবসায়ের মালিক যে সহজেই ধনী হইতে পারিবেন, ইহা ত খুব সোজা কথা; এ কথা সকলেই বুঝিতে পারেন। যাক্, এখন একটু কাজের কথা হউক।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কিসে কি হয়, কি রকমে এক কাজ করিতে গিয়া আর এক কাজ হইয়া যায়, কি রকমে এক জিনিস তৈয়ার করিবার জন্য পরীক্ষা করিতে-করিতে অপ্রত্যাশিত রূপে আর একটা ভাল জিনিস তৈয়ার হইয়া যায়, সে বড় আশ্চর্য্য, আর ভারি মজার কথা।

আজকাল খাকি রংয়ের পোষাক সর্ব্বসাধারণের বড় আদরের জিনিস হইয়া উঠিয়াছে। এই খাকি রংয়ের সৈনিকের পোষাক যুদ্ধে খুব কাজ দিয়াছে। খাকি রংটি অতি আশ্চর্য্য এবং অপ্রত্যাশিত উপায়ে বাহির হইয়া পড়ে। যাঁহার দ্বারা এই মহৎ আবিষ্ক্রিয়া হয়, তিনি খাকি রং তৈয়ার করিবার কল্পনাও কখনও করেন নাই। তিনি কতকগুলি রঞ্জন পদার্থ লইয়া অন্য কোন একটা পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। নানা জিনিস পরস্পর মিশাইতে-মিশাইতে খাকি রংটি বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও, তিনি কত বড় একটা আবিষ্কার যে করিয়া ফেলিলেন, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যাহা চাহেন, উহা তাহা নহে দেখিয়া, প্রথমে উহার প্রতি একটুও মনোযোগ দেন নাই। এমন কি, তাঁহার প্রয়োজনীয় জিনিস নয় বলিয়া, কোন্-কোন্ জিনিসের কিরূপ ভাগের মিশ্রণে এই খাকি রংটি উৎপন্ন হইল, তাহাও তিনি লক্ষ্য করেন নাই; এবং সেজন্ত তাহা তিনি note করিয়া রাখেন নাই। পরে, তাঁহারই হউক, কিম্বা তাঁহার সহকারী বা বন্ধু অপর কোন লোকেরই হউক, মনে হইল, ঐ নূতন রংটি অতি বিচিত্র; উহাকে কাজে লাগাইতে পারা যায়। তখন খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ! কিন্তু কিসে কি হইল, তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে আবার নূতন করিয়া হাজার-হাজার

পরীক্ষার পর রংটি আবার বাহির হইল। খাকি রংয়ের ভাগ্য ভাল যে, আবিষ্কারকের মনে ইহার প্রয়োজনীয়তার কথা শুভক্ষণে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানাগারে এমন কত শত-শত জিনিষ পরীক্ষাকালে উৎপন্ন হয়, অথচ, তাহার কথা কাহারও মনে থাকে না। থাকিলে হয় ত এক সময়ে না এক সময়ে ঐ জিনিসগুলি কত না কাজে লাগিতে পারিত।

একবার লেখকের ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারেও এইরূপ সামান্য একটু ব্যাপার ঘটিয়াছিল। স্বদেশীর পূর্ণ প্রভাবের সময় যখন দেশময় স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের এবং বিদেশী জিনিস পোড়াইবার ঘটা পড়িয়া গিয়াছিল, তখন ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে নানা জিনিস কলিকাতায় আমদানী হইতে আরম্ভ হয়। সেই সূত্রে শ্লেট-পেন্সিলও আসিয়াছিল। কিন্তু সে পেন্সিলগুলি অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ।

তৎপূর্ব্বে আমি একবার আমার এক আত্মীয়ার নিকট হইতে ৺পুরীধাম হইতে আনীত শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের একরূপ ছোট-ছোট খুব মিশ্‌মিশে কালো, খোদাই-করা মূর্ত্তি উপহার পাইয়াছিলাম। কি রকমে মনে নাই,—সেই মূর্ত্তির একটা কোণ দিয়া পাথরের শ্লেটের উপর হয় ত অন্যমনস্ক ভাবেই দাগ কাটিয়াছিলাম। দেখিলাম, দিব্য পেন্সিলের মত দাগ পড়িতে লাগিল, এবং জল দিয়া বেশ মুছা যাইতে লাগিল। তখন তাহা আমার একরূপ পেন্সিলের কাজ করিতে লাগিল। আমার মনে হইয়াছিল, ঐ মূর্ত্তিগুলি মাটীর,—পোড়াইয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। কেহ-কেহ বলিয়াছিলেন, না, উহা নরম পাথরের,—খোদাই-করা। কিন্তু ভাঙ্গিয়া দেখা গেল, বাহিরের রং আর ভিতরের রং একরূপ নহে; এবং তখনও আরও মনে হইল, উহা মাটীর হওয়াই খুব সম্ভব।

সে যাহাই হউক, সেই বিশ্বাসে, স্বদেশী পেন্সিলের ঐরূপ ভঙ্গপ্রবণতা দেখিয়া, আমার মনে হইল, পুরী অঞ্চলে ঐরূপ মাটী পাওয়া যাইতে পারে, এবং তাহা লইয়া পেন্সিলের কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে। তখন আমি আমার এক পুরী-প্রবাসী আত্মীয়কে ঐ সকল কথা লিখিয়া, কিছু মাটী পরীক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় আমার কাছে পাঠাইয়া দিতে লিখিলাম। তিনি একঝুড়ি মাটী কলিকাতায় আসিবার সময় সঙ্গে লইয়া আসিলেন। সেই মাটীগুলি ডেলা-ডেলা, খুব শক্ত, এবং সাদা রংয়ের। আমি দুই চারিটা ডেলা ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া জল মিশাইয়া কাদার মত করিলাম। মাটীতে জল মিশাইবার সময় উহা হাতে আঠার মত (যেমন সাজিমাটীর ভিতর হইতে বাহির হয়) ঠেকিতে লাগিল। যাহা হউক, কিছু ঐ কাদা পেন্সিলের আকারে গড়িয়া, আগুণে পুড়াইয়া লইলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে পেন্সিল হইল না। কিন্তু কি হইল বলুন দেখি? পুড়িয়া তাহা পাথরের মত শক্ত হইয়া গেল। আমি তখন আরও কিছু কাদা গুলির আকারে গড়িয়া আবার পোড়াইয়া লইলাম। দিব্য (ছেলেদের খেলিবার) মার্ব্বেলের গুলি তৈয়ার হইয়া গেল। আমার আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, পুরীর কাছে কি একটা পাহাড়ের পাদদেশের একটা পতিত মাঠ হইতে তিনি ঐ মাটী কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন। আমি যে মার্ব্বেলের গুলি প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহা porus হইয়াছিল। জলে ফেলিলে তাহা জল শোষণ করিত, এবং পরে শুকাইয়া যাইত। কিন্তু পাথরের মত শক্ত বরাবরই থাকিত। ঐ মাটীর সঙ্গে কিছু kaolin মাটীর sizing দিলে আর উহা জল শোষণ করিবে না। তখন তাহা হইতে চীনা-মাটীর সকল প্রকার বাসন প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে; অন্ততঃ মার্ব্বেলের গুলি ত স্বচ্ছন্দে হইতে পারে, এবং তাহা করা খুব শক্ত বলিয়া মনে হয় না। গুলি প্রস্তুত করিবার কলও সংগ্রহ করা খুব শক্ত নয়। কবিরাজ এবং ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্ট মহাশয়েরা ঔষধের গুলি প্রস্তুত করিবার জন্য বোধ হয় ঐ রকম কল ব্যবহার করেন। ছেলেদের মার্ব্বেল খেলিবার গুলি বেশ একটা সুন্দর পণ্য, এবং তাহাও বিদেশ হইতে আসিয়া থাকে। চেষ্টা করিলে কেহ-কেহ বোধ হয় এই ব্যবসায়ে হাত দিতে পারেন।

বাঙ্গালার জল-হাওয়ায় এই মাটীর গুণ বদলাইয়া যায়। কেহ ইহা হইতে ব্যবসায়ের জন্য কোন কিছু প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিলে, পুরীর কাছাকাছি কোথাও কারখানা স্থাপন করিলে ভাল হয়। ইহা হইতে আরও একটা কাজ হইতে পারে। ইহা হইতে উত্তম imitation stoneএর টালি (slab) তৈয়ার হইতে পারে। তবে জলশোষকতা নিবারণের জন্য ইহার সহিত অন্য কিছু মিশাইয়া লইতে হইবে।

এখন, পেন্‌সিলের ভাগ্যে কি ঘটিল? প্রথম পরীক্ষার এইরূপ ফল দেখিয়া আর পরীক্ষায় হাত দিই নাই। তবে সন্ধান করিতে-করিতে জানিতে পারিয়াছিলাম, কুমারটুলির কুমারেরা পোড়াইবার কায়দায় গঙ্গার পলি মাটী হইতে চমৎকার পেন্‌সিল তৈয়ার করিয়া দিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাহাকেও এই কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারি নাই। তাহারা দেবমূর্ত্তি গড়ে,—পেন্‌সিলের মত তুচ্ছ কাজে হাত দিতে রাজী নয়।

মার্ব্বেলের গুলির কথায় ছেলেদের খেলানার কথা আসিয়া পড়িতেছে। খেলানা প্রস্তুত করা মস্ত বড় একটা ব্যবসায়। প্রতিবর্ষে প্রত্যেক দেশে কোটী-কোটী টাকা এই খেলানা প্রস্তুত ও তাহার ব্যবসায়ে খাটিয়া থাকে। আগে জার্ম্মাণী পৃথিবীর খেলানার ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল; এখন জার্ম্মাণীর হাত-পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে এবং জাপান পৃথিবীর খেলানার বাজার capture করিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ ষ্টেটস্‌ খেলানার বিষয়ে কিরূপে জাপানের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, তাহার বিবরণ সম্প্রতি Scientific American পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন কলিকাতার পথে-ঘাটে জাপানী খেলানার ছড়াছড়ি যাইতেছে।

খেলানা প্রস্তুত করা যেমন মস্ত বড় ব্যবসায়, তেমনি খুব শক্ত ব্যবসায়ও বটে। ছেলেদের মত খামখেয়ালী জীব পৃথিবীতে আর নাই। তাহাদের Imagination capture করাও তেমনি সহজ নহে। অনেক মাথা ঘামাইয়া ছেলেদের মনের মত খেলানা প্রস্তুত করিতে হয়।

ছেলেদের খেলানা প্রস্তুত করা সম্বন্ধে অনেক ভাবিবার কথা আছে। খেলানা জিনিসটি শুধুই খেলানা নয়, উহা মানবদিগের ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করে। বিশেষ বিশেষ খেলানা ছেলেদের হাতে পড়িয়া তাহাদের মানুষ করিয়াও গড়িয়া তুলিতে পারে, আবার পশু করিয়াও গড়িয়া তুলিতে পারে। দেশের এবং জাতির প্রতি একটু মায়া-মমতার দাবী যাঁহারা করিতে পারেন, কেবল তাঁহারাই ছেলেদের খেলানা প্রস্তুত করিবার যোগ্য লোক।

ছেলেদের খেলানা প্রথমতঃ খুব চটক্‌দার রংচঙে, চক্‌চকে হওয়া দরকার—যেন প্রথম দর্শনেই ছেলেদের মন ভুলাইতে পারে। ছেলেদের মনের মতন খেলানা হইলে, বিক্রয়ের জন্য ভাবিতে হয় না। ছেলেদের আব্দার, বায়না, জেদ, কান্নাহাটি,—তাহাদের খেলানা আদায় করিবার কত-শত কৌশল! তার পর, এই খেলানা যেন দামী না হয়। প্রথমতঃ, ব্যবসায়ের সাধারণ নিয়মানুসারে যে জিনিসের দাম যত কম, তাহার বিক্রয় তত বেশী,—এই হিসাবে খেলানার দাম খুব কম হওয়া চাই; দ্বিতীয়তঃ, দামী খেলানা হইলে ছেলেদের বাপেদের উপর বড় বেশী জুলুম করা হইবে, বিশেষতঃ, এই মাগ্‌গী-গণ্ডার দিনে। খেলানা দামী হইলে ছেলেদের ভাগ্যে খেলানার বদলে প্রহার লাভ হইতে পারে, অথচ, তাহাতে বিক্রেতার সিকি পয়সাও লাভ নাই। বিশেষতঃ ছেলেদের হাতে খেলানার পরমায়ু বেশীক্ষণ নয়, এক আধ ঘণ্টা মাত্র। সেইজন্য দাম যথাসম্ভব কম হইলেই ভাল হয়। তবে দামী খেলানাও কিছু কিছু চাই, ধনীসন্তানদের জন্য। ধনী ব্যক্তিরা আবার কম দামের খেলানাও পছন্দ করেন না। আর যদি খেলানাটি খুব টেঁকসই হয়, দু'চার মাস টিঁকিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে দাম কিছু বেশী হইলেও ক্ষতি নাই।

খেলানার অনেক শ্রেণী-বিভাগ আছে। মাটীর, টীনের, কাঠের—এই রকম একটা শ্রেণী-বিভাগ হইতে পারে; আবার, তাহাদের ব্যবহারের দিক দিয়াও অপর একটা শ্রেণী-বিভাগ হইতে পারে; যেমন (১) মেয়েদের গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি, যথা, হাঁড়ী, কুঁড়ী, কড়া, বেড়ী, ইত্যাদি। (২) পুতুল। (৩) ঘরের আসবাব, যথা, বাক্স, পেঁড়া, তোরঙ্গ, আলমারি ইত্যাদি। (৪) জীবজন্তু। (৫) ফলমূল, শাক তরকারী ইত্যাদি। ছেলেদের (১) ক্রীকেট, টেনিস, ব্যাটবল। (২) ছেলেরা স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া সবল ও দৃঢ়কায় হইতে পারে এমন খেলানা, যথা, miniature রামমূর্ত্তি, শ্যামাকান্ত, স্যাণ্ডো, ভীমভবানী এবং বক্সি, খেলোয়াড় বা কুস্তি বেশে পালোয়ান, প্রভৃতির পুতুল। টীনের বা সীসার বা দস্তার ঢালাইকরা তরবারি, ধনুক, বন্দুক, পিস্তল, কামান প্রভৃতি; সিপাহী, গোরা, সৈনিক, ঘোড়-সওয়ার। (৩) সাইকেল, মোটর, এরোপ্লেন প্রভৃতি। (৪) বৈজ্ঞানিক খেলানা, যেমন, রেলের গাড়ী, ঘড়ি, সেলায়ের কল। (৫) ছুতারের যন্ত্র (মেয়েদের গৃহস্থালীর পাল্টা হিসাবে, একটু বয়স্ক বালকদের জন্য) যথা, করাত, বাটালী, মুগুর, র‍্যাঁদা,

বিস্কোপ, ভ্রমর ইত্যাদি। (৬) কামারের যন্ত্র, যথা, হাপর হাতুড়ী, ভাইস, anvil, সাঁড়াসী প্রভৃতি।

ছেলেমেয়েদের 'মানুষ' করিয়া ('মেষ' করিয়া নহে!) গড়িতে হইলে, তাহাদের খেলনার দিকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এখন কয়েকটি মাত্র নাম দিতে পারিলাম। একটু বিবেচনা করিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করিলে, হাজার-হাজার রকম খেলানা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সেই হাজার হাজার খেলানার মধ্যে যে ছেলে যে রকম খেলানা পছন্দ করিয়া লইবে, সেই ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনও অনেকটা সেই ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে বলিয়া মনে হয়। এই খেলানার ভিতর দিয়া, ছেলেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে কত রকমই যে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই খেলানা সামান্য বা অবহেলার জিনিস নয়। দেশের যাঁহারা মাথা, দেশের যাঁহারা যথার্থই মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদেরও ইহা উপেক্ষার বিষয় নয়, বরং যত্ন করিয়া ভাবিবার বিষয়।

খেলানার সম্বন্ধে যতটুকু পারিলাম, ইঙ্গিত মাত্র করিলাম। ইহার recipe দেওয়া বড় সহজ নয়। সামান্য একটু-আধটুমাত্র বলিতেছি।

Papier mache নামক জিনিসের নাম কেহ-কেহ হয় ত শুনিয়া থাকিবেন। যে কোন রকমের কাগজ (ছেঁড়া, অব্যবহার্য্য বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইলেও ক্ষতি নাই) ইহাতে এই papier mache প্রস্তুত হয়। ছেঁড়া কাগজ ছাড়া, papier machea আরও কয়েকটি উপকরণ আছে, যথা, শিরিসের আঠা, প্ল্যাষ্টার অব প্যারিস, জল।

এক ভাগ শুষ্ক কাগজের জন্য তিন ভাগ জল, শুষ্ক প্ল্যাষ্টার অব প্যারিস ৮ ভাগ এবং তরল শিরিস সাড়ে ৪ ভাগ। কাগজ যত ভাল qualityর এবং যতটা সাদা হইবে, papier macheও তত উৎকৃষ্ট হইবে। ভাল qualityর কাগজের অণুগুলি খুব সূক্ষ্ম, ও ক্ষুদ্র হয়। আর, papier macheতে রং ব্যবহার করিতে হইলে, কাগজ যত সাদা হইবে, রং তত বেশী খুলিবে। কাগজ মলিন হইলে রং ভাল খুলিবে না। সাদা ব্লটিং কাগজ papier mache প্রস্তুত করিবার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ যাহা দিতেছি, তাহা মোটামুটি ভাগ। উপকরণের quality অনুসারে ভাগের একটু ইতর-বিশেষ করিতে হয়। সেটা অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ,—বলিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। এই উপকরণের দুই-একটা বদলানোও যায়। যথা, শিরিসের বদলে আমরা পূর্ব্বে যে গালার রসের ইঙ্গিত করিয়াছি, তাহাও ব্যবহৃত হইতে পারে; এবং সুবিধা হইলে সেইটাই ব্যবহার করা ভাল।

প্রথমে কাগজগুলিকে যতটা পারেন সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম করিয়া কাটিয়া লউন। হামানদিস্তায়, কিম্বা বেশী হইলে ঢেঁকিতে, অথবা যন্ত্রের সুবিধা থাকিলে দুইটা লোহার রোলারের ভিতর দিয়া পিষিয়া লইয়া, কিম্বা খড়-কাটা কলের মত কোন যন্ত্রের সাহায্যে যতটা পারেন সূক্ষ্ম করিয়া কাটিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ, কাগজের অণুগুলির সংহতি ভাঙ্গিয়া দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন, ছেঁড়া কাগজই papier mache প্রস্তুত করিবার পক্ষে খুব প্রশস্ত।

এইরূপ প্রস্তুত করা কাগজগুলিকে জলে ভিজিতে দিন; এবং সঙ্গে-সঙ্গে শিরিসের আঠাও তৈয়ার করিয়া লউন। ক্যাবিনেট-মেকাররা যতটা পুরু শিরিসের আঠা ব্যবহার করে, সেই রকম ঘন আঠা হইলেই চলিবে। কাগজগুলি ভিজিলে সেগুলাকে আঙ্গুলে করিয়া পিষিয়া যতটা পারেন সংহতি ভাঙ্গিয়া দিন। একবার সিদ্ধ করিয়া লইলে আরও ভাল হয়। পরে ঐ তরলীকৃত কাগজমণ্ড ছাঁকিয়া লউন। আপনা-আপনি যতটা জল ঝরিয়া পড়ে, তাহাই যথেষ্ট। নিঙড়াইবার দরকার নাই; যেন বেশ ভিজা-ভিজা থাকে। ঐ কাগজের তালটি ন্যাকড়া হইতে তুলিয়া লইয়া একটা পাত্রে রাখুন, এবং তাহার সহিত সিকি পরিমাণ গরম শিরিস মিশাইয়া লউন। খুব উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে, যেন কাগজের ডেলা একটুও না থাকে—সর্ব্বত্র যেন শিরিসটা সমানভাবে মিশানো হয়। মিশানো ও মন্থন করা হইলে বেশ চট্‌চটে একটা জিনিস হইবে। তাহার সহিত ধীরে-ধীরে প্ল্যাষ্টার অব প্যারিস মিশাইতে থাকুন। কিছু প্ল্যাষ্টার অব প্যারিস উত্তমরূপে মিশাইবার পর দেখিবেন, তালটা ক্রমে শুকাইয়া আসিতেছে। তখন আরও সিকি পরিমাণ শিরিস গরম থাকিতে-থাকিতে মিশাইয়া লউন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে শিরিস ও প্ল্যাষ্টার অব প্যারিস মিশাইতে হইবে। এইরূপে যখন সমস্ত উপকরণ সম্পূর্ণরূপে মিশানো হইয়া যাইবে, তখনই একটা papier

macheএর ভাল প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। খুব উত্তমরূপে মিশান চাই। তালটি যদি একটু বেশী শুষ্ক হয়, তবে তাহাতে আরও একটুখানি শিরিসের আঠা কিম্বা সামান্য পরিমাণ জল মিশাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

জিনিসটি দেখিয়া, এবং যে কাজে লাগাইবেন তাহার প্রকৃতি বুঝিয়া, উহার ভাগ এবং প্রস্তুত-প্রণালী ঠিক করিয়া লইবেন। শিরিসের বদলে ময়দার কাই, কিম্বা গালার আঠাও ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। চতুর লোকের হাতে পড়িলে ইহা হইতে সোণা ফলিতে পারে। এই জিনিসটি তৈয়ার করিবার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। কারণ, একবার শুকাইয়া শক্ত হইয়া গেলে, উহাতে আর কোন কাজ হইবে না। কিন্তু যদি রহিয়া-বসিয়া ব্যবহার করিতেই হয়, তবে প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর উহা ভিজা ন্যাকড়ায় জড়াইয়া রাখিবেন এবং মাঝে-মাঝে ন্যাকড়া খুলিয়া ভিজাইয়া আবার জড়াইয়া রাখিবেন, যেন ন্যাকড়া শুকাইয়া না যায়।

Papier mache হইতে ছেলেদের অনেক রকম খেলানা, বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ছাঁচে ফেলিয়া খুব পিষিয়া লইয়া শুকাইতে দিলে, উহা এমন শক্ত হইবে যে, ছেলেদের বেশ মজবুত খেলানা স্বচ্ছন্দে প্রস্তুত হইতে পারিবে। জাপানী পুতুল (doll) ইহা হইতেই প্রস্তুত হয়; কিন্তু বিলাতী doll প্রায় চীনামাটীর হইয়া থাকে। এখানে ভাল রকম কোন কাচের কারখানা না থাকায় dollএর চক্ষু প্রস্তুত করা অসম্ভব বিধায় আমরা doll প্রস্তুত করিবার পরামর্শ দিতে পারিতেছি না। এখানকার কোন কাযের কারখানা যদি dollএর চক্ষু প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে, অথবা এরূপ চক্ষু ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপান হইতে আমদানী করিবার যদি সুবিধা থাকে তবে papier macheর bust (বুকের আধখানা পর্য্যন্ত) এবং পা দুইটী তৈয়ার করিয়া বাকী দেহটা করাতের গুঁড়া-ভরা ন্যাকড়ার দ্বারা তৈয়ার করিয়া তাহাকে সাড়ী বা ধুতি-জামা পরাইয়া দিলে অতি সুন্দর বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ের পুতুল তৈয়ার করা যায়। *

এবার ইঙ্গিত অনেকটা হইয়া গেল; মাননীয় সম্পাদক মহাশয় এতটা সহ্য করিবেন কি না জানি না। সেই জন্য এবার papier mache প্রস্তুত করিবার প্রণালী মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। Papier mache সম্বন্ধে অন্যান্য খবর এবং উহা হইতে যে প্রণালীতে যে সব জিনিস তৈয়ার করা যাইতে পারে, তাহাদের বিবরণ বারান্তরে বলিবার চেষ্টা করিব। এবার এই পর্য্যন্তই থাক।

* Papier mache সম্বন্ধে একখানি অতি সুন্দর পুস্তিকা গবর্ণমেণ্টের পুস্তক-প্রকাশ-বিভাগ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ এই জিনিসটির সম্বন্ধে আরও অধিক সংবাদ জানিতে চাহিলে, ঐ পুস্তিকাখানি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে পারেন।

সাময়িকী

পঞ্জাবের জননায়কগণ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য কলিকাতার মুসলমান ও হিন্দুগণ বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন; বলিতে গেলে, এমন অভ্যর্থনা, এত জনসমাগম ভারত-সম্রাটের কলিকাতার অভ্যর্থনা ব্যতীত আর কখন হয় নাই। কলিকাতার মুসলমানগণই এই অভ্যর্থনার অগ্রণী, হিন্দুগণও ইহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধীরও কলিকাতায় আগমনের কথা ছিল, কিন্তু কার্য্য-গতিকে তিনি আগমন করিতে পারেন নাই। কলিকাতা-বাসিগণ এই জননায়কগণের যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের সেই দুর্দ্দিনের কথা এখনও কেহ ভুলিতে পারেন নাই। পঞ্জাবের নায়কগণ যে অপমান, কষ্ট, কারাযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা অনেক দিন দেশবাসীর মনে

থাকিবে। শুভক্ষণে ভারত-সম্রাটের মহান ঘোষণাবাণী প্রচারিত হইল, তাই ভারতের বিবিধ প্রদেশের লাঞ্ছিত ও অন্তরীণে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ মুক্তিলাভ করিলেন। নূতন ভারত-শাসন-আইন পাশ হইয়া গেল; আগামী শীতকালে যুবরাজ স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়া উক্ত আইন প্রচলিত করিবেন। দেশের লোক কিয়ৎ পরিমাণে শাসনাধিকার লাভ করিলেন, অন্তরীণে আবদ্ধগণের অনেকেই মুক্তিলাভ করিলেন; সকলেই মনে করিলেন দেশে সুবাতাস বহিল, আর কোন প্রকার অশান্তির সম্ভাবনা রহিল না।

কিন্তু, তাহা ত হইল না,—আর এক গোলযোগ—গোলযোগই বা বলি কেন,—বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহা তুরস্ক লইয়া। সকলেই জানেন, তুরস্কের সুলতান মহোদয় মুসলমান ধর্ম্ম-জগতের অধিনায়ক; পৃথিবীর যেখানে যত মুসলমান আছেন, সকলেই সুলতানের নিকট অবনত-মস্তক—সকলেই সুলতানের ক্ষমতা ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। য়ুরোপের বিগত মহা-সমরের সময় তুরস্কের সুলতান জর্ম্মাণ-পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। সে সময় মুসলমান-সমাজে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। তখন ভারতের মুসলমানগণ ভারত-সম্রাটের জয় কামনায় সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন;—যথাসাধ্য অর্থ ও সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। সে সময় বিলাতের মন্ত্রী-সমাজ বলিয়াছিলেন যে, তুরস্কের সুলতান বশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহার রাজ্য, ক্ষমতা ও মর্য্যাদা অব্যাহিত রাখা হইবে। কিন্তু তখন কেহই ভাবেন নাই যে, এই পৃথিবীব্যাপী সমরে শুধু ইংরাজই নহেন, অন্যান্য প্রায় সমস্ত শক্তিপুঞ্জই যোগদান করিয়াছিলেন; যুদ্ধ শেষ হইলে কাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহার নিয়ামক একা ইংরাজ হইতে পারিবেন না, মিত্র-শক্তিপুঞ্জ শান্তি-পরিষদে যাহা ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই সকলকে অবনত-মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং বিলাতের মন্ত্রীসমাজ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্বন্ধে অনেক বিঘ্ন ছিল। এখন সেই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। তুরস্ক সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তাহার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে; বিলাতের মন্ত্রীসমাজ তাঁহাদের পূর্ব্বের মতই জ্ঞাপন করিতেছেন; কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষ তাহাতে সম্মত নহেন। তাঁহারা বলেন য়ুরোপ হইতে তুরস্কের অধিকার লোপ করিতে হইবে; কনষ্টান্টিনোপল হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দিতে হইবে। কেহ বলিতেছেন, রোমের পোপ যেমন নামমাত্র খৃষ্টান-জগতের অধিনায়ক, সুলতানকেও তাহাই করিতে হইবে; মুসলমানের পবিত্র স্থানগুলি ও কিছু ভূ-সম্পত্তি দিয়া তাঁহাকে সাক্ষীগোপাল করিয়া রাখিতে হইবে।

ওদিকে আমাদের ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু স্পষ্টবাক্যে বলিতেছেন—"It Sir Robert Cecil had his way blame would fall upon England, the loyalty of the Moslems in India would be solely tried, and their faith in the British Empire might be imperilled" অর্থাৎ "যদি সার রবার্ট সেসিলের (ইনিই বিরুদ্ধদলের মুখপাত্র) মতেই কাজ হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের স্কন্ধেই দোষ চাপিবে, ভারতের মুসলমান-সম্প্রদায়ের রাজভক্তি ক্ষুণ্ণ হইবে এবং ইংরাজ-রাজের উপর তাহাদের বিশ্বাস অপগত হইবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"In view of India's war services, no country in the world was so entitled to have its wishes considered in this connection as India, and throughout India all who expressed the opinion on the subject, whatever their race or creed; believed that non-interference with the seat of Khalifat was indispensable to external and interval peace of India."—অর্থাৎ "বিগত যুদ্ধে ভারতবর্ষ যে সহায়তা করিয়াছে, সে কথা ভাবিলে ইহা বলিতেই হইবে যে, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ নাই, যে দেশের মতামত ভারতবাসীর মতামতের অগ্রে শ্রবণযোগ্য। তাহার পর দেখিতেছি যে, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে ভারতবর্ষের যাঁহারা এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বিশ্বাস যে, খালিফাতের সম্বন্ধে হস্তার্পণ করিলে তাহাতে ভারতবর্ষের বাহিক ও আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষিত হওয়া অসম্ভব হইবে না।" মিঃ মণ্টেগুর ন্যায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ

রাজনীতিক যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা যে সর্ব্বাংশে সঙ্গত, এ কথা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

ভারতবাসী মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; দেশের সর্ব্বত্র সভাসমিতি হইতেছে; কলিকাতায় ও বাঙ্গালা দেশের মফস্বলেও আলোচনা চলিতেছে; ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় সত্যসত্যই অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের ক্ষোভের কথা কিছুমাত্র গোপন না করিয়া তাঁহারা স্পষ্ট-বাক্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। নানা জনে নানা পন্থা অবলম্বন করিবার পরামর্শ করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মুসলমানদিগের অভিমত অনুসারে যদি এ প্রশ্নের মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে বিশেষ গোলযোগের কথা। ভারত সম্রাটের ঘোষণা-বাণী ও শাসন সংস্কার আইনের দ্বারা দেশের মধ্যে যে শান্তি ও সন্তোষের আশা করা গিয়াছিল, তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতে পারে; এই আশঙ্কাই সকলের মনে উঠিয়াছে। এ সময়ে মিত্রশক্তিপুঞ্জ বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাজ না করিলে, মিঃ মণ্টেগু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বা কার্য্যে পরিণত হয়!

এখন অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাক্। এটী স্বর্গের সংবাদ। অনেকেই বোধ হয় বৈজ্ঞানিক মার্কণীর (Signor Marconi) নাম অবগত আছেন; তারহীন টেলিগ্রাফ উপলক্ষেই তিনি জগৎ-বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি এবং অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিকই কয়েক বৎসর হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন যে, যখন তারহীন বার্ত্তার আদান-প্রদান হয়, তখন আর একটা কি সঙ্কেত সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়;—য়ুরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য অনেক স্থানেই এ সঙ্কেত অনেক সময়ে অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু বিগত যুদ্ধের বিষম গোলযোগে নানা স্থানের পণ্ডিতেরা এই শব্দ বা সঙ্কেতের দিকে এতদিন মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই, কোন আলোচনারও অবকাশ হইয়া উঠে নাই। এখন যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে, গোলা-গুলির গর্জ্জন আর নাই, বৈজ্ঞানিকগণেরও মাথা ঠাণ্ডা হইয়াছে; এখন ঐ সঙ্কেতের কথা উঠিয়াছে।

সকল দেশেই অল্পাধিক সংখ্যায় আমাদের মত সবজান্তা পণ্ডিত আছেন। এই সবজান্তার দল বলিতেছেন, "আরে, রেখে দেও। ও সঙ্কেত-টঙ্কেত কিছু নয়। যে মহাযুদ্ধ হ'য়ে গেল, তাতে কি আর কিছু ঠিক আছে; সব ওলোট-পালোট হ'য়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে যা হবার তা ত দেখ্তেই পাওয়া যাচ্ছে,—গগন-পবন পর্য্যন্ত বারুদে, কামান-বন্দুকের গর্জ্জনে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে গেছে; হয় ত বা দেখ্তে পাবে যে, গ্রহ-নক্ষত্র পর্য্যন্ত আকাশবিহারী যুদ্ধযানের ভয়ে নির্দ্দিষ্ট পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছেন। এই সব বারুদের ধূম, কামানের গর্জ্জন, অন্তরীক্ষ হইতে বজ্র-বর্ষণের জের এখনও ব্যোমপথ হইতে দূর হয় নাই। তারই জন্য ঐ সব শব্দ এখনও তারহীন বার্ত্তাকে বাধা দিচ্ছে। এই বাপু সোজা কথা; এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু প্রয়োজন নাই,—খাও-দাও অকাতরে নিদ্রা দেও।" কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের দল এক ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ; তাঁহরা একটু টুঁ শব্দ শুনিলেই একেবারে কাণ খাড়া করিয়া বসেন,—তাহার কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হন; মাস, বৎসর তাতেই নিবিষ্টচিত্ত হন। তাঁহারা তারহীন বার্ত্তার মধ্যে এই বহু-দূরাগত সঙ্কেতকে 'ও কিছু নয়' বলিয়া উপেক্ষা করিতে শেখেন নাই। এতদিন নানা গোলমালে চুপ করিয়া ছিলেন; এখন আন্দোলন, অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদের উপলব্ধি হইয়াছে। তাই কথাটা উঠিয়াছে।

এই তারহীন বার্ত্তার প্রধান পাণ্ডা যে মার্কণী সাহেব, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত ও ধারণার কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, "আমি অনেক দিন হইতে এ সঙ্কেত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। ইহা শুধু য়ুরোপেই আবদ্ধ নহে, আমেরিকাতেও এ সঙ্কেত চলিতেছে। কোন দুষ্ট লোকে যে কৌতুক করিতেছে, তাহা আমি মোটেই মানি না; কারণ, লণ্ডনেও যেমন এ সঙ্কেত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তেমনই ৩২০০ মাইল দূরবর্ত্তী নিউইয়র্কেও শোনা যাইতেছে।" তিনি আরও বলিতেছেন, যে, "এই সঙ্কেত দুর্ব্বোধ্য হইলেও, একেবারে অসম্বদ্ধ বলিয়া মনে হয় না; কারণ, এই সঙ্কেতের মধ্যে ইংরাজী 'S' অক্ষরের মত একটা আওয়াজ সর্ব্বদাই পাওয়া

যাইতেছে; সুতরাং ইহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন।" তিনি বলিয়াছেন—"As yet we have not the slightest proof as to the origin of the interruption. They might conceivably be due to some natural disturbance at a great distance, such as eruptions on the sun, which might cause electrical disturbance"—মার্কনী সাহেবের কথা কয়টী একেবারে উদ্ধৃত করিলাম। ইহার অর্থ এই যে, "এই গোলমালের সামান্য কোন কারণের সন্ধানও পাই নাই, সামান্য কোনও প্রমাণও এখন পর্য্যন্ত আমরা উপস্থিত করিতে পারিতেছি না। হয় ত সূর্য্যে কোন উৎপাত সংঘটিত হইয়াছে; তাহার ফলে এই বৈদ্যুতিক গোলযোগ হইতেছে; তাহারই জন্য এই প্রকার হইতেছে।"

কিন্তু এই জবাবেই পণ্ডিত মহাশয় অব্যাহতি পান নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,—"আপনি কি এটা সম্ভবপর মনে করেন না যে, অপর কোন গ্রহ হইতে কোন জাতীয় জীব আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপনের জন্য এই সঙ্কেত করিতেছে?" পণ্ডিত মহাশয় তাহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, "এ সম্ভাবনা আমি অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু তাহার ত কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাইতেছি না। ভাল করিয়া পরীক্ষা ব্যতীত এখনই এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।" কথাটা কি জানেন? যতগুলি গ্রহ-উপগ্রহ এতদিন পর্য্যন্ত নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে মঙ্গল-গ্রহটিই আমাদের এই পৃথিবীর একটু নিকটে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেছেন যে, এই মঙ্গল-গ্রহে কোন উচ্চজাতীয় জীব বসবাস করিয়া থাকেন। আমরা যেমন মঙ্গল-গ্রহের সান্নিধ্য দেখিতেছি, তাঁহারাও তেমনি আমাদিগকে তাঁহাদের নিকট-প্রতিবেশী বলিয়া মনে করিতেছেন। এত নিকটে বাস করিয়াও এই দুই গ্রহের মধ্যে পরিচয় নাই, এ জন্য সেই মঙ্গলগ্রহের জীবগণ বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যেও হয় ত মার্কনীর মত বা তাঁহার অপেক্ষাও বড় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন; তাঁহারাও তারহীন বার্ত্তার খবর জানেন। তাই তাঁহারা সৌদামিনীর মারফৎ সন্দেশ প্রেরণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাষা কি, তাহা ত আমাদের জানা নাই; তাঁহাদের সঙ্কেত-নির্ণয়-পুস্তিকাও পাওয়া যাইতেছে না; কাজেই, সেই সঙ্কেতের অর্থ-নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই ধারণার উপর নির্ভর করিয়াই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এখন হইতে এই বিষয়ের অনুসন্ধানে, গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। ইহার ফলে যদি মঙ্গলগ্রহের সহিত পরিচয় হয় এবং কুটুম্বিতা সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে হয় ত একদিন অধিকতর শক্তিশালী এরোপ্লেনের সাহায্যে মঙ্গলগ্রহে গমনাগমনও অসম্ভব হইবে না। আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ এ সংবাদে অবশ্যই উল্লসিত হইবেন; তাই আমরা কথাটা বলিয়া রাখিলাম।

মঙ্গল-গ্রহের অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হইবে; কিন্তু ঘরের মধ্যে যে একটা মহা অমঙ্গলের সূচনা হইয়াছে, তাহার কি উপায় হইবে? সেই কথার একটু আভাষ দিতে হইতেছে। সে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটী কমিশন বসিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যায় পরম অভিজ্ঞ শ্রীযুত সাড্‌লার সাহেব এই কমিশনের নেতা হইয়াছিলেন; আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিধাতা, অনন্য-সাধারণ প্রতিভাশালী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয় সেই কমিশনের একজন সদস্য হইয়াছিলেন। এই কমিশন বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান, বিচার-বিতর্ক করিয়া যে রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন, তাহা এক অপূর্ব্ব ইতিহাস; শিক্ষাবিষয়ে এমন সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। সে বিবরণ-পুস্তক আমাদের অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত অপেক্ষাও বৃহত্তর। তাহার আগাগোড়া পাঠ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে, আমরাও তাহা পারি নাই; মোটামুটি দেখিয়া রাখিয়াছি। সেই কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে ভারত-গবর্ণমেণ্ট এক মন্তব্য-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সে মন্তব্যের আদ্যন্ত বিবরণ আমরা লিপিবদ্ধ করিব না, করিবার বিশেষ প্রয়োজনও আপাততঃ দেখিতেছি না। কেবল একটি বিষয়ে আমরা পাঠকগণের, তথা ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের কলিকাতা বিশ-বিদ্যালয়ের সদস্যগণ এবং সার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ছাত্রগণের যে সভা সে দিন আহত

হইয়াছিল, সেই সভাও ভারত-গবর্ণমেণ্টের এই মন্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ইণ্টার-মিডিয়েট্ পাঠটা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া হউক; অর্থাৎ ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষা একেবারে তুলিয়া দিয়া সেই পাঠটা ম্যাট্রিকিউলেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হউক। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বি-এ, এম্-এ প্রভৃতি লইয়াই থাকুন। কমিশনের এ মন্তব্য যে ঠিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখনকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে; কিন্তু তাহারা এখন প্রবেশিকায় যতখানি বিদ্যালাভ করে, তাহাতে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের উপযুক্ত হয় না। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইণ্টার-মিডিয়েটকে বাহির করিয়া স্কুলের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হউক,—ইহাই কমিশনের অভিপ্রায়। কিন্তু কমিশন সেই সঙ্গে-সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সময় আবশ্যক। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়াই কমিশন এই সময়ের কথাটা বলিয়াছেন। কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এই পরিবর্ত্তনটী সত্বরই করা কর্ত্তব্য বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ফলাফল সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব; বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণও সেদিন বিশেষভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

প্রথম কথা এবং প্রধান কথা এই যে, ইণ্টার-মিডিয়েট ক্লাসগুলি যদি কলেজের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কোন কলেজেরই অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে না। ইণ্টার-মিডিয়েট ক্লাসে যে সমস্ত ছাত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের প্রদত্ত বেতন হইতে যে আয় হয়, তাহার দ্বারা কলেজের ব্যয়ের অনেকটা অংশ সঙ্কুলান হইয়া যায়। যে সমস্ত অধ্যাপক এই সকল কলেজে কাজ করেন, তাঁহারা ইণ্টার-মিডিয়েট, বি-এ, বি-এস্-সি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীতেই অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। এখন যদি ইণ্টার-মিডিয়েট শ্রেণী কলেজের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কোন কলেজেরই ব্যয়-সঙ্কুলান হইবে না। তাহার পর বি-এ, বি-এস্-সি প্রভৃতি অধ্যাপনার জন্য প্রত্যেক কলেজে অধিক সংখ্যক অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে। সে সংখ্যাও গবর্ণমেণ্ট বাঁধিয়া দিয়াছেন;—প্রতি ২৫ জন ছাত্রের হিসাবে এক-এক জন অধ্যাপক। একদিকে ইণ্টার-মিডিয়েট চলিয়া যাওয়ার আয় কমিয়া গেল; তাহার উপর অধ্যাপকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ব্যয় বাড়িয়া গেল। ইহাতে বে-সরকারী কলেজগুলির যে অস্তিত্ব লোপ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর যদিও বা কেহ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চান, তাহা হইলে কলেজের ছাত্রবেতন এত বাড়াইতে হইবে যে, মধ্যবিত্ত অবস্থার ছাত্রগণ কলেজের সীমানার মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিবে না। এখনই যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতেই অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেদের অভিভাবকগণ, ছেলেদের কলেজের ব্যয় যোগাইতে গিয়া, কেহ-বা ঋণগ্রস্ত হইতেছেন, কেহ-কেহ বা ঘটী-বাটি বেচিতেছেন। ইহার পর বর্ত্তমান প্রস্তাব অনুসারে যাহা হইবার কথা হইতেছে, তাহাতে গরীব ভদ্রলোকের ছেলেদের আর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারের কাছেও যাইতে হইবে না। তাহার পর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা। গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অনুমোদন করিতে চান, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বহু অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় এত অর্থ কোথায় পাইবেন? গবর্ণমেণ্ট যাহা দিতে পারিবেন, তাহাতে কুলাইবে না। যদি গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ব্যয় দিতে পারেন, তাহা হইলে এক কথা বটে। কিন্তু যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের তহবিলের হিসাব দেখিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিবেন, ভবিষ্যৎ বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিধানের জন্য গবর্ণমেণ্ট অত বেশী টাকা দিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের যাহা আয় হইবে, তাহা হইতে যদি প্রস্তাবিত উচ্চ-শিক্ষার উপযুক্ত সাহায্য করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের আর সকল প্রয়োজনে ব্যয় করিবার টাকা মোটেই থাকিবে না। এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার জন্য এত অধিক টাকা দিতে পারিবেন না, এ কথা খাঁটি।

তাহার পর আর-একটা বিবেচনার কথা আছে। কথাটা স্পষ্ট করিয়াই বলা দরকার। আমাদের জন্য যে নূতন শাসন-বিধি পাশ হইয়াছে, যাহা আগামী বৎসরেই

প্রচলিত হইবে, তাহার বিধান অনুসারে শিক্ষা-বিভাগ দেশীয় মন্ত্রীবৃন্দের অধিকারভুক্ত হইবে। শিক্ষাবিভাগের ব্যবস্থা দেশীয় প্রতিনিধিদিগকেই করিতে হইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের হাতে যে টাকা হইবে, গবর্ণমেন্ট তাহা সকল বিভাগে ভাগ করিয়া দিবেন। তখন দেশীয় প্রতিনিধিগণ সেই টাকা দিয়া কোন্ দিক্ সামলাইবেন? তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষাবিভাগের এত অধিক ব্যয় যোগান দেওয়া অসম্ভব হইবে। তাহার ফলে এই হইবে যে, কোন দিকেই সুব্যবস্থা হইবে না। তখন হয় ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য শিক্ষা-বিভাগের আয় বাড়াইতে হইবে, না হয় নূতন ট্যাক্স্ বসাইতে হইবে, না-হয় লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে। সার তারকনাথ কি সার রাসবিহারী ত দেশে অধিক জন্মেন না; সুতরাং দশলাখ বিশলাখ দানের সুখ-স্বপ্ন না দেখাই ভাল। তাহা হইলে অবস্থা এই দাঁড়াইতেছে যে, বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে ভারতগবর্ণমেণ্ট যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য হইলে উচ্চশিক্ষা যথেষ্ট বাধা প্রাপ্ত হইবে। ইহাকেই আমরা বিশেষ অমঙ্গলের সূচনা বলিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনও এই কথা বিবেচনা করিয়াই উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা সময় সাপেক্ষ বলিয়াছেন।

— —

আমাদের দেশে চিত্রকলার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন-চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। আমাদের দেশের লোক এখন আর কালীঘাটের পট পাইয়াই সন্তুষ্ট হয় না। তাহার ফলে দেশে চিত্রবিদ্যার দিকে অনেক লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; এবং অনেক চিত্রশিল্পী বিশেষ প্রতিষ্ঠা, এবং আশানুরূপ না হইলেও, অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিত্রশিল্পে অনেকে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে পুরস্কার-লাভও করিতেছেন। সম্প্রতি আমরা Indian Academy of Art নামক একখানি ত্রৈমাসিক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্রখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। বোধ হয়, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারের জন্যই অনুষ্ঠাতৃবর্গ পত্রখানি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত করিতেছেন। এই পত্রে কিন্তু যতগুলি সুন্দর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এ দেশী চিত্র। আমরা অনুষ্ঠাতৃবর্গের এই উদ্যমের প্রশংসা করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই পত্রখানি আদর লাভ করিবে; এবং যাঁহারা প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া পত্রখানি চালাইতেছেন, তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ হইবে। আমাদের চিত্রশিল্পীগণের সাধনা জয়যুক্ত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

———

এবার আর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না; কোন দিকেই উচ্চবাচ্য নাই। বৎসর ত শেষ হইতে চলিল; এখনও কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে না; যাঁহারা এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন, যাঁহাদের যত্ন-চেষ্টায় এতকাল এই সম্মিলন হইয়াছে, তাঁহারাই বা কোথায়? রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্যোমকেশের পরলোকগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই কি সাহিত্য-সম্মিলনেরও অস্তিত্ব-লোপ হইবে? এই সম্মিলন পরিচালনের ভার এখন আর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের হস্তে নাই; ইহার জন্য একটা পৃথক কমিটি গঠিত হইয়াছে; অক্লান্তকর্ম্মা, উৎসাহের অবতার শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয় সেই কমিটির সভাপতি। এমন দিগ্বিজয়ী সভাপতি থাকিতে যদি এত দিন পরে 'সাহিত্য সম্মিলনের' অস্তিত্ব লোপ হয়, তাহা হইলে বড়ই ক্ষোভের, বড়ই দুঃখের কথা হইবে। এখনও কিঞ্চিৎ সময় আছে; এখনও চেষ্টা করিলে কোন-না-কোন স্থানে সম্মিলনের ব্যবস্থা হইতে পারে।

শোক-সংবাদ

৺ যোগেশচন্দ্র দে বিশ্বাস

আমরা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত চিত্তে যোগেশচন্দ্র দে বিশ্বাস মহাশয়ের পরলোক-গমন সংবাদ পত্রস্থ করিতেছি। ইনি স্বনামধন্য স্বর্গীয় শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ৬ই ফাল্গুন শিবরাত্রির দিন ৭০ বৎসর বয়সে ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইনি হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। প্রায় ৫০ বৎসর ওকালতী ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইবার পর যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র যোগেশ বাবু এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া ২১ বৎসর বয়সে হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তিনি একটী বিশাল একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন। আজকালকার দিনে একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা হওয়া এবং সকল রকম মতের বহু ব্যক্তিকে শান্ত সংযত রাখিয়া পরিচালন করা অল্প গুণপনার পরিচায়ক নহে। আশা করি, তাঁহার বংশীয়েরা উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁহার মহৎ গুণাবলীরও অধিকারী হইবেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, তাঁহার কবিত্ব-শক্তি, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে, যিনি তাঁহার সংস্পর্শে কোন দিন আসিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে সকল গুণে সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হন, সে সকল গুণই পণ্ডিত অজিতনাথের প্রচুর পরিমাণে ছিল। সংস্কৃত কবিতা রচনায় তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তিনি উপস্থিত-কবি ছিলেন; কোন সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অতি সুন্দর সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন; এবং সেই কবিতার [illegible] তিনি অনেক সময় ততোহধিক বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিতে পারিতেন। পণ্ডিত অজিতনাথের পরলোকগমনে বাঙ্গালার পণ্ডিত-সমাজ একটী উজ্জ্বল রত্নহারা হইলেন। নবদ্বীপে আবার কবে এমন পণ্ডিত, এমন কবির আবির্ভাব হইবে, কে বলিতে পারে।

পরলোকগত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

গত শুক্রবার ১৬ই মাঘ বেলা ৪॥০টার সময় প্রসিদ্ধ শোভাবাজার রাজবংশের কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর দুই দিনের জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কতক-গুলি সংস্কৃত নাটক বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদ করেন, তাহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। পরিষদ হইতে প্রকাশিত রামায়ণ-তত্ত্ব তিনি সঙ্কলন করেন, মহাভারতেরও ঐরূপ সূচী সঙ্কলন করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিছু-কিছু সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন; তাহার কতক অংশ মহাভারতীয় নীতি-কথা নামে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; কিন্তু আড়ম্বর ঘৃণা করিতেন। তিনি সাহিত্য সভা হইতে 'বঙ্গের কবিতা' নামে একখানি সুললিত পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে বাঙ্গালার কবিতার ইতিহাস আদিকাল হইতে রাজা রামমোহন রায়ের সময় পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার 'ব্রাহ্মণ ও শূদ্র' প্রবন্ধে বহু শাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এই উভয় বর্ণের স্থান সমাজে কিরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'জীব-বলি' ও 'ব্রাহ্মণ ও শূদ্র' প্রবন্ধদ্বয়ে তাঁহার গভীর শাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় ৩০ বৎসর পর গত বৎসর তিনি বহু চেষ্টা করিয়া কলিকাতায় হাফ্ আখ্ড়াই পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়গণের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

চিত্র-পরিচয়

জগন্মাতার আহ্বান

চিত্রখানির অর্থ এই যে, য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর সমস্ত পৃথিবী নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু এখনও যাহারা সেই নূতন মানব-সমাজ-সৃষ্টির ব্যাপারে যোগ না দিয়া নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট অলস ভাবে পুরাতন নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া আছে, জগন্মাতা তাহাদের আহ্বান করিয়া পথ-নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং বলিতেছেন—উঠ বৎস! জাগো! পৃথিবীর পুনর্গঠনে তোমরাও যোগদান কর। এই চিত্রখানিতে ভ্রমক্রমে ভারতবর্ষের হাফটোন ব্লক বিভাগ হইতে ব্লক নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া লেখা হইয়াছে; ব্লকগুলি কানপুরের 'প্রভা' পত্রিকার পরিচালক-বর্গ 'ভারতবর্ষে' ছাপিবার জন্য দিয়াছেন; এজন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

শ্যাম-বসন্ত

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

মথুরার রাজা আবার আসিল কি রে
এ ব্রজ-পুরীতে ফিরে?
লুকালে কি হবে—আর কি লুকাতে পারিবে তা'?
কোন্ দিক্ বল' সামালিবে—কিসে বারিবে বা?
ধরা পড়ে' গেছ, ধরার এ মহা-উৎসবে
উঠেছে যা' বাজি গীত-রস-রূপ-সৌরভে;
নানা দিকে নানা সমারোহে
মধু-মিলনের সন্ধি-বারতা
এনেছ' কি আজ বিরহের বিদ্রোহে?
এ ব্রজবাসীরে ছলিয়া যাইবে চলি'
এনেছ কি তাই বলি,
রাজার সজ্জা, গোপ-গরীবের বেশ ঢাকি?
কাঙাল বলে' কি এতই সহজে দিবে ফাঁকি?
আমি জানিতাম—সেই দিনই ঠিক, যদবধি
পথ মাজা হ'ল ধূলি অপসারি দ্রুতগতি,
শিশির ঢালিল জলধার,
তোমার আভায় শিহরি উঠিল
তৃণ-তরু-লতা পথ-পার!
তপন করিল মন্দ রথের গতি,
মালতী ভক্তিমতি
রচিল তোমার প্রবেশ-তোরণ ফুলময়,
দাঁড়াল কেশর কনকদণ্ড পাণিচয়,
আসিল পাটলী ফুল-তূণ-ধনুধারীগণ,
মধু-মক্ষিকা পদাতিক তব অগণন;
নিম্ব-বিম্ব-কিশলয়
শ্যামল-শোভায় পতাকা উড়ায়ে
রটিল শ্যামের স্বাগত বিশ্বময়!
কাঞ্চন-ফুল পুলকাঞ্চনে ধীরে
ধরিল ছত্র শিরে,
ব্যাকুল বকুল বরষিল লাজ রাশিরাশি,
বিহঙ্গকুল হুলু দিল ঘন উল্লাসি;
ঘোষি আগমনী মুহুমুহু পিক বৈতালি
"পিউ—আয়া—পিউ" হাঁকিয়া পাপিয়া দিয়া তালি
জানাল' যে কথা অবনীতে
কে না তা' শুনেছে? ছলা ছাড়ি, শ্যাম,
দেখা দে' রূপের অপরূপ মাধুরীতে।
বিস্তৃত নীল দিক্ পরিসর চুমে
চাঁদোয়া খুলিছে ভূমে,—

কুসুম পরাগ সুরভি বিলেপ নন্দিত
মানস-মুগ্ধ মরাল মাল্য লম্বিত ;
চাউনির তব ছাউনী ভরিয়া আছে খাড়া
কিংশুক-শুক-চঞ্চুতে শত ধানুকীরা ;
দখিণ হাওয়ার চাঁদমারি,
অশোকের শিরে উচান' সঙীন্,
শুষ্ক-পত্র দ্বারে দ্বারী ।
শিমুল আমূল হইয়া কণ্টকিত
রয়েছে উচ্চকিত.
আদেশ মাত্র পাঠাইবে বলি আহ্বান
তুলার পত্রে নিমন্ত্রণের লিপিখান ;
সরসিজ আর মনসিজ যারা এত দিন
আছিল বন্দী শীতের কারায় প্রাণহীন
মুক্তি লভিয়া তারা আজ
জলে থলে মনে প্রবাসে ভবনে
ভুবনে ঘোষিল—"আসিয়াছে যুবরাজ ।"
কুহু যামিনীতে কামিনীর বেদনায়,
প্রিয়তম কামনায়,
পেতেছে তোমার কুসুম আসন কিশলয়
ফুল মধু দিয়ে অলি গুঞ্জনে গীতময় ;
কুঞ্জে কুঞ্জে জমে আছে তব মৃদু হাসি,
কুরুবকশাখা প্রসাধিছে তব কেশরাশি ;
তৃণ তরুলতা শ্যামাভায়
ঢেকেছ' অঙ্গ—চূড়াটি কিন্তু
চুত-মুকুলে যে দেখা যায় !
পীত-অম্বর কর্ণিকারের ফুলে
দখিণ পবনে দুলে
নয়নের আভা পুণ্ডরীকে যে রঙাইছে,
বেণুবন ঘন বাঁশরীর সুর ছড়াইছে,
নরনারী হৃদে এই যে মিলন-ব্যাকুলতা
কহে না কি এরা মাধবের মধু-কথা?
যেমনি ছদ্ম বেশ ধর'
চিনেছি তোমারে—ধর নিজ রূপ
আর কেন মিছে ছল কর' ?

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারিগণ মিলিত হইয়া "দি করপোরেশন কো-অপারেটিভ ইনষ্টিটিউট লিমিটেড" নামে একটী সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য একটী ষ্টোর্সও খুলিয়াছেন। তাঁহারা কেবল বাজারের উপর নির্ভর করিবেন না ; কারণ বাজারে আজকাল কোন খাদ্যদ্রব্যই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাইবার উপায় নাই। সেইজন্য তাঁহারা নিজেদের ব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্যে উৎপাদন করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিবেন। সমস্ত জিনিসই বিশুদ্ধ হইবে, তাহাতে ভেজালের নামগন্ধও থাকিবে না। কেবল জিনিসপত্র সংগ্রহ করা নহে,—এই ইনষ্টিটিউটের অন্যান্য উদ্দেশ্যও আছে। ইনষ্টিটিউটের সদস্যগণের মধ্যে সঞ্চয়-প্রবৃত্তির উদ্রেকের চেষ্টা করা হইবে। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের জন্য বাসগৃহের ব্যবস্থাও হইবে। ব্যাঙ্কিং এবং বীমার কাজও চলিবে। ইহারা আরও একটী সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিতেছেন। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীরা ঘরের লোক বলিয়া ঘরোয়া (internal) সদস্য হইবেন ; এবং বাহিরের লোককেও—অবশ্য কলিকাতা সহরের অধিবাসী—তাঁহারা সহযোগী (associate) সদস্য করিয়া লইবেন। সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র বেশ বিস্তৃতই হইবে, এবং বোধ হয় সহরবাসীদের তাহাতে উপকারই হইবে। ইনষ্টিটিউটের মূলধন ২৫০০০ টাকা এবং প্রত্যেক অংশের মূল্য ৫ টাকা কিন্তু ইনষ্টিটিউট যেরূপ বিরাট আয়োজন করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে এই মূলধনে কুলাইবে কি ? অবশ্য প্রত্যেক অংশীকে একটাকা করিয়া প্রবেশিকা ফী দিতে হইবে। তাহাতে খুব বেশী হয় ত ৫০০০ অংশের জন্য ৫০০০ টাকা, কিন্তু যদি কেহ একাধিক অংশ গ্রহণ করেন, তবে প্রবেশিকা বাবদ এত টাকা পাওয়া যাইবে না। যাহা হউক, মতলবটি ভাল। ইহাতে কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের সুবিধা হইলে ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা সার্থক হইবে। তখন তাঁহাদের দেখাদেখি রেলওয়ে প্রভৃতিতেও এইরূপ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হইতে পারিবে। তা' ছাড়া, এই ইনষ্টিটিউটের অনুষ্ঠান সফলতা লাভ করিলে ব্যবসাদারেরা কিছু জব্দ হইয়া যাইতে পারিবে। সহরের এতগুলি খরিদদার-পরিবার হাতছাড়া হইয়া গেলে, তাহাদের ক্ষতি অনিবার্য্য। তখন হয় ত তাহারা বাধ্য হইয়া খাঁটি জিনিসের কারবার আরম্ভ করিবে। ইনষ্টিটিউটের দ্বারা যদি হয় ত এইটেই সব চেয়ে বড় কাজ হইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "গৃহদাহ" ভারতবর্ষে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল ; মূল্য ৪৲ টাকা।

শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত নূতন উপন্যাস "মিষ্টি-সরবৎ" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ১॥০।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত নূতন নাটক "বিদ্যারণ্য" প্রকাশিত হইল ; মূল্য ১৲।

শ্রীমতী সরসীবালা বসু প্রণীত ॥০ আনা সংস্করণের—৪৯ সংখ্যক পুস্তক "মনোরমা" প্রকাশিত হইল।

শ্রীহরিদাস বসু প্রণীত "সদগুরু ও সাধনতত্ত্ব" ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইল; মূল্য ১॥০।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র কুমার রায় প্রণীত "রহস্য-লহরীর" নূতন গ্রন্থ "চাঁদের চক্র" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ৸০।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "কবি কথা" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের "বিয়ের কনে" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য পাঁচ সিকা।

মীর্জাপুর সৎসাহিত্য সম্মিলনীর আগামী বার্ষিক অধিবেশনে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের রচনার প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত পদকগুলি পুরস্কার প্রদান করা হইবে। ১। রসিকচন্দ্র সুবর্ণ পদক। বিষয় :—বঙ্গ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান। ২। কৈলাসচন্দ্র রৌপ্য পদক। বিষয় :—দেশের অবনতির কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায়। ৩। সুচিত্রা রৌপ্য পদক। বিষয় :—মেদিনীপুর জেলার শিল্পোন্নতির উপায়। ৪। পুরন্দর রৌপ্য পদক। বিষয় :—কাঁথি মহকুমার শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস।

কালিপদ রৌপ্য পদক। বিষয় :—বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যা ও তাহার পূরণ অথবা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পরস্পর সম্বন্ধ। ৬। অন্নপূর্ণা রৌপ্য পদক। বিষয় :—জাতিগঠনে স্ত্রীশিক্ষার প্রভাব অথবা পারিবারিক জীবনে স্ত্রীজাতির প্রভাব। ১।২।৩।৪র্থ প্রবন্ধ সর্ব্বসাধারণের জন্য ; পঞ্চম প্রবন্ধ ছাত্রদিগের জন্য ৬ষ্ঠ প্রবন্ধ মহিলাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ছাত্রদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধের লেখকগণ যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট সহ তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন।

সেদিন হাবড়া শালকিয়ার গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজ ও সাহিত্য-সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গান, বাজনা, আমোদ, আনন্দ, বক্তৃতা, সম্মিলন সমস্তই হইয়াছিল ; অবশেষে নাটকাভিনয় এবং জলযোগেরও ব্যবস্থা ছিল। শালকিয়ার অধিবাসীবৃন্দ, বিশেষতঃ যুবকগণের উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা এই সমিতির উন্নতি কামনা করি।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' বহু চিত্র শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় "ভারতবর্ষে"র উল্লেখ করিবেন।

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,
নিরানন্দের আনন্দকর।

এক শিশির মূল্য ১৲ ভিঃ পিতে ১৵০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ, ২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলি।

মেওরেস

ধাতু ও স্নায়বিকদৌর্ব্বল্য, মেহ, গণোরিয়া ও শুক্রক্ষয়-জনিত নানাবিধ ব্যাধির পক্ষে মেওরেস অমৃততুল্য। প্রতি শিশি এক টাকা। ডাক মাশুল ।/০ আনা মাত্র। ডাঃ মনীন্দ্র-লাল মিত্র এম বি, ডাঃ আর, জি, কর এল, আর, সি, পি, (লণ্ডন), ডাক্তার রায় দয়ালচাঁদ সোম বাহাদুর এম, বি, লণ্ডনের এম, বি, এম সি এইচ মাষ্টার অফ্ কেমেষ্ট্রী ডাঃ এম, এল, দে মহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

ক্লৈব্যনাশক তৈল

এই তৈল (Potentia Oil) বাহ্য মালিশ করিতে হয়। স্নায়ু ও পেশী দুর্ব্বল হইলে কুঞ্চিত বা অপরিপুষ্ট হইলে আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। মূল্য প্রতি শিশি ২৲।

অনঙ্গ বটিকা যাঁহাদের শক্তি হ্রাস হইয়াছে, তাঁহারা এক সপ্তাহ মাত্র ব্যবহার করিলে ইহার অভাবনীয় শক্তি প্রত্যক্ষ করিবেন। ৭ দিনের বটিকার মূল্য ২৲, এক পক্ষের মূল্য ৩।০, মাশুলাদি স্বতন্ত্র। রোগীর চিঠিপত্র বিশেষ গোপনে রাখা হয়। [২৭।২]

জে, সি, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং,
ভিক্টোরিয়া কেমিকেল ওয়ার্কস্ (রাণাঘাট, বেঙ্গল)
কলিকাতা আফিস—২০১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড

হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাসি,

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিগ্রাফিক ঠিকানা "ফার্ম্মেসি"।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ড্রাম /১০, /১৫, বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক, শিশি, কর্ক, গ্লোবিউলস ইত্যাদি সুলভ।

কলেরা বা গৃহচিকিৎসার ঔষধ।

একখানি আদর্শ গৃহচিকিৎসা ও ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্রসহ বাক্স ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি পূর্ণ মূল্য যথাক্রমে ২।০, ৩।৵০, ৪৲, ৬৲, ৭।০ ও ১২।০ টাকা; ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আদর্শ গৃহ চিকিৎসা।

অতি সরল ভাষায় একজন বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে গৃহস্থ মাত্রেই এমন কি বামাগণও নিজে নিজে অনেক পীড়ার চিকিৎসা করিতে পারিবেন। সুন্দর কাগজে ছাপা, মূল্য ।৵০ আনা।

শ্রীহারাণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের আদি ও অকৃত্রিম মহৌষধ, বড় বোতল ১।০, ছোট বোতল ৸৵০।
অপার চিৎপুর রোড, বাব্বাবটতলা, কলিকাতা
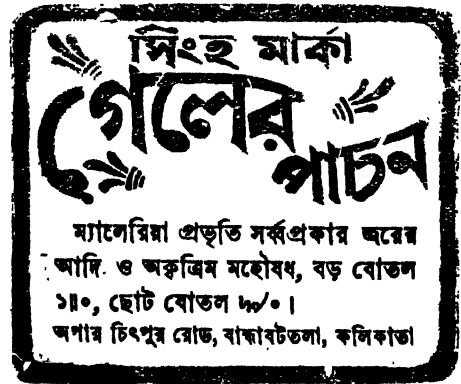
৩—৮ ব্রেজিল পাথরের চশমা

আজকাল জীবনসংগ্রামে যে সব অঙ্গের সমধিক চালনা আবশ্যক, তন্মধ্যে চক্ষু প্রধান; সুতরাং চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির সমতা রক্ষা বিষয়ে উপেক্ষা করা অনুচিত। ইহা স্বীকার্য্য যে "পাথরের চশমা" ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তির সমতা অধিক পরিমাণে রক্ষিত হয়। আমাদের পাথরের চশমা ইয়ুরোপীয় দোকান হইতে নিকৃষ্ট নহে, অথচ মূল্য তুলনায় অত্যন্ত সুলভ। ক্যাটালগ বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য। [৩-৮]

এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ৬ নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

বলশেভিক-বাদ

পর পৃষ্ঠা

বঙ্গে ব্রাহ্মণ রক্ষা।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জে আহূত হইলে, শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর উক্ত মহাসভার সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষাতে যে অভিভাষণ করেন, তাহারই স্থূল মর্ম্ম এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পুস্তকের আকার ১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য /০ ।

উপদেশ।

কাশী সাঙ্গ বেদ বিদ্যালয়, মহাকালী পাঠশালা, এংগ্লো বেঙ্গলী স্কুল প্রভৃতির বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য উপলক্ষে সভাপতি ভাবে শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়-বাহাদুর ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া সময়ে সময়ে হিন্দী এবং বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে।

পুস্তকের আকার ২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০ ।

হিন্দুসমাজের বিরাট মূর্ত্তি-সন্দর্শন।

এই পুস্তকে হিন্দুসমাজের অবস্থা অতি সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। হিন্দু মাত্রেই এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে সমাজের নিগূঢ়-রহস্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন। রাজা শশিশেখরেশ্বর এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে গভীর জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।" ("বিকাশ।")

"সুচিন্তিত প্রবন্ধ। যিনি পড়িবেন, তিনিই উপকৃত হইবেন।" (নব্যভারত)

কৃষকের ছবি।

আকার ২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০ ।

"The first-named, Krishakayr Chhabi is a collection of short poems on the different phases of a Bengal peasant's life from its contact with this mundane would to its separation therefrom. Its author, Raja Sasisekhareswar Rai, is well-known as a Zamindar who has the good of the rayets always at heart; and as he is in touch with all that move their little hearts, it is no wonder that these lines of harmony will awaken in their readers the full ring of the chords of sympathy." (The Amrita-Bazar Patrika).

কৃষকের গান।

আকার ১২ পৃষ্ঠা, মূল্য /০

ভারতের গোধন রক্ষা।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে সময় এদেশে গো-রক্ষা-আন্দোলনের সূত্রপাত, সেই সময় এই পুস্তিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

আকার ২৪ পৃষ্ঠা, বিনামূল্যে বিতরিত।

"ইহাতে গোজাতির ও গোদুগ্ধের উপকারিতা, ও গোমাংসের অপকারিতা বচন প্রমাণ দিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। কি উপায়ে গোহত্যা নিবারণ করা যায়। তাহারও পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক সমাজের মঙ্গলপ্রদ সন্দেহ নাই।" (প্রতিকার।)

"এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকখানি পাঠে গ্রন্থকারের অসহ্য হৃদয় বেদনায় ও উদারচিত্ততার পরাকাষ্ঠা দেখিলাম। *

গ্রন্থখানি পাঠে আমরা এতদূর প্রীত হইয়াছি যে আমাদের পত্রিকার কলেবর ক্ষুদ্র না হইলে গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতাম। আমার স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাগণকে পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।"

(মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি)

"ভাই ভারতবাসী, একটিবার এই পুস্তকখানা পাঠ করিয়া দেখ, এর মধ্যে কি রহিয়াছে। আমাদের বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই, তবে এইমাত্র বলিতেছি, পুস্তকখানার শেষ অংশগুলি পড়িয়া বাস্তবিক আমরা চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারি নাই।" (চট্টলগেজেট)

"যেমন আমাদের দেশ, পুস্তকখানি তদুপযোগীই হইয়াছে। সরল প্রাণ—অল্প শিক্ষিতেরাও বুঝিতে পারিবে। বাস্তবিক এ পুস্তকখানি ভারতে যথার্থ নূতন এবং দেশের প্রকৃত অভাব মোচনে উপযোগী। প্রতি গৃহে ইহার একখণ্ড থাকা উচিত।" (সোমপ্রকাশ)

ব্রাহ্মণের দুর্গতি ও তাহার প্রতিকার-উপায়।

আকার ২৯ পৃষ্ঠা, মূল্য /০ ।

সমাজস্পন্দন।

আকার ৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য /০ ।

সমাজ-গঠন।

আকার ২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য /০ ।

পর পৃষ্ঠা

পরপৃষ্ঠা

আস্তিকতা কি?

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ ভারতী লিখিত।

আকার ১৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵১০।

যোগ কণিকা।

শ্রীমৎ অঘোরানন্দ নির্ব্বাণী সঙ্কলিত।

আকার ১৬৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

শুভদিন।

স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সান্যাল সঙ্কলিত।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার সাহায্যে জ্যোতিষ বচন-অনভিজ্ঞ সাধারণ লেখা পড়া জানেন এমন স্ত্রীলোক বা বালকেও অতি সহজে ও অল্প সময়ে যাত্রাদির দিন দেখিতে পারেন।

আকার ২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০।

সচিত্র বৈদিক সন্ধ্যা-রহস্য।

সম্পাদক—শ্রীতারাচরণ শর্ম্মা।

তিন বেদেরই সন্ধ্যা বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সহ, মূল্য ।০।

বর্ণচিকিৎসা বিজ্ঞান। (Chromopathy).

সরল বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিবার অভিনব গ্রন্থ, মূল্য ।০ আনা।

যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

হঠযোগ—	মূল্য ॥০।
লয়যোগ—	মূল্য ॥০।
রাজযোগ—	মূল্য ॥০।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

বেদোদ্বোধিনী সমিতি প্রকাশিত।

সায়ণাচার্য্য কৃত ভাষ্য ও তাহার সরল বঙ্গানুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে ৮ পেজী সুপার রয়েল আকারে খণ্ডে ২ প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি-খণ্ডের মুদ্রণ সাহায্য ।০।

ত্রিশূল।

অখিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-রক্ষা-মহাসভার আনুকূল্যে উক্ত সভার সঞ্চালক
শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুরের সম্যক্ তত্ত্বাবধানে
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্ম-সম্পাদিত।

হিন্দু-সমাজ-তত্ত্বের অসঙ্কোচ ও অনপেক্ষ আলোচনা দ্বারা ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে সমাজ-শক্তির উন্মেষণ তথা হিন্দুজাতির স্বাতন্ত্র্য-সংরক্ষণ-চেষ্টাই এই পত্রের মুখ্য অভীষ্ট।

ত্রিশূল সম্বন্ধে দশজনের অভিমত—

"নাস্তিকতা ও দর্শন শাস্ত্র আর একটি উপাদেয় প্রবন্ধ। লেখকের দার্শনিক আলোচনা বড়ই পরিপাটী।" (পল্লীবাসী)

"উৎকৃষ্ট মাসিক।" (মেদিনীপুর হিতৈষী।)

"সময়াভাব ও তেমন প্রয়োজনীয় নহে এই বিবেচনায় আমরা মাসিক পত্রগুলির সমালোচনা ছাড়িয়া দিয়াছি। তথাপি ত্রিশূলের ভাদ্র ও আশ্বিনের যুগ্ম সংখ্যা সম্বন্ধে আমরা কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই সংখ্যায় "কোরাণ, পুরাণ ও বাইবেল" "ত্রিশূল ক্রস-ক্রেসেন্ট "পৌরাণিক ভারতবর্ষ" এই তিনটি প্রবন্ধ অতি উৎকৃষ্ট এবং নানা তথ্য ও চিন্তাশীলতাপূর্ণ। এরূপ প্রবন্ধ সচরাচর দেখা যায় না। "শ্রীফল বা বেল সাধারণের পাঠ করা উচিত।" (সময়)

সুদূর বোম্বাই নগরী হইতে প্রকাশিত "বৈষ্ণবধর্ম্ম পতাকা" বলিতেছেন—

"इसमें अधिकतर ब्राह्मणों का उपदेश देनेवाले लेख प्रकाशित हुआ करते हैं। ब्राह्मणोंको लोग भारतके आधुनिक अधःपतनका कारण बतलाकर सामाजिक पतनका सारा दोष उनके मढ़ा करते हैं। * * * उन दरिद्रताका हाथ पकड़नेवाले ब्राह्मणोंकी उज्ज्वलकीर्ति, अदम्य स्वार्थत्याग, परोपकारिता, कर्तव्य निष्ठाके नैसर्गिक भावोंके दर्शनकी जिन्हें इच्छा हो, वे त्रिशूलको अवश्य ही पढ़ें।

त्रिशूलकी भाषा बड़ी प्रौढ़ और भावपूर्ण है।"

মাসিক ত্রিশূলের বাঙ্গালা সংস্করণের বার্ষিক মূল্য ১॥০; হিন্দী সংস্করণের বার্ষিক মূল্য ১॥০; উভয় একত্রে লইলে ২॥০। ব্রাহ্মণ-সভার সদস্যগণ মাত্র ।০ ডাকমাশুল দিয়া বিনামূল্যে ত্রিশূল পাইতে পারেন। হিন্দুমাত্রেই ব্রাহ্মণরক্ষা সভার সদস্য হইতে পারেন। বৎসরে ৸০ মাত্র সাহায্য দিতে হয়।

অখিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণরক্ষা মহাসভা, কার্য্যালয়—গোধূলিয়া, কাশী।

বাঙ্গালার ঘরের ছেলে মেয়েদের জন্য

নূতনধরণের সচিত্র মাসিকপত্র

মৌচাক

আগামী বৎসর

বৈশাখ মাস হইতে বাহির হইবে।

আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য সুপরিচালিত ও সুনিয়মিত একখানি মাসিক পত্রের বড়ই অভাব। সেই অভাব দূর করিবার জন্য বিপুল আয়োজনে দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক, কবি, ও শিল্পিগণের সাহায্যে এই মাসিক পত্র বাহির হইতেছে।

যদি ছেলে মেয়েদের চাঁদমুখে হাসি দেখিতে চান, যদি তাহাদের মনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ দেখিতে চান, তাহা হইলে আজই বার্ষিক মূল্য দুই টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হউন।

নানান ধরণের, নানান রসের কবিতা, জগতের নানাদেশের বিচিত্র বিবরণ, সরস বৈজ্ঞানিক তথ্য খুব সহজ এবং সরস ভাষায় বুঝিবার উপযোগী করিয়া লেখা হইতেছে।

যাহাতে তাহাদের মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তির আলো পায়, কল্পনায় কুঞ্জে অপরূপ বৈচিত্রে ভরিয়া উঠিতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই "মৌচাক" তাহাদিগের শিক্ষা ও আনন্দদানের সেই ব্যবস্থাই করিবে।

প্রতিমাসেই "মৌচাক" শিশুদের মনের বিচিত্র মধুর ও স্বাস্থ্যকর খোরাক জোগাইবে।

বড় আকারে ভাল অক্ষরে অনেক পৃষ্ঠা গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, কাহিনীতে, তথ্যে বিভূষিত হইয়া মৌচাক প্রতি বাংলা মাসের ঠিক পহেলা তারিখে প্রকাশিত হইবে।

দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের হাতের ছবি শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনা—অপূর্ব্ব মণিকাঞ্চনযোগ।

শব্দশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকবি প্রিয়ম্বদাদেবী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতী সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রবাসীর সহঃ-সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলেখক হেমেন্দ্রকুমার রায় ও অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু ইত্যাদি সকলেই নিয়মিত ভাবে "মৌচাকে" লিখিবেন।

মৌচাক পাঠে ঘরে ঘরে ছেলে মেয়েদের দলে আনন্দের হাট বসিয়া যাইবে—হাসির রাশিতে বাংলার আঙ্গিনা ভরপুর হইবে—স্কুলে পাঠশালায় একই প্রাণের সাড়া উঠিবে।

বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা পাঠাইয়া দিয়া আজই গ্রাহক হউন।

প্রকাশক

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বসন্তের অঙ্গরাগ

মধুর বাসন্তী পঞ্চমীর সহিত শীতের দারুণ প্রকোপ চলিয়া গিয়াছে। নিদাঘের অনলকণাময় মার্ত্তণ্ডতেজ এখনও সম্যক্ পরিস্ফুট না হইলেও, উষ্ণতা ধীরে ধীরে শরীরের সন্তাপ জন্মাইতেছে—তাহার অপনোদন জন্ত একটু স্নিগ্ধ অঙ্গরাগের প্রয়োজন। সে অঙ্গরাগ করিতে হইলে, কান্তিময় মুখকমলকে আরও কান্তিময়, লাবণ্যময় করিতে হইলে, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদামকে আরও কৃষ্ণতর করিতে হইলে, নিত্য আমাদের "কেশরঞ্জন" ও "হিমাংশুদ্রব" ব্যবহার করা উচিত। "হিমাংশুদ্রব" ব্যবহারে কেবল যে মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে। ব্রণ, মেছেতা, ছুলি প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের শত্রুগুলি ইহার ব্যবহার ফলে বিদূরিত হয়। "হিমাংশুদ্রব" ব্যবহারে অনেক কুৎসিতাও পরমরূপসী হইয়াছেন। কেশরঞ্জন—মাথাধরা, মাথাঘোরা ও সর্ব্বপ্রকার মস্তিষ্ক রোগ নিবারণে অব্যর্থ। ইহা চিন্তাশীলের পরম বন্ধু; এই জন্তই শিক্ষিত সমাজে ইহার আদর।

মূল্য প্রতিশিশি ১৲ টাকা ও ||৶৹ দশ আনা। প্যাকিং ও ডাঃ মাঃ প্রত্যেকের |/৹ পাঁচ আনা।

বাঁচিয়া সুখ কি?

রোগের দারুণ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া অনেক রোগী বলিয়া থাকেন "আর বাঁচিয়া সুখ কি?" এরূপে মনোভাব ব্যক্ত না করিয়া যদি তাঁহারা চিন্তা করেন—"বাঁচিবার উপায় কি?" তাহা হইলে আক্ষেপের কারণ একটু সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ঐ যে শরীরের নানা স্থানে চক্রাকার কষ্টপ্রদ ক্ষতসমূহ দেখা দিয়াছে—ঐ যে দুরারোগ্য উপদংশের সাংঘাতিক বিষ এক এক খানি করিয়া শরীরের সমস্ত অস্থি-পঞ্জরকে ভাঙ্গিয়া দিতেছে—ঐ যে মনের অশান্তি, রাত্রে অনিদ্রা, আহারে বিরক্তি, আনন্দে বিষাদ—ইহাদের জ্বালায় বলিতে হয় বটে—"বাঁচিয়া সুখ কি?" রোগজীর্ণ শরীরে প্রকৃতই বাঁচিয়া থাকায় কোন সুখ নাই। কিন্তু সংসারে রোগও যেমন আছে—তাহার প্রতিকারের উপায়ও সেইরূপ আছে। আমাদের "অমৃতবল্লী-কষায়" দুই সপ্তাহ ভাল নিয়মের সহিত সেবন করিয়া দেখুন দেখি—আপনার ঐ দারুণ রোগের শোচনীয় উপসর্গসমূহ কোথায় চলিয়া যাইবে।

মূল্য প্রতিশিশি ১||৹ দেড় টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ||৶৹ এগার আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃসলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এণ্ড কোং

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় "ভারতবর্ষে"র উল্লেখ করিবেন।

অনাথ আশ্রম

উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের গৃহে গৃহে অনাথ-অনাথার যে করুণ ক্রন্দন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ধ্বনিত হইতেছে, তাহারই সকরুণ সজীব চিত্র। মনোজ্ঞ বাঁধা। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

কুলললনাগণের বিচিত্র চরিত্র সম্বলিত উপন্যাস

কুল-শ্রী মূল্য ১৷৷০ টাকা।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন উপন্যাস

যাঁহারা নগেন্দ্রবাবুর উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই তাঁহার মহিমা অবগত আছেন। আমাদের অনুরোধ কেহ এ রত্ন গ্রহণ করিতে বিরত হইবেন না। মূল্য মাত্র ১৷৷০ টাকা।

একাল সেকাল

সেকালের সেই চিত্রের নিকট একালের চিত্র কত হেয় কত:ঘৃণিত, পড়িলে বুঝিতে পারিবেন। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

সিঁথির সিঁদুর

সীমন্তিনীগণের সীমন্ত শোভা বর্দ্ধন করিবে। উপহারের অদ্বিতীয় উপন্যাস। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

বড় ছোট

বড় চাহিনা, ছোটর পদধূলি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিক—পবিত্র করুক। বাছিয়া লউন, বড় কি ছোট আপনাদের প্রয়োজন। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মজুমদার লাইব্রেরী ১০৬ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

রতি বিজয়

বা যৌবন রক্ষক। ক্লৈব্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ নিবারক এবং কান্তি পুষ্টি স্মৃতি বল বীর্য্য মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। মূল্য এক শিশি ১৷০। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রমেহ ধন্বন্তরী।

এক দিন ব্যবহারে যন্ত্রণার শান্তি এবং সপ্তাহ কালেই আরোগ্যলাভ। এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন দারুণ যন্ত্রণা, প্রস্রাবসহ সপূয-শোণিতক্ষরণ শ্বেত বা হরিদ্রা বর্ণের স্রাব, কাপড়ে দাগ লাগা, মূত্রনালীতে ক্ষত ও তজ্জন্য অত্যন্ত প্রদাহ, নিয়ত প্রস্রাবের বেগ অথচ বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব ত্যাগ ও শিরঃ ঘূর্ণনাদি উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। প্রদর প্রভৃতি স্ত্রী-ব্যাধিও ইহাতে সত্বর দূরীভূত হয়। মূল্য ১৷৷০ টাকা, মাশুল পৃথক্।

খাঁটি পদ্মমধু

সর্ব্বপ্রকার নেত্র রোগের মহৌষধ, মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲।

বিনামূল্যে :—নেপোলিয়ান বোনাপার্টির গণনা-পুস্তক সম্বলিত ক্যাটলগ পাঠান হয়।

বিশুদ্ধ ভৈষজ্য ভাণ্ডার

১২৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, (ড) কলিকাতা।

আধুনিক উন্নত কলকারখানায় প্রস্তুত

উৎকৃষ্ট কালির ট্যাবলেট

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অতি প্রিয় কালি। জলে অবিলম্বে গলিয়া অতি চমৎকার কালি প্রস্তুত হয়। এক ট্যাবলেটে এক দোয়াত (এক আউন্স) কালি হয়। নিব নষ্ট হয় না, তলানি পড়ে না।

বাণী (উজ্জ্বল ব্লু-ব্ল্যাক) ১৪৪টী ৸৶০, ভারতী (অতুলনীয় ব্লু-ব্ল্যাক), গাঢ় লাল (উজ্জ্বল ও স্থায়ী) প্রতি গ্রোস—১৷০; কপিং, গ্রীণ, ব্লু প্রতি গ্রোস ৸৶০। সর্ব্বত্র এজেন্ট চাই।

ম্যানেজার—জে, মিত্র, বি-এ।

দি সানরাইজ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং

৪।২ নং শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, কলিকাতা।

মদ খাও নেশা হইবে না! আহার ও ঔষধ!

বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।

আয়ুর্ব্বেদ মহাসভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত—কর্ণেল, মেজর, এম, বি প্রভৃতির বড়বড় ডাক্তারগণের অনুমোদিত ও ব্যবহৃত। বিজ্ঞান-মন্দিরের সাক্ষাৎ দেবতা, দেবতার দান—

মদের অবসাদ নাই আনন্দ আছে। মদের অপকার ও অনিষ্ট নাই; ইষ্ট ও উপকার আছে। মদের গরল নাই; সুধা আছে; মদের উন্মাদনা নাই; উদ্দীপনা আছে। মদের অপচয় নাই; সঞ্চয় আছে। ইহার সুখ ক্ষণিক নহে—স্থায়ী। ইহা পানানন্দ নহে—পরমানন্দ ইহা—ব্যসন নহে ঔষধ—ইহা সদ্য-সুফলপ্রদ সর্ব্বব্যাধিহর! ইহা খাইতে সুমিষ্ট, দেখিতে লালবর্ণ, উপাদেয় পুষ্টিকর পথ্য, সুস্থশরীরে স্বাস্থ্যপ্রদ পানীয়।

মদন-মদিরা কাহার জন্য ?

দুর্ব্বলের জন্য- রোগীর জন্য—ভোগীর জন্য—বৃদ্ধের জন্য—যুবকের জন্য—শিশুর জন্য—প্রসূতির জন্য। পুরাতন উত্তম পোর্ট মদিরার পরিবর্ত্তে চিকিৎসকগণ মদন-মদিরা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

একমাত্রা সেবনে বুকভরা বল হয়

শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছোটে, মস্তিষ্ক তেজোসম্পন্ন হয়, দুর্ব্বল বল পায়, অসমর্থ সমর্থ হয়, বন্ধ্যার পুত্র হয়, বৃদ্ধ যৌবন ফিরিয়া পায়, পূর্ণিমা নিশি আর পোহাইতে চাহে না। অথচ অবসাদ নাই, বলক্ষয় নাই, তেজের হ্রাস নাই, পূর্ণানন্দে অবসাদের ক্লান্তি নাই।—সত্যই—

মদন-মদিরা বীর্য্যভাণ্ডার, তেজোবর্দ্ধক, শুক্ররক্ষক, রক্ত-পরিষ্কারক, ক্ষয়-নিবারক, শোণিত-সঞ্চারক, পুরাতন জীর্ণ রোগহারক; রক্ত রস মেদ মজ্জাদি সপ্তধাতু পরিপোষক।

মূল্য বোতল ১৷০ পাঁচ সিকা। ডাকমাশুল ৸০ আনা। রেলে লইলে মাশুল কম পড়ে। ১৲ অগ্রিমসহ অর্ডার দিবেন।

ভারত আয়ুর্ব্বেদ ভবন—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।